শ্রীমদ্ভাগবত

সমগ্র রচনাবলী

নবম খণ্ড

সুভাষচন্দ্র বসু

সমগ্র রচনাবলী



শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

সমগ্র রচনাবলী

নবম খণ্ড

চিঠিপত্র, নিবন্ধ এবং বিবৃতি

(জুন ১৯৩৯-১৯৪১)

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০১২

সম্পাদনা শিশিরকুমার বসু ও সুগত বসু
অনুবাদ ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

© নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো, কলিকাতা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-93-5040-161-3

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
ক্রিয়েশন, ২৪বি/১বি ড. সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত।

SAMAGRA RACHANABALI IX
[Anthology]
of
Subhas Chandra Bose
edited by
Sisir Kumar Bose
and Sugata Bose
Published by Ananda Publishers Private Limited
45 Beniatola Lane, Calcutta 700 009

সম্পাদকদ্বয়ের ভূমিকা

২৯ এপ্রিল ১৯৩৯ তারিখে কলকাতায় কংগ্রেস সভাপতিত্ব থেকে পদত্যাগ করা এবং ১৬-১৭ জানুয়ারি ১৯৪১ তারিখে এলগিন রোডের বাড়ি থেকে নিষ্ক্রমণ, এই দুইয়ের মধ্যবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র বসু চেষ্টা করেছিলেন জাতীয় স্তরে ভারতবাসীকে কংগ্রেসের গান্ধীবাদী প্রাচীনপন্থী কর্মকর্তাদের বিকল্প অন্য একটি নেতৃত্ব দান করতে। এই বিকল্প নেতৃত্বের ভিত্তি ছিল ভারতীয় রাজনীতির সেই পর্যায়ে আপসহীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা এবং স্বাধীনতা লাভের পর নির্ভেজাল সমাজতন্ত্রবাদ। সুভাষচন্দ্র বসুর রচনা সংকলনের নবম খণ্ডে তাঁর এই অতি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের রচনা এবং বক্তৃতাসমূহ একত্রিত করা হয়েছে। এর অব্যবহিত পরেই ভারতের মুক্তি-বাহিনীর নেতাজি রূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাঁর রচনা ও বক্তৃতাসমূহের বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে বামপন্থীদের ভূমিকা, প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও কংগ্রেস-লীগ বোঝাপড়া যাতে ব্রিটিশদের কাছে অভিন্ন জাতীয়তাবাদী দাবি উপস্থাপিত করা যায়। তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যে আছে তাঁর রাজনৈতিক ঘোষণাপত্র, ১৯৪০-এর নভেম্বরে জেলখানায় আমৃত্যু অনশন আরম্ভ করার ঠিক পূর্বে লিখিত। তা ছাড়া আছে জ্যেষ্ঠভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসুকে কারাগার থেকে প্রেরিত একগুচ্ছ অকপট পত্র— যাতে আছে কংগ্রেস নেতৃত্বের নৈতিক স্খলন সম্পর্কে তাঁর ধারণা, এবং নিষ্ক্রমণের ঠিক আগে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সর্বশেষ পত্রবিনিময়।

কংগ্রেস সভাপতিত্ব থেকে পদত্যাগ করে সুভাষচন্দ্র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রবন্ধাবলী এবং বক্তৃতাগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ফরওয়ার্ড ব্লককে তিনি কংগ্রেসের অবিচ্ছিন্ন অংশ বলে গণ্য করতেন এবং তাঁর লক্ষ্য ছিল, কংগ্রেসের বরিষ্ঠ সংখ্যক সদস্যকে তিনি বৈপ্লবিক চিন্তায় দীক্ষিত করবেন। কাজেই তিনি, এম. এন. রায়ের মতো অন্য বামপন্থী নেতা, যাঁরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইছিলেন, তাঁদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করতেন। আবার ঐক্যের খাতিরে যাঁরা দলান্তর্গত সুদৃঢ় গণতান্ত্রিক ভিত্তির দাবিতে কংগ্রেস নেতৃত্বকে চাপ দেওয়ায় ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁদের মতও তিনি গ্রহণ করেননি। বিভিন্ন বামপন্থী গোষ্ঠী, যথা কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কমিউনিস্টরা) এবং র‍্যাডিক্যাল লীগ— তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় ত্যাগ করতে রাজি ছিল না, সুভাষচন্দ্র প্রথমে বামপন্থীদের তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন মত সত্ত্বেও একটি সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচিতে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব দলীয় শৃঙ্খলায় নামে, তিন বছরের জন্যে তাঁর কংগ্রেসের মধ্যে কোনও নির্বাচনযোগ্য পদ গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছে, এ-খবর পেয়ে ১৯ আগস্ট ১৯৩৯-এ তিনি লিখলেন:

> আমি আরও বেশি আনুগত্য সহকারে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকব, এবং জাতির একজন সেবক হিসাবে কংগ্রেস ও দেশের কাজ করে যাব। আমার দেশবাসীকে আমি

> আহ্বান করছি, আপনারা লাখে লাখে কংগ্রসে যোগ দিন, এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্য হিসাবে নাম লেখান। একমাত্র এভাবেই আমরা কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যবর্গকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুপ্রাণিত করতে পারব। এখনকার সাংবিধানিকতা এবং সংশোধনবাদের বর্তমান নীতি বদলাতে পারব এবং ভারতবাসীর ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম পুনরায় আরম্ভ করতে পারব।[১]

সেই দিনই তিনি মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যোগ দেন। তিনি আশা ব্যক্ত করেন, 'ব্যক্তির এবং জাতির মুক্তির জন্য যাবতীয় শুভ উদ্যোগের এক জীবন্ত কেন্দ্র হয়ে উঠবে ওই ভবনটি।'[২]

ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার এক সপ্তাহ আগে সুভাষচন্দ্র লেখেন, ''জার্মানি এবং পোল্যান্ডের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে ভারতবাসীরা পোলদের দিকে থাকবে।'' তবে এরপর তিনি প্রশ্ন তোলেন, ''আমাদের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া এই আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ সম্পর্কে যাই হোক, জাতি হিসাবে আমাদের কী করা উচিত?'' তিনি চেয়েছিলেন, ইউরোপে যেমন জাতীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তার অনুকরণে, অমিশ্র কার্যনির্বাহী সমিতির পরিবর্তে, মিশ্র কার্যনির্বাহী সমিতি গঠন করা হোক। যুদ্ধ বাধলে জাতীয় নেতৃত্বের কী করা উচিত সে-বিষয়ে তাঁর বক্তব্য খুব পরিষ্কার ছিল:

> গ্রেট ব্রিটেন এবং তাদের হয়ে যাঁরা সাফাই গেয়ে থাকেন তাঁরা এখন পোলদের আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলছেন এবং ব্রিটেন যদি এখন যুদ্ধে নামে, তারা যুদ্ধ করবে মুখে 'আত্মনিয়ন্ত্রণের' বুলি নিয়ে। ব্রিটিশ শাসকদের এখনই কি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সময় নয় যে, সুয়েজ খালের পূর্বভাগে যে ভূখণ্ডটিতে অতি প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিসম্পন্ন এক জাতি তাঁদের জন্মগত স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে, ব্রিটিশ রাজ্যের দাসত্ব করতে বাধ্য হয়ে, ভেতরে ভেতরে ফুঁসছেন।[৩]

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর সুভাষচন্দ্র ক্রম-উন্মোচিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ক্ষুরধার কয়েকটি বিশ্লেষণ পর পর দিয়ে গেলেন। সুভাষচন্দ্র মনে করতেন, যে-কোনও সংকটকালে সহজাত বোধের সঙ্গে যুক্তিশীলতার সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, 'যুক্তি যেখানে কাজ করে না সেখানে সহজাত বোধ আমাদের পথ দেখাতে পারে। যখন সহজাত বোধ আমাদের কুয়াশাচ্ছন্ন দ্বিধাময়তায় নিয়ে যায়, যুক্তি সঠিক পথে ফিরিয়ে আনে।'[৪]

অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৩৯, এই দু'মাস সুভাষচন্দ্র উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সারা দেশ ভ্রমণ করলেন, যাকে তিনি বলতেন ব্যক্তিমানস এবং গণচেতনা— সেই দুয়ের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে। একাদিক্রমে কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি তাঁর ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ দিলেন।[৫] ডিসেম্বর ১৯৩৯-এর মধ্যেই তিনি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের অস্থির নীতির কঠোর সমালোচনা আরম্ভ করলেন এবং 'সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি সংবিধান

---

১ বিষয় ৩: 'শান্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবৃতি' দ্রষ্টব্য
২ বিষয় ৪: 'জাতীয় ভবন— মহাজাতি সদন' দ্রষ্টব্য
৩ বিষয় ৬: 'কালের দাবি' দ্রষ্টব্য
৪ বিষয় ৮: 'আত্মানুসন্ধান' দ্রষ্টব্য
৫ বিষয় ৯: 'আমার ভ্রমণের কিছু কিছু বৃত্তান্ত' দ্রষ্টব্য

পরিষদের প্রস্তাব' সম্পর্কে কংগ্রেসকে সাবধান করে দিলেন। তিনি বললেন সে-প্রস্তাব লয়েড জর্জের 'আইরিশ কনভেনশন'-এর মতো। সে-প্রস্তাব ছিল 'সংগ্রামকে ঠেকিয়ে রাখার' একটা 'কৌশল', কারণ 'দলীয় সংঘর্ষের আড়ালে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে প্রকৃতপক্ষে যা চলছে সেটা হল নিরন্তর শ্রেণি-সংঘর্ষ।'[৬] তিনি বললেন, একটি যথার্থ সংবিধান-পরিষদ আহ্বান করা যেতে পারে একমাত্র ক্ষমতা হাতে আসার পর। দিল্লিতে ১৯৪০-এর জানুয়ারি মাসে সারা ভারত ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার সময় তিনি ঘোষণা করলেন:

> আজকের আকাশের কালো মেঘে একটা রূপালি রেখা দেখা যাচ্ছে। কংগ্রেস নেতারা যখন ইতস্তত করছেন, অস্থিরমতিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন, পঞ্জাবের মজলিস-ই-আহর তখন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও, অনেকে আছে, কিছু ঘরকুনো কুয়োর ব্যাঙ ভারতীয় মুসলিমদের স্বদেশপ্রেমের ওপর কটাক্ষ করবে, তাঁদের অপবাদ দিতে কুণ্ঠিত হবে না।

তিনি অভিযোগ করেন, 'কংগ্রেস নেতৃত্ব ফ্যাসিবাদী ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপস করার কথা ভাবতে পারেন', কিন্তু বামপন্থীদের সঙ্গে 'শেষপর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে' তাঁরা বদ্ধপরিকর। খিলাফত আন্দোলন এবং অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে গান্ধীজির আহ্বানের কথা স্মরণ করে তিনি শ্রোতাদের মনে করিয়ে দেন, ''ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় একজন বামপন্থী নেতা' প্রদত্ত একটি বাণী, 'স্বাধীনতা তারাই লাভ করে যারা ভয় পায় না, কাজ করে।''[৭]

গণপরিষদের প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র তাঁর অনুগামীদের সামনে দুটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন, ১৯১৭ সালে রাশিয়ার গণপরিষদ থেকে বলশেভিকদের সরে আসা, এবং সিন ফিনদের লয়েড জর্জের আইরিশ সম্মেলন খারিজ করে দেওয়া[৮]। সুভাষচন্দ্র বলেন, সমঝোতার পথে একটি কাঁটা 'কংগ্রেসের বিরুদ্ধযন্ত্র হিসেবে' সংখ্যালঘুদের ব্যবহার করার ব্রিটিশ প্রবণতা। কিন্তু তাঁর মনে হয়েছিল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে একটি আপস যদি সম্ভব হয়, ব্রিটিশ সরকার মুসলিম লীগের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত থাকবে:

> ''মুসলিম লীগকে না জানিয়ে ব্রিটিশ সরকার যদি গান্ধীজির সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসে, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ, উভয়েরই বিভক্ত হয়ে যাওয়া অবধারিত। কংগ্রেসের মধ্যে, গান্ধীজি এবং যাঁরা তাঁর পক্ষাবলম্বী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দিকে চলে যাবেন। অপর পক্ষে, মুসলিম লীগের মধ্যে যাঁরা সরকারের অনুগত, তাঁরা মি. জিন্নাকে এবং যাঁরা প্রগতিবাদী, এবং আজকের লিগ কাউন্সিলে প্রভাবশালী, তাঁদেরকে ত্যাগ করবেন, কেন না তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের আজ্ঞাধীন।

কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করেন, তা হলে সুভাষচন্দ্র চান আপোস-ওয়ালারা হয় স্বেচ্ছায় দলত্যাগ করুন, কিংবা তাঁদের বহিষ্কার করা হোক। তিনি প্রশ্ন করেন, 'আমরা কেন কংগ্রেস থেকে অপসৃত হব?' প্রশ্ন তোলেন, 'আমাদের দলের নাম এবং ঐতিহ্য কয়েকজন পশ্চাদপদ ব্যক্তির উপর নির্ভর করবে— তা আমরা হতে দেব কেন?'[৯]

---

৬ বিষয় ১৬: 'সঠিক নীতি' দ্রষ্টব্য
৭ বিষয় ১৮: 'ভারতীয় ছাত্রদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণ' দ্রষ্টব্য
৮ বিষয় ১৯: 'সামনে বিপদ' দ্রষ্টব্য
৯ বিষয় ২২: 'অবক্ষয় বন্ধ করো' দ্রষ্টব্য

১৯৪০-এর মার্চ মাসে রামগড়ে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়, সম্মেলন স্থলের পাশে সুভাষচন্দ্র তাঁর নিজস্ব বিশাল আপস-বিরোধী সম্মেলন করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, "সাম্রাজ্যবাদের দিন শেষ হয়ে আসছে, আমাদের সামনে এখন স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের যুগ। অতএব ভারত এখন ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে।" তাঁর রামগড় ভাষণে তিনি সেই চরম মুহূর্তে বর্তমান নেতৃত্বের দোলাচলচিত্ততাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। সমস্ত প্রকৃত বামপন্থীদের তিনি ঐক্যের আহ্বান জানান। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, "আমাদের আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যারা আপসহীন সংগ্রাম করবেন, তাঁরাই বামপন্থী।... আমাদের আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে বামপন্থা এবং সমাজতন্ত্র হবে একার্থবোধক..."[১০]

এপ্রিল ১৯৪০-এর পর থেকে যেহেতু 'পুরনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি' ব্রিটেনকে 'নব্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি' জার্মানি বেকায়দায় ফেলেছে[১১] বলে মনে হচ্ছিল, অতএব সুভাষচন্দ্রের মনোযোগ আরও জোরালোভাবে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের দিকে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। স্মরণ রাখতে হবে, ১৯৪০-এর মার্চ মাস শুধু রামগড় সম্মেলনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়নি, অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাবও গ্রহণ করেছে।" 'সাম্প্রদায়িকতা'র তীব্র নিন্দা করলেও জাতীয়তাবাদ একমাত্র প্রবাহ, কংগ্রেসের মূল স্রোতের এমত বক্তব্য তিনি সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারেননি। ১৯৪০-এর ৪-ই মে প্রকাশিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে তিনি স্মরণ করেন, অনতি অতীতে 'কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগের মতো সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সভ্য এবং নেতা হতে পারতেন।' তিনি মনে করিয়ে দেন, লালা লাজপৎ রায় কংগ্রেস এবং মহাসভা, দুয়েরই সদস্য ছিলেন, যেমন কোনও সময়ে আলি ভ্রাতৃদ্বয় কংগ্রেস এবং লীগ দুয়েরই নেতা ছিলেন। বঙ্গদেশে মৌলানা আক্রাম খাঁ মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন, আবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্টও ছিলেন। অতএব সুভাষচন্দ্র 'সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলিকে' অচ্ছুৎ মনে করা পছন্দ করতেন না। এরপর সুভাষচন্দ্র ব্যাখ্যা করেন, কেন বঙ্গীয় কংগ্রেসের বসু গোষ্ঠী কলকাতা করপোরেশনে মুসলিম লীগের সঙ্গে একটি চুক্তির ফলে 'কয়েকজন সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হিন্দু' উদ্ভূত হয়েছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন, বিগত তিন বছর ধরে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা বিফল হয়ে চলেছে। তিনি নিজে ১৯৩৮ সালে জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও মহাত্মা গান্ধী তাকে সমর্থন করেছিলেন। 'সেই প্রচেষ্টা, যা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল, তার সম্বন্ধে যাঁরা আপত্তি জানাননি, তাঁরা বর্তমান প্রচেষ্টা সম্পর্কে তীব্র আপত্তি জানাচ্ছেন কারণ এটি সফল হয়েছে।' বসু-লীগ চুক্তি সম্পর্কে তাঁর সার্বিক মূল্যায়ন এই:

> "বর্তমান চুক্তিটিকে এক বিরাট সাফল্য বলে আমরা মনে করি, তার সাম্প্রতিক অবস্থিতির জন্য নয়, তার মধ্যে যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিহিত আছে, তার জন্যে। বিগত তিন বছর আমরা অন্ধকারে বৃথা হাতড়াচ্ছিলাম। প্রত্যেকবারই আমাদের পথ আটকে দাঁড়াচ্ছিল সাম্প্রদায়িক পূর্বসংস্কার এবং আবেগ। ফলে আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল। এবার এই বাধার প্রাচীর আমরা ভেদ করতে সক্ষম হলাম, এবং সেই

---

১০ বিষয় ২৬: 'রামগড় ভাষণ' দ্রষ্টব্য

১১ বিষয় ৩১: 'নতুন শক্তি প্রদর্শন' দ্রষ্টব্য

ফাটলের ভিতর দিয়ে আলোর রশ্মি দেখা গেল। এবার আশা দেখা যাচ্ছে, আমরা হয়তো একটি সমস্যা, যার সমাধান অসাধ্য বলে এতজন মনে করছিলেন, তার সাধন করতে পারব। ছোটখাটো জিনিস থেকেই বড় বড় সাফল্য বেরিয়ে আসে।''[১২]

যুদ্ধে একে একে ব্রিটেনের বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪০-এর মে মাসে সুভাষচন্দ্র বললেন, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামের' চেয়েও সম্ভবত এখন আরও জরুরি হয়ে উঠবে 'অভ্যন্তরীণ ঐক্য এবং সংহতির সমস্যা।' তিনি লিখলেন,

'আমাদের সামনে এখন ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার অন্ধকার। কিন্তু এ সবই নিমেষে দূর হবে যদি আমরা দুটি বিষয়ে সফল হতে পারি, কংগ্রেসিদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন এবং হিন্দু মুসলিম মীমাংসা।''[১৩]

পরাধীন ভারত যে ইংল্যান্ডের রক্ষার জন্যে এগিয়ে যাবে সুভাষচন্দ্র তার কোনও সম্ভাবনা দেখলেন না। তিনি বললেন, ''ভারতকে আগে নিজেকে বাঁচাতে হবে, নিজেকে সে বাঁচাতে পারে একমাত্র যদি হিন্দু ও মুসলিমরা যৌথভাবে একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার দাবি করে, যার হাতে সমস্ত ক্ষমতা অবিলম্বে তুলে দিতে হবে।'' ভারত যখন 'নিজেকে রক্ষা করবার শক্তি' হাতে পাবে, একমাত্র তখনই সে 'বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারবে।' তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ''এ বিষয়ে (হিন্দু মুসলিম যৌথ দাবি) কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কি একমত হতে পারবে?[১৪] তাঁর মনে হয়েছিল, ভারতের প্রয়োজন চিত্তরঞ্জন দাশের 'অসীম ভালবাসা যার ফলে তিনি হয়েছিলেন জনগণের বন্ধু, এবং মুসলিম ও পশ্চাদপদ জাতিসমূহ তাঁর কাছাকাছি এসেছিল।'[১৫]

১৯৪০-এর জুন মাসে নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্মেলনে সভাপতি হিসাবে তাঁর নাগপুরের ভাষণের সুভাষচন্দ্র প্রতিদ্বন্দ্বী 'সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে সংঘর্ষের' প্রেক্ষাপটে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীদের কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি জোর দেন জাতীয় ঐক্য এবং সংহতির প্রয়োজনের ওপর, তিনি ঘোষণা করেন, ''জাতীয় ঐক্য কখনও সম্ভব হবে না, যদি সংগ্রামের গতিশীল কর্মসূচির ভিত্তিতে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ ঐক্য এবং একই সঙ্গে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মতো অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে ঐক্য সংগঠিত না হয়।'' তিনি সমস্ত দলকে নিয়ে 'একটি নাগরিক সুরক্ষা বাহিনী গঠনের' আহ্বান জানান, যার লক্ষ্য হবে 'অভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খলা এবং সৌহার্দ্য রক্ষা করা।' কোনও বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে পরাধীন ভারতকে সুরক্ষা প্রদান— হওয়া উচিত, 'সরকারের দায়িত্ব, জনগণের নয়।' তিনি প্রশ্ন করেন, ''আমাদের দাসত্ব চিরস্থায়ী করবার জন্যে আমরা কেন যুদ্ধ করব? পরাধীন ভারতের সুরক্ষার জন্যে যুদ্ধ করার অর্থ তো ঠিক তাই।''[১৬] ১৯৪০-এর জুন মাসের শেষে তিনি পুনরায় কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় মন্ত্রিসভা দাবি করেন, 'যার ফলে অন্তবর্তীকালে শান্তি ও সংহতি নিশ্চিত হবে। এবং হিন্দু-মুসলিম মীমাংসার পথ পরিষ্কার হবে।' এখনই যদি কেন্দ্রে একটি জাতীয় মন্ত্রিসভা গঠন সম্ভব

---

১২ বিষয় ৩২: 'কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক সংগঠন সমূহ' দ্রষ্টব্য
১৩ বিষয় ৩৪: 'তাড়াতাড়ি করো' দ্রষ্টব্য
১৪ বিষয় ৩৭· 'অস্থায়ী জাতীয় সরকার' দ্রষ্টব্য
১৫ বিষয় ৩৮: 'দেশবন্ধু দীর্ঘজীবী হোন' দ্রষ্টব্য
১৬ বিষয় ৪১: 'নাগপুর অভিভাষণ' দ্রষ্টব্য

না হয়, সুভাষচন্দ্র চাইলেন বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় মন্ত্রিসভা নিয়ে পরীক্ষা হোক। এখনকার পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে বিভিন্ন 'প্রদেশে জাতীয় মন্ত্রিসভা অতিশয় সহায়ক হবে, শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপনেই নয়— কেন্দ্রে ক্ষমতা হস্তগত করার ক্ষেত্রেও— স্বরাজ লাভের পথে যদি প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয়।'[১৭]

হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের লক্ষ্যে সুভাষচন্দ্র বসু ৩ জুলাই ১৯৪০, কলকাতার একটি প্রকাশ্য স্থল থেকে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। আন্দোলনে সাফল্য সত্ত্বেও ব্রিটিশরা সেই সুযোগে সুভাষচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করে। সেই সময়ে, জুলাই ১৯৪০ থেকে ডিসেম্বরের প্রথম পর্যন্ত কারাবাসের সময়ে তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র এবং প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, শরৎচন্দ্র বসুকে লেখা চিঠিগুলিতে তিনি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নৈতিক দুর্বলতাসমূহের অকুণ্ঠ সমালোচনা করেছিলেন। একটি চিঠিতে তিনি গান্ধীবাদের নিন্দা করেন— এর পবিত্রতার ভণ্ডামি ও গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণের জন্যে।[১৮] আরেকটিতে তিনি লিখলেন:

> ''কংগ্রেসের রাজনীতির বিষয়ে আমি যত চিন্তা করি ততই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় ভবিষ্যতে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে লড়াই করতে অধিকতর সময় ও শক্তি নিয়োজিত করা দরকার হবে। স্বরাজ লাভের পর ওইসব হীন মনোবৃত্তির প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং ন্যায়-অন্যায় বিবেচনাহীন মানুষদের হাতে যদি ক্ষমতা চলে যায়, দেশের কী হবে।... এখনই আমাদের উচিত কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা এবং সে-যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া। অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যখনই এবং যেখানেই প্রয়োজন আমাদের মৈত্রী স্থাপন করা উচিত।[১৯]

কিন্তু যুদ্ধকালীন আন্তর্জাতিক সংকটের সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সংকল্পই সুভাষচন্দ্রকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে অনশন আরম্ভ করতে প্ররোচিত করে, যাতে সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। তিনি বাংলার রাজ্যপালকে ২৬ নভেম্বর ১৯৪০, অনশন আরম্ভ করার আগে যে পত্রখানি লেখেন, দেশপ্রেমের কারণে আত্মত্যাগের সেটি একটি অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত। তিনি লিখেছিলেন, ''কষ্টভোগ ও আত্মত্যাগে কারও ক্ষতি হয় না। এ জগতে তার যদি কোনও পার্থিব ক্ষতি হয়, পরিবর্তে অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে সে তার চেয়ে অনেক লাভবান হবে।''[২০]

৫ ডিসেম্বর ১৯৪০ সুভাষচন্দ্রকে সরকার মুক্তি দেয়, তবে প্রায় লুকোচুরি খেলার মতো পরিকল্পিত হয়, তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হলেই আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। এলগিন রোডে সুভাষচন্দ্রের বাড়ির ওপর ২৪ ঘণ্টার জন্যে নজরদারি বহাল করা হয়। জেল থেকে মুক্তি এবং ১৬-১৭ জানুয়ারি ১৯৪১ তাঁর নিষ্ক্রমণের মধ্যবর্তী সময়ে জয়প্রকাশ নারায়ণের কাছ থেকে তিনি একটি কৌতূহলোদ্দীপক পত্র পান, এবং ভাইসরয় লিনলিথগোকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র লেখেন। সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সর্বশেষ পত্রবিনিময়। সুভাষচন্দ্র যখন ১৯৪০-এর ২৩ ডিসেম্বর গান্ধীকে চিঠিতে ভবিষ্যতের কোনও আন্দোলনে

---

১৭ বিষয় ৪২: 'দেশের সামনে কর্তব্য' দ্রষ্টব্য

১৮ শরৎচন্দ্র বসুর প্রতি পত্র, ২৪ অক্টোবর ১৯৪০ দ্রষ্টব্য

১৯ শরৎচন্দ্র বসুর প্রতি পত্র, ৩১ অক্টোবর ১৯৪০ দ্রষ্টব্য

২০ 'আমার রাজনৈতিক ইচ্ছাপত্র' দ্রষ্টব্য

সহযোগিতা করতে চান বলে জানান, তার আগেই তিনি ভারত ত্যাগ করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছেন। ২৯ ডিসেম্বর ১৯৪০-এ সুভাষচন্দ্রের চিঠির উত্তরে গান্ধী লেখেন, ''তুমি অদম্য, সে তোমার স্বাস্থ্য ভালই থাক আর খারাপই থাক। বারুদে আগুন দেওয়ার আগে ভাল করে সেরে ওঠো।''[২১] ততদিনে সুভাষচন্দ্রের বারুদ প্রস্তুত। এখন শুধু পলতেয় আগুন দেবার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা।

শিশিরকুমার বসু
সুগত বসু

---

২১ মহাত্মা গান্ধীর পত্র, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৪০ দ্রষ্টব্য।

সূচি

সম্পাদকদ্বয়ের ভূমিকা

বক্তৃতা, নিবন্ধ এবং বিবৃতি (জুন ১৯৩৯-১৯৪১)

১. কেন ফরওয়ার্ড ব্লক, ৫ আগস্ট ১৯৩৯ ৩
২. ফরওয়ার্ড ব্লকের ভূমিকা, ১২ আগস্ট ১৯৩৯ ৬
৩. শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবৃতি, ১৯ আগস্ট ১৯৩৯ ৮
৪. জাতির জন্য নির্মিত ভবন— 'মহাজাতি সদন', ১৯ আগস্ট ১৯৩৯ ৯
৫. আমাদের সমালোচকগণ, ১৯ আগস্ট ১৯৩৯ ১১
৬. কালের দাবি, ২৬ আগস্ট ১৯৩৯ ১৪
৭. বন্ধুর কণ্ঠস্বর, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ ১৬
৮. আত্মানুসন্ধান, ২৮ অক্টোবর ১৯৩৯ ১৮
৯. আমার ভ্রমণের কিছু কিছু বৃত্তান্ত, ২৮ অক্টোবর— ২৫ নভেম্বর ১৯৩৯ ২০
১০. ফিরে দেখা, ৪ নভেম্বর ১৯৩৯ ৩০
১১. কোন পথে শীর্ষ নেতৃত্ব? ১৮ নভেম্বর ১৯৩৯ ৩৪
১২. কার বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াই? ২৫ নভেম্বর ১৯৩৯ ৩৬
১৩. আমাদের ওয়ার্কিং কমিটি, ২ ডিসেম্বর ১৯৩৯ ৩৯
১৪. আবার একই, ৯ ডিসেম্বর ১৯৩৯ ৪২
১৫. স্মরণ করিয়ে দিই, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৯ ৪৪
১৬. সঠিক নীতি, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৩৯ ৪৬
১৭. নেতাগণ পথভ্রান্ত করছেন, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৩৯ ৪৯
১৮. ভারতীয় ছাত্রদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণ, জানুয়ারি ১৯৪০ ৫৩
১৯. সামনে বিপদ, ৬ জানুয়ারি ১৯৪০ ৫৮
২০. রামগড়, ১৩ জানুয়ারি ১৯৪০ ৬১
২১. আমাদের সমস্যা, ২০ জানুয়ারি ১৯৪০ ৬৪
২২. অবক্ষয় বন্ধ করো, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ ৬৫
২৩. বঙ্গদেশের জটিল পরিস্থিতি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ ৬৮
২৪. সাম্প্রদায়িক ঐক্যের অভিমুখে, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ ৭০
২৫. জার্মানি সম্পর্কে দু'-একটি কথা, ১৩ মার্চ ১৯৪০ ৭২
২৬. রামগড় ভাষণ, ১৯ মার্চ ১৯৪০ ৭৪
২৭. বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা, ৩০ মার্চ ১৯৪০ ৭৮
২৮. রামগড়ের আহ্বান, ৬ এপ্রিল ১৯৪০ ৮০
২৯. আমরা এগিয়ে চলেছি, ১৩ এপ্রিল ১৯৪০ ৮১
৩০. স্বামীজির বাণী, ২০ এপ্রিল ১৯৪০ ৮৩

৩১. নতুন শক্তি প্রদর্শন, ২৭ এপ্রিল ১৯৪০ ৮৫
৩২. কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক সংগঠন সমূহ, ৪ মে ১৯৪০ ৮৭
৩৩. ভারত, জাগ্রত হও! ১১ মে ১৯৪০ ৮৯
৩৪. তাড়াতাড়ি করো, ১৮ মে ১৯৪০ ৯১
৩৫. এগিয়ে চলো, বঙ্গদেশ! ১ জুন ১৯৪০ ৯২
৩৬. এ কি ন্যায়সঙ্গত? ৮ জুন ১৯৪০ ৯৪
৩৭. অস্থায়ী জাতীয় সরকার, ৮ জুন ১৯৪০ ৯৬
৩৮. দেশবন্ধু দীর্ঘজীবী হোন, ১৫ জুন ১৯৪০ ৯৮
৩৯. প্যারিসের পর, ১৫ জুন ১৯৪০ ৯৯
৪০. নাগপুর চলুন, ১৫ জুন ১৯৪০ ১০১
৪১. নাগপুর অভিভাষণ, ১৮ জুন ১৯৪০ ১০২
৪২. দেশের সামনে কর্তব্য, ২৯ জুন ১৯৪০ ১১১
৪৩. হলওয়েল মনুমেন্ট, ২৯ জুন ১৯৪০ ১১২
৪৪. বৃহত্তর প্রেক্ষিতে ফরওয়ার্ড ব্লক ১১৩
৪৫. আমার নিজস্ব ঘোষণাপত্র ১২২
৪৬. আমার বিবেক আমার নিজস্ব ১২৫
৪৭. বঙ্গীয় কংগ্রেসের জোট বিষয়ে ১২৬

গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পত্রাবলী

বসু-গান্ধী পত্রালাপ (১৯৪০-১৯৪১)

১. মহাত্মা গান্ধীকে ২৩.১২.১৯৪০ ১৩৫
২. মহাত্মা গান্ধীর পত্র ২৯.১২.১৯৪০ ১৩৬
৩. মহাত্মা গান্ধীকে, ১০.১.১৯৪১ ১৩৭

বসু-নেহরু পত্রালাপ

৪. জওহরলাল নেহরুর পত্র, জুলাই ১১, ১৯৩৯ ১৩৮

বসু-রবীন্দ্রনাথ পত্রালাপ

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি, ১১.১২.৩৯ ১৩৯
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সচিবের প্রতি (টেলিগ্রাম), ১২ ডিসেম্বর ১৯৩৯ ১৪০

শরৎচন্দ্র বসুর প্রতি কারাগার থেকে লিখিত পত্রাবলী

৭. শরৎচন্দ্র বসুকে, ২৪.১০.৪০ ১৪০
৮. শরৎচন্দ্র বসুকে, ৩১.১০.৪০ ১৪২

৯. শরৎচন্দ্র বসুকে, ১৫.১১.৪০ ১৪৩
১০. শরৎচন্দ্র বসুকে, ১৭.১১.৪০ ১৪৪

১১. নেতাজির প্রতি জয়প্রকাশ নারায়ণের গোপন পত্র, ১৯৪০ ১৪৫

লর্ড লিনলিথগোর প্রতি লিখিত পত্রাবলী

১২. লর্ড লিনলিথগো-কে, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৪০ ১৫০
১৩. লর্ড লিনলিথগো-কে, ৩ জানুয়ারি ১৯৪১ ১৫২

'আমার রাজনৈতিক বিবৃতি' এবং সরকারের উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলী

১৪. প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টের প্রতি, ১৫.৭.৪০ ১৫৪
১৫. প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টের প্রতি, ১৭.৭.৪০ ১৫৫
১৬. মাননীয় গৃহমন্ত্রী। বঙ্গাল সরকার, ১৯.৭.৪০ ১৫৬
১৭. প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টের প্রতি, ২৩.৭.৪০ ১৫৭
১৮. প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টের প্রতি, ৭.৮.৪০ ১৫৮
১৯. প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টের প্রতি, ২২.৮.৪০ ১৬০
২০. প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টের প্রতি, ৩০.৮.৪০ ১৬১
২১. প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টের প্রতি, ৩১.৮.৪০ ১৬২
২২. প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টের প্রতি, ৩১.৮.৪০ ১৬২
২৩. প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টের প্রতি, ২০.৯.৪০ ১৬৩
২৪. প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টের প্রতি, ২০.৯.৪০ ১৬৪
২৫. বঙ্গদেশের গৃহমন্ত্রীর প্রতি, ১.১০.৪০ ১৬৫
২৬. মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি, ২২.১০.৪০ ১৬৬
২৭. বঙ্গদেশের গৃহমন্ত্রীর প্রতি, ৩০.১০.৪০ ১৬৭
২৮. প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টের প্রতি, ৩০.১০.৪০ ১৬৮
২৯. ভারতীয় আইনসভার সভাপতিকে, ১.১১.৪০ ১৭০
৩০. প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টের প্রতি, ১৪.১১.৪০ ১৭১
৩১. বঙ্গদেশের রাজনৈতিক বিভাগীয় সেক্রেটারির প্রতি, ১৭৩
১৬.১১.১৯৪০
৩২. বঙ্গদেশের মাননীয় গভর্নর, মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার উদ্দেশে: ১৭৩
'আমার রাজনৈতিক বিবৃতি', ২৬.১১.১৯৪০
৩৩. বঙ্গদেশের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি, ২/৫.১২.১৯৪০ ১৭৮
৩৪. বঙ্গদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার উদ্দেশে, ৯.১২.৪০ ১৮০

অন্যান্য পত্র

৩৫. এম. এন. রায়ের পত্র, জুন ১২, ১৯৩৯ ১৮১
৩৬. এম. এন. রায়ের পত্র, অক্টোবর ১৩, ১৯৩৯ ১৮২
৩৭. সীতা ধর্মবীরকে, ১২.১১.৩৯ ১৮২
৩৮. অমিয় চক্রবর্তীকে, ১১.১২.৩৯ ১৮৩
৩৯. এম. অন্নপূর্ণাইয়ার পত্র, ১৫.১.১৯৪০ ১৮৩
৪০. ডা. সত্যপালের পত্র, ২৩.১.১৯৪০ ১৮৫
৪১. আকবর শাহের পত্র, ১৯.২.৪০ ১৮৬
৪২. অধ্যাপক এন.জি. রঙ্গার পত্র, ২০.২.৪০ ১৮৭
৪৩. ইন্দুলাল যাজ্ঞিকের পত্র, ২০.২.৪০ ১৮৮
৪৪. ক্যারল পোটির পত্র, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ ১৮৯
৪৫. লালা শঙ্করলালের পত্র, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ ১৯০
৪৬. এম. এন. মুখার্জির পত্র, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ ১৯১
৪৭. স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর পত্র, ২৮.২.১৯৪০ ১৯২
৪৮. মিয়াঁ আকবর শাহ্-এর পত্র, ২৯.২.৪০ ১৯৩
৪৯. ইন্দুলাল যাজ্ঞিকের পত্র, ২ মার্চ, ১৯৪০ ১৯৪
৫০. নানিক জি. মোতোয়ানের পত্র, মার্চ ২৫, ১৯৪০ ১৯৫
৫১. করিম এ. চশমার পত্র, ৯ এপ্রিল ১৯৪০ ১৯৬
৫২. গগনবিহারী এল. মেহতার পত্র, ১৩ এপ্রিল, ১৯৪০ ১৯৮
৫৩. আগাথা হ্যারিসনের পত্র, এপ্রিল ২০, ১৯৪০ ১৯৮
৫৪. মেঘনাদ সাহার পত্র (তারিখবিহীন) ১৯৯
৫৫. কান্তিলাল পারেখকে, ২৫.৬.৪০ ২০২
৫৬. এম. এ. এইচ. ইস্পাহানিকে, ১৪.১০.৪০ ২০২
৫৭. বরদাবাবুকে, ২৯.১০.৪০ ২০৩
৫৮. সর্দার শার্দূল সিং কবিশেরকে, ৪.১১.৪০ ২০৫
৫৯. অমিয় বোসকে, ১৫.১১.৪০ ২০৭
৬০. মি. গ্রিনউডকে, ১৫.১১.৪০ ২০৮
৬১. আর্থার মুরকে, ১৭.১১.৪০ ২১১
৬২. মুকুন্দলাল সরকারকে, ২১.১১.৪০ ২১২

পরিশিষ্ট ২১৩
নির্ঘণ্ট ২১৫

বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং বিবৃতি

জুন ১৯৩৯-১৯৪১

১

কেন ফরওয়ার্ড ব্লক

‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ পত্রিকা, ৫ আগস্ট ১৯৩৯ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এমন একটি আন্দোলন যার উদ্ভব হয়েছে ভারতের মাটি থেকে। ভারতীয় জনসাধারণের একটি রাজনৈতিক মুখপত্র, এতে রূপায়িত হয়েছে তাদের যত আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শ। এটি এমন এক সংগঠন যার বেড়ে ওঠার অবকাশ অসীম, প্রবল এর সম্ভাবনাসমূহ, ভারতীয় জাতির বিকাশের সম্ভাবনার মতোই সীমাহীন। কংগ্রেসের বৃদ্ধি এবং বিকাশ ভিতরের তাগিদ থেকে এসেছে, যদিও বাইরের নানা কারণই এর সহায়ক হয়েছে। ভিতরের এই তাগিদই প্রধানত ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্মের কারণ। ভারতের রাজনীতিতে এই নতুন বৃহৎ ঘটনার পিছনে কোনও ব্যক্তিগত কারণ নেই, কোনও আকস্মিক পরিস্থিতিও নেই। ফরওয়ার্ড ব্লকের উদ্ভবের কারণ কংগ্রেসকে তার বিবর্তনের পথে নতুন এক পর্যায়ে প্রবেশ করতে হবে।

এখন, কংগ্রেসের এই বৃদ্ধি এবং বিকাশ কীভাবে হবে? এর পিছনে কোনও নিয়ম কাজ করছে? কয়েকটি তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিন্তু যেটি আমার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মনে হয়, প্রকৃত ঘটনায় সবচেয়ে যেটি কাছাকাছি, সেটি হল হেগেলীয় মতবাদ। অগ্রগতি এক সরললেখা ধরে হয় না, সর্বদা শান্তিপূর্ণ পথেও হয় না। অগ্রগতি প্রায়ই সংঘাতের মধ্যে দিয়ে আসে।

তত্ত্ব এবং তার বিপরীত তত্ত্বের যে সংঘাত, তা থেকেই নির্দিষ্ট সংগঠন হয়, প্রগতির পরবর্তী পর্যায়ে, পূর্বে প্রাপ্ত এই সংগঠন বা সংশ্লেষণ নিজেই একটি তত্ত্ব হয়ে ওঠে, তার বিপরীত তত্ত্ব উদ্ভূত হয়, আবার তাদের মধ্যে চলে সংঘাত এবং তার থেকে আসে নবতম সংশ্লেষণ। এইভাবে প্রগতির চক্র ঘুরতে থাকে।

দিনরাত্রি যাঁরা ‘‘ঐক্য, ঐক্য’’ করেন, যে কোনও মূল্যে, যে-কোনও অবস্থায় ঐক্য চাই বলেন, বিবর্তনের মৌলিক নিয়মটা তাঁদের চোখ এড়িয়ে যায়। কোনটা প্রকৃত আর কোনটা ভুয়ো ঐক্য আমাদের বুঝতে হবে, পার্থক্য করতে হবে কাজের ঐক্য এবং কাজ না করার ঐক্যের মধ্যে, যে-ঐক্য থেকে অগ্রগতি আসে এবং যে-ঐক্য থেকে আসে গতিহীনতা, তার মধ্যে। আজ ‘‘যে কোনও মূল্যে, যে কোনও অবস্থায় ঐক্য’’ এই স্লোগান তাঁদেরই পক্ষে সুবিধাজনক যাঁরা এগোবার ক্ষমতা এবং বৈপ্লবিক প্রেরণা হারিয়েছেন। তাঁদেরই এই শ্রুতিমধুর কিন্তু নিরর্থক স্লোগান যেন আমাদের পথভ্রষ্ট না করে।

যে কোনও জীবন্ত ও গতিশীল আন্দোলনের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বামপন্থী শক্তি থাকে,

যাকে বলতে পারেন প্রচ্ছন্ন বিপরীত তত্ত্ব। যথা সময়ে সেই প্রচ্ছন্ন বামপন্থী শক্তি আত্মপ্রকাশ করে এবং তার মধ্যে দিয়ে বৃদ্ধি ও বিকাশ আসে, কোনও একটা পরিস্থিতিতে সেই বামপন্থী শক্তিকে কীভাবে পরিণত করা যায় সেটা নির্ধারণ করার জন্যে প্রয়োজন হয় রাজনৈতিক, কখনওবা দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি। এমন প্রায়শঃই হতে পারে যে দক্ষিণপন্থী শক্তির সঙ্গে আপস ও সহযোগিতার মাধ্যমে বামপন্থা শক্তিসঞ্চয় এবং প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আবার অন্য পরিস্থিতিতে তা সম্ভব নাও হতে পারে, তখন বামপন্থাকে দক্ষিণপন্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে হয় এবং নিজের শক্তিকে সংহত করে নিতে হয় ও অনুগামীদের সংগঠিত করতে হয়। সেরকম পরিস্থিতিতে তীব্র সংঘাত অনিবার্য। যদিও বেদনাদায়ক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অগ্রগতির সহায়ক। সাংগঠনিক অবকাশের কালে একটি বামপন্থী গোষ্ঠীর উদ্ভব এবং বৃদ্ধি অনিবার্য হয়ে ওঠে। দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে কিংবা তাঁদের সঙ্গে সংঘাতের মাধ্যমে বামপন্থী গোষ্ঠীকে বেড়ে উঠতে হয়, যত দিন না সংগঠনটি তাঁরা দখল করতে পারছেন। কিংবা দক্ষিণপন্থীদের নিজেদের দিকে নিয়ে আসতে পারছেন। সে কাজ যখন সম্পন্ন হবে, এবং বামপন্থীদের (এখন যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ) শক্তি নিঃশেষিত, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে এবং নতুন একটি বামপন্থী গোষ্ঠী বেরিয়ে আসবে এবং শেষপর্যন্ত গতকালের বামপন্থী গোষ্ঠীকে বহিষ্কার করবে। ১৯২০-র গান্ধীবাদীরা কংগ্রেসের বামপন্থী ছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় আজকের বামপন্থী তাঁরাই। বিগত দিনের বামপন্থীরা সব সময়ে না হলেও প্রায়ই পরবর্তীকালের দক্ষিণপন্থী হয়ে যান। আজকের কংগ্রেসের মধ্যে বাম ও দক্ষিণ কোনও বিভেদ করা উচিত নয়। সমগ্রভাবে কংগ্রেসই বামপন্থী, এ-কথা বলা অর্থহীন প্রলাপ। এখন সময় এসেছে সত্যকে স্বীকার করার, সে-সত্য যতই অপ্রিয় হোক।

১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ কংগ্রেসে বামপন্থীদের সংখ্যা এবং সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতার ফলে। ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরে প্রথম দক্ষিণপন্থীদের তরফ থেকে আওয়াজ উঠল, বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা আর সম্ভব নয়, তারা এত গোলমাল করছে এত জ্বালাতন করছে যে তাদের সঙ্গে আর কাজ করা যায় না। এই নতুন জিগির শেষপর্যন্ত চরমে পৌঁছয় ১৯৩৯-এ, যখন দক্ষিণপন্থীরা সুচিন্তিতভাবে ঠিক করলেন বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতার অবসান করা হোক। দক্ষিণপন্থীদের জোরালো দাবি যে ক্যাবিনেট অথবা ওয়ার্কিং কমিটিতে বিভিন্নমতের সদস্য রাখা চলবে না, সে-দাবির আর কী তাৎপর্য থাকতে পারে? তিন বছর তাঁরা বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারলেন, কিন্তু এর পরে আর পারছেন না। কেন? কারণ কংগ্রেস শান্ত ও নিরপেক্ষভাবে বামপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি দেখে আর স্থির থাকতে পারছে না।

নতুন মন্ত্রিসভা বা ওয়ার্কিং কমিটির এই সমস্যা নিরসনের জন্যে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ১৯৩৯-এর ২৯ এপ্রিল কলকাতায় যখন অধিবেশনে বসল, বামপন্থীরা দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাইলেন, এবং তাঁরা স্লোগান দিলেন, মিশ্র ক্যাবিনেট চাই। কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং তাঁরা ধ্বনি তুললেন অমিশ্র ক্যাবিনেটের, তার ফলে আপসের ঐক্যের এবং সহযোগিতার অবসান হল দক্ষিণপন্থীদের দ্বারাই। আজ দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের কমে আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হবেন না। ঐক্যের খাতিরে বামপন্থীদের কি তাতে সম্মত হওয়া উচিত? যদি তা করা হয়, ফল কী হবে? তাতে কি প্রগতির চাকাতেই আমাদের তেল দেওয়া হবে, না আমাদের সহকর্মীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে মজবুত করা হবে?

দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করার পর একমাত্র যদি দক্ষিণপন্থীদের কোনও সক্রিয় প্রগতিশীল ভূমিকা থাকে, তা হলেই বামপন্থীরা আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত বছর মার্চ ও এপ্রিলে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার যে পত্রবিনিময় হয়েছিল, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় তিনি এখন আর আগামী সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তাভাবনা করছেন না। যে-সব মন্ত্রী এবং তাঁদের পথপ্রদর্শকরা বর্তমানে কংগ্রেসে আধিপত্য বিস্তার করেছেন, তাঁরাও সংঘর্ষের কথা ভাবছেন না। এই অবস্থায় একটা বাহ্যিক ঐক্য বজায় রাখার নামে আত্মসমর্পণ করলে প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের মধ্যেকার অচলাবস্থাকেই এবং প্রতিক্রিয়াশীলতাকেই স্থায়ী করা হবে। আমরা সে-কাজ করতে পারি না। আমাদের সে-কাজ করা উচিত নয়।

অতএব এখন সময় এসেছে দক্ষিণপন্থীদের থেকে বামপন্থীদের অস্তিত্ব আলাদা করে নেওয়ার এবং নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করার। সে কাজ করা হলে কংগ্রেসে বামপন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে, এবং তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নামে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম আবার আরম্ভ করতে পারবে। আজ বামপন্থীদের সেটাই কর্তব্য। সেই কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই ফরওয়ার্ড ব্লকের উদ্ভব।

বামপন্থীদের সঙ্ঘবদ্ধ করবার এই দায়িত্ব বর্তমান বামপন্থী দলগুলি গ্রহণ করতে পারত কিন্তু যে-কোনও কারণে হোক, সে কাজ তারা করেনি। গত বছর যখন বামপন্থী কংগ্রেস-সদস্যেরা একটি বামপন্থী ব্লক গঠনের প্রস্তাব করছিলেন, মনে হয়েছিল বামপন্থী রাজনীতিকেরা এই প্রস্তাবটি স্বীকার করে নেবেন, এবং তাকে কাজে পরিণত করবেন। কিন্তু পরে তাঁরা তাঁদের মত পরিবর্তন করলেন। তখন বামপন্থীদের মধ্যে থেকে নতুন নতুন সদস্যদের সাহায্য নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের গঠন অপরিহার্য হয়ে উঠল। কাজেই এই ফরওয়ার্ড ব্লক শুধুমাত্র কংগ্রেসের ভিতরকার তাগিদ থেকেই জন্ম নেয়নি, ইতিহাসের প্রয়োজনে এর অমোঘ সৃষ্টি। উপরন্তু আজকের পরিস্থিতিও এর গড়ে ওঠার কারণকে যথার্থ বলে প্রতিপন্ন করে। এইভাবে এই পরিস্থিতিতে এর উদ্ভব হওয়ার কারণে ফরওয়ার্ড ব্লকের মৃত্যু হতে পারে না। আমাদের রাজনৈতিক বিবর্তনের এটি একটি অনিবার্য ঘটনা। ফরওয়ার্ড ব্লক বেঁচে থাকবে, দিনে দিনে এর শক্তি বাড়বে। আমার এই কথার সত্যতায় যাঁদের সন্দেহ আছে তাঁরা ধৈর্য ধরুন, কংগ্রেস এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের দিকে লক্ষ রাখুন।

২

ফরওয়ার্ড ব্লকের ভূমিকা

১২ আগস্ট ১৯৩৯

প্রথমদিকে কয়েকটি ছোটখাটো সংঘর্ষের পর বামপন্থীরা ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হলেন। এতদিন পর্যন্ত যাঁরা নেতা ছিলেন যেমন মি. জিন্নাহ, শ্রী বি. সি. পাল ও শ্রী বি চক্রবর্তী ইঙ্গিত পেলেন যে কংগ্রেস ছেড়ে যেতে হবে। বামপন্থীরা কংগ্রেসে আধিপত্য লাভ করলেন এবং কিছুকালের জন্যে কংগ্রেসে তাঁদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অধিকৃত হল। ১৯২২-এ আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত হয়ে যাওয়ার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে ভাঙন দেখা দিল এবং আন্দোলন আইনসভার মধ্যে নিয়ে যাওয়া হবে কি না এই বিষয়ে তাঁরা দু'ভাগ হয়ে গেলেন— একদল যাঁরা স্বরাজ চান এবং অপর দল যাঁরা পরিবর্তন চান না। কিছু দিন পরে কংগ্রেসের মাধ্যমে সে বিরোধ মিটে গেল। কারণ কংগ্রেস আন্দোলনকে আইনসভার মধ্যে নিয়ে যাওয়ার স্বরাজ্যবাদী পরিকল্পনা গ্রহণ করল।

১৯২৮ সালে নেহরু কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হল, যাতে অধিকসংখ্যক সদস্য ডমিনিয়ন স্টেটাস-এর ভিত্তিতে একটি ভারতীয় সংবিধান সুপারিশ করল। তখন বামপন্থীরা ইন্ডিপেনডেন্স লীগ রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। কলকাতায় অনুষ্ঠিত ১৯২৮-এর ডিসেম্বরের বার্ষিক সম্মেলনে ইন্ডিপেডেন্স লীগের সদস্যরা চেষ্টা করলেন, যাতে কংগ্রেস তার নীতি পরিবর্তন করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে স্বাধীনতা কংগ্রেসের লক্ষ্য। সে চেষ্টা বিফল হল। এই প্রচেষ্টার বিরোধিতা আসে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের সংগঠনের মূল ভাগ থেকে। 'ইন্ডিপেনডেন্স লীগ'-এর সঙ্গে সংঘাত এক বছর ধরে চলে। শেষ পর্যন্ত ১৯২৯-এর ডিসেম্বর মাসে লাহোর অধিবেশনেই মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শে স্বাধীনতা লক্ষ্য ঘোষণা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এই আপসের কালে কংগ্রেসের সব গোষ্ঠী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেয়।

১৯৩৩ সালে সংগ্রাম স্থগিত রাখা এবং অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক একটি সংসদীয় কর্মসূচি গ্রহণের ফলে বামপন্থীরা বিদ্রোহ করলেন। তখন কংগ্রেস সমাজবাদী পার্টির জন্ম হল এবং ঠিক সময়ে এর আবির্ভাব এবং এর গতিশীল কর্মতৎপরতা সাংবিধানিক পন্থার দিকে কংগ্রেসের সরে যাওয়া অনেকটা রোধ করতে পেরেছিল। অবিলম্বে কংগ্রেস সমাজবাদী পার্টি কংগ্রেসের বামপন্থীদের একত্র হওয়ার একটি কেন্দ্র হয়ে উঠল।

১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭-এর মধ্যে কংগ্রেস সমাজবাদী দল সংখ্যায় এবং প্রভাবে অনেকটা এগিয়ে গেল, কিন্তু ১৯৩৮ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে দেখা গেল কংগ্রেস সমাজবাদী দল আর সেরকম দৃঢ়ভাবে এগোতে পারছে না। আমার সভাপতির ভাষণে আমি বললাম, কংগ্রেসের মধ্যে সি. এস. পি-র ভূমিকা হওয়া উচিত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বামপন্থী ভূমিকা, সমাজতান্ত্রিক ভূমিকা নয় এবং একমাত্র প্রথমোক্ত ভূমিকাতেই সে অগ্রগমন করতে পারবে।

হরিপুরা কংগ্রেসের পর যে সব সমাজতন্ত্রবাদী এবং কমিউনিস্ট বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা

হয়েছিল, তাঁরা সবাই এই বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। সবাই মোটামুটি মনে করেছিলেন, প্রগতিশীল, বিপ্লবী এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যাঁরা কংগ্রেসের মধ্যে আছেন এবং যাঁরা সমাজতন্ত্রবাদী কিংবা কমিউনিস্ট দলে যোগ দিতে প্রস্তুত নন, তাঁদেরকে একটি ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে সংগঠিত করা উচিত। আবার আরও মনে হয়েছিল, একমাত্র ওই উপায়েই দক্ষিণপন্থীদের প্রভাব প্রতিরোধ করা এবং একটি মার্কসবাদী দলের জন্যে জমি তৈরি করা যেতে পারে।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ, যাঁদেরকে মনে করা যেতে পারে কংগ্রেসে বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দল (কিংবা গান্ধী দল)-এর লৌহকাঠামো, তাঁরা ১৯৩৮-এর মার্চ মাসে ওড়িশার দেলাঙে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে গান্ধী সেবা সঙ্ঘ বামপন্থীদের বিরুদ্ধাচরণের সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যান্য কিছু কিছু বিষয়ের সঙ্গে তাঁরা ঠিক করেন, শ্রমিকদের মধ্যে নিজেদের লোক পাঠাবেন, যাতে যে-সব ট্রেড ইউনিয়ন নেতা দেশে শ্রেণিসচেতন শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষপাতী তাঁদের বহিষ্কার করা যায়। আরও সিদ্ধান্ত হয়, দেশের প্রাদেশিক ও অন্যান্য কংগ্রেস সংগঠনে ক্ষমতা দখল করার জন্য নিজেদের বড় বড় নেতাদের পাঠানো হবে।

অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি যে সংসদীয় কার্যক্রম ১৯৩৪ সালে গ্রহণ করেছিল তার চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় ১৯৩৭ সালে বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের মধ্যে। এর দ্বারা দক্ষিণপন্থীরা নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে এবং নিজেদের প্রভাব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হলেন, যার ফলে ১৯৩৮ সালে তাঁদের পক্ষে বামেদের ব্যাপক বিরুদ্ধচারণ সম্ভব হয়। কৃতসংকল্প হয়ে এই যে আক্রমণ তাঁরা করলেন, এর সামনে বামপন্থীরা তাঁদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারতেন একমাত্র যদি তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হতেন, শৃঙ্খলাবদ্ধ হতেন।

কংগ্রেসের সমস্ত প্রগতিশীল বৈপ্লবিক এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানুষ যদি কংগ্রেস সমাজবাদী দলের মঞ্চে একজোট হতেন, সব কিছু খুব সরল হয়ে যেত। কিন্তু তা হয়নি। সেই কারণে হরিপুরা কংগ্রেসের পরে একটি ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে সমস্ত বামপন্থীকে সঙ্ঘবদ্ধ করবার জন্য একটি বামপন্থী ব্লকের চিন্তার উদ্ভব হয়। বর্তমান বামপন্থী দলগুলি যদি একটি বাম-ব্লক (এখন তার নাম দেওয়া হয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লক) গড়ে তোলার দায়িত্ব নিত, তা হলে বামপন্থীদের সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজ এতদিনে দ্রুত এগিয়ে যেত।

কিন্তু কোনও কোনও ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী যদি আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ নাও করেন, আমাদের উদ্দেশ্য পূরণে আমরা যেন অবহেলা না করি। সেই জন্যই যাঁদের পাওয়া গিয়েছে তাঁদের নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ব্লক বেড়ে উঠবে, প্রসার লাভ করবে অতি দ্রুত, যেমনটি আগে কখনও হয়নি, তার পথে যতই বাধাসৃষ্টি করা হোক। এবং এমন সময় অবিলম্বে আসবে যখন, বর্তমানে যাঁরা ব্লকে যোগ দিতে দ্বিধা করছেন, তাঁরাও যোগ দেবেন। বামপন্থী শক্তিকে সংগঠিত করা, কংগ্রেসের অধিকাংশ অংশের সমর্থন লাভ করা এবং জাতীয় সংগ্রাম আবার আরম্ভ করা, এই তিনটি হল ফরওয়ার্ড ব্লকের এবং কংগ্রেসের বামপন্থীদের কর্তব্য। যাঁরা আমাদের সমালোচনা করছেন, ছিদ্রান্বেষণ করছেন, তাঁরা এর চেয়ে ভাল বিকল্পের কথা বলুন। তবে আমাদের মনে হয়, অন্য কোনও বিকল্প সম্ভব নয়।

দক্ষিণপন্থী, যাঁরা সংগ্রামের চিন্তা পরিত্যাগ করেছেন, সংবিধানিক পন্থা এবং সংশোধনবাদের কথা চিন্তা করছেন, তাঁদের কবল থেকে কংগ্রেসকে এখন উদ্ধার করতে

হবে। একমাত্র বামপন্থীদের পক্ষেই সম্ভব কংগ্রেসের বিপ্লবী চরিত্র রক্ষা করা এবং জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম অবিলম্বে পুনরায় আরম্ভ করা।

আজ কোনও কোনও মহলে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি সস্তা হয়ে গেছে। কোনও কোনও প্রদেশে এমন এমন সমাজতন্ত্রবাদীও দেখা যায় যাঁরা মন্ত্রীদের অনুচর। অতএব সমাজতন্ত্রবাদীর ভেক ধরেছেন যে-সব দক্ষিণপন্থী তাঁদের সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। প্রয়োজন কথার নয়, কাজের। প্রকৃত সমাজতন্ত্রবাদীদের এখন তাঁদের দৈনন্দিন কাজকর্মে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বামপন্থী ভূমিকা পালন করতে হবে, শুধু বামপন্থী স্লোগান আওড়ালে আর ঝাঁঝালো বক্তৃতা দিলে কাজ হবে না।

কংগ্রেসের সমস্ত প্রগতিশীল বিপ্লবপন্থী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিকে ফরওয়ার্ড ব্লক ঐক্যবদ্ধ করবে, তাঁরা সমাজতন্ত্রবাদী হন বা না হন। এইভাবে সংগঠিত জনগণ নিজেদেরকে অস্ত্রসজ্জিত করবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের জন্য যার দ্বারা ভারত তার জন্মগত অধিকার, স্বাধীনতা লাভ করবে। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা আহরণ মানেই ফরওয়ার্ড ব্লকের বিলোপ নয়। তখন আরম্ভ হবে তার জীবনে তার কাজকর্মে নতুন এক অধ্যায় এবং নিঃসন্দেহে সেই অধ্যায় হবে সমাজতন্ত্রবাদের।

৩

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবৃতি

১৯ আগস্ট ১৯৩৯

আমাকে তিন বছরের জন্য কার্যত কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করার যে সিদ্ধান্ত ওয়ার্কিং কমিটি নিয়েছে তাকে আমি স্বাগত জানাই। দক্ষিণপন্থীদের সংগঠিত করার যে প্রক্রিয়া গত কয়েক বছর ধরে চলছে, এবং প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের ফল যা আরও জোরদার হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত তারই যুক্তি-সম্মত উৎপত্তি। ওয়ার্কিং কমিটির এই পদক্ষেপ প্রকট করেছে কংগ্রেসের স্থায়ী সংখ্যাগুরুর প্রকৃত চরিত্র, এবং তাঁরা কী ভূমিকা পালন করে এসেছেন। অবশ্য তাঁদের চোখে দেখলে আমাকে প্রদত্ত শাস্তি পুরোপুরি যথার্থ। সাংবিধানিক পন্থায় সংশোধনবাদের দিকে ক্রমাগত সরে যাওয়ার সম্পর্কে দেশকে সাবধান করে দিয়ে, কংগ্রেসের বিপ্লবী মনোভাব বিনষ্ট হয় এমন সব প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, বামপন্থী শক্তিকে সংহত করবার চেষ্টা করে, এবং সবশেষে, (যদিও এটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়) দেশবাসীকে ক্রমাগত আগামী সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান করে আমি যে অপরাধ করেছি তার জন্য আমাকে মূল্য দিতে হবে। আমাকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তার জন্যে আমার দেশবাসীগণের মধ্যে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ হয়তো আঘাত পেয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু আমি পাইনি। আমার মনে হয়েছে সাংবিধানিক পন্থা এবং গণসংগ্রামের মধ্যে যে সংঘাত তারই এটা যুক্তিসংগত পরিণতি। আমাদের রাজনৈতিক বিবর্তনের এটি একটি অনিবার্য পর্যায়। সেই কারণে আমার মধ্যে

আমি তিক্ততা কিংবা ক্রোধের চিহ্নমাত্র খুঁজে পাচ্ছি না। আমার শুধু এইটাই দুঃখ যে ওয়ার্কিং কমিটি বুঝতে পারল না, এই ধরনের কাজে আমার চেয়ে তাদেরই ক্ষতি হবে বেশি।

ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্যদের এবং সাধারণভাবে বামপন্থীদের ও জনসাধারণের কাছে আমি আবেদন করতে চাই, তাঁরা যেন উপরোক্ত প্ররোচনা সত্ত্বেও শান্ত ও সংযত থাকেন। এবং অধিকতর ধৈর্য ও অবিচল স্থৈর্য সহকারে কাজ করে যান। আজ যদি আমার ওপর আক্রমণ হয়, তাতে কী এসে যায়? আমি আরও বেশি আনুগত্য সহকারে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকব, এবং জাতির একজন সেবক হিসাবে কংগ্রেস ও দেশের কাজ করে যাব। আমার দেশবাসীকে আমি আহ্বান করছি আপনারা লাখে লাখে কংগ্রেসে যোগ দিন এবং ফরওয়ার্ড ব্লকে নাম লেখান। একমাত্র তা হলেই আমরা কংগ্রেসের সদস্যসাধারণকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝাতে পারব। সাংবিধানিক পন্থা এবং সংশোধনবাদের বর্তমান নীতি বদলাতে পারব এবং ভারতীয় জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম আবার আরম্ভ করতে পারব।

পরিশেষে আমি জনসাধারণকে অনুরোধ করতে চাই, তাঁরা যেন না ভোলেন, আজকে যা ঘটেছে সেটা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। অনেক বছর আগে বামপন্থীরা কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁরা বৃহত্তর সংখ্যায় ফিরে এলেন এবং তাঁদের নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে কংগ্রেস বাধ্য হল। এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে আমরা বামপন্থীরা যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি সে লক্ষ্য যথার্থ, এবং ওয়ার্কিং কমিটি যে কাজ করল তার ফলে আমাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তাই হবে, তাতে বাধা হবে না। দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত আমরা যে অভূতপূর্ব সাড়া পেলাম তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, তার আর বেশি দেরি নেই, যেদিন কংগ্রেসকে আমরা নতুন জীবন দান করতে পারব, তার সংগ্রাম আবার আরম্ভ করতে পারব।

৪

জাতির জন্য নির্মিত ভবন— ‘মহাজাতি সদন’*

১৯ আগস্ট ১৯৩৯, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ‘মহাজাতি সদন’ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র বসুর বাংলায় প্রদত্ত ভাষণ†

বহুদিনকার এক স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করবার প্রথম প্রচেষ্টা উপলক্ষে আজ আমরা সকলে একত্রিত হয়েছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা এবং সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার ও নির্য্যাতন ভোগ করে আসছেন, তাঁরা অনেকদিন থেকে একটি অভাব বোধ করে

* এই অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক ভাষণ দেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভাষণটি পরিশিষ্টে প্রদত্ত হল।

† মূল বানান অপরিবর্তিত।

আসছেন; সে অভাব একটা গৃহের যেখানে তাঁদের যাবতীয় সেবাকার্য্য আশ্রয় পেতে পারে এবং সেটা তাঁদের আশা, আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন ও আদর্শের একটা বাহ্য প্রতীক স্বরূপ হতে পারে। ইতিপূর্ব্বে আমাদের জাতীয় নিকেতন নির্ম্মাণের চেষ্টা একাধিকবার করা হয়েছে। কিন্তু কৃতকার্য্য হয়নি। পরিশেষে, আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা "মহাজাতি সদনের" ভিত্তি স্থাপনা আজ করা হবে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা আজ আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়েছি এবং আপনার দ্বারা এই বীজ আজ বপন করাতে পারছি যার ফলের দ্বারা আমরা একদিন ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট ও সুসমৃদ্ধ করে তুলতে পারব।

আজকার এই শুভ অনুষ্ঠানে আমাদের অতীত ও ভবিষ্যতের কথা আপনা-আপনি মনে আসছে। এই ভূমিতেই সেই আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল যার দ্বারা আমাদের ধর্ম্ম ও কৃষ্টি, সংস্কারের মধ্যে দিয়ে পুনর্জীবন লাভ করেছে। এই আন্দোলন প্রাদেশিকতার গণ্ডী মানেনি— এমনকী জাতীয়তার গণ্ডীও অতিক্রম করেছিল। রামমোহন ও রামকৃষ্ণ যে বাণী দিয়েছিলেন— তাহা কি বিশ্বমানবের জন্য নয়? তাঁদের ভিতর দিয়ে কি সুপ্তোত্থিত, নবজাগ্রত ভারত আত্মপ্রকাশ লাভ করেনি, আমরা জানি যে আমরা তাঁদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারি।

নব জাগরণের ফলে, প্রবুদ্ধ ভারতের মুক্ত আত্মা যখন 'বহু'র মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাইলেন, তখন দেখলেন যে এক দিকে রাষ্ট্র এবং অপর দিকে সমাজ তাঁকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। তারপর আরম্ভ হল— রাষ্ট্র বিপ্লব এবং সমাজ-বিপ্লব। সেই বিপ্লবের সূচনাও এই ভূমিতে— যেখানে একদিন ধর্মবিপ্লবের আবির্ভাব হয়েছিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের (বা নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার) জন্ম হয়। কুড়ি বৎসর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পর আমাদের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে এক নতুন যুগ আরম্ভ হয়— সেটা সাবলম্বনের যুগ, স্বদেশির ও বিদেশি-বর্জ্জনের যুগ। তারপর এক দিকে বঙ্গভঙ্গ এবং অপর দিকে আমলাতন্ত্রের দমননীতি এমন একটা বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করলে যে দেশের তরুণ সম্প্রদায় উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে, আত্মসংযম হারিয়ে, ইতিহাসের চিরপরিচিত পন্থা— সশস্ত্র বিদ্রোহের পন্থা— অবলম্বন করলে। দশ বৎসর অতীত হতে না হতে, আমরা পুনরায় আমাদের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করলাম— "অহিংস অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের অধ্যায়।"

আজ ভারতের রাষ্ট্রীয় গগন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। আমরাও ইতিহাসের এমন এক চৌমাথায় গিয়ে পড়েছি যেখান থেকে বিভিন্ন দিকে পথ বেরিয়ে গেছে। এখন আমাদের সম্মুখে সমস্যা এই— যে নিয়মতান্ত্রিকতার পথ আমরা ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বর্জ্জন করেছিলাম, পুনরায় কি সেই পথে ফিরে যাব? অথবা আমরা কি গণ-আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়ে গণ-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হব? এখানে তর্ক-বিতর্ক আমি সুরু করব না— আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে নবজাগ্রত ভারতীয় মহাজাতি স্বাবলম্বন, গণ-আন্দোলন ও গণ-সংগ্রামের পন্থা কিছুতেই পরিত্যাগ করবে না। এই পন্থার দ্বারাই তারা অনেকটা সাফল্য লাভ করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও বেশি সাফল্য লাভ করবে বলে বিশ্বাস করে। সর্ব্বোপরি, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের সহিত একটা তুচ্ছ আপোষ করে তারা কিছুতেই তাদের জন্মগত অধিকার— স্বাধীনতা— হেলায় ছেড়ে দিবে না।

যে স্বপ্ন দেখে আমরা বিভোর হয়েছি তাহা শুধু স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নয়। আমরা চাই ন্যায় ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক স্বাধীন রাষ্ট্র— আমরা চাই এক নূতন সমাজ ও এক

নূতন রাষ্ট্র। যার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠবে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম আদর্শগুলি। গুরুদেব! আপনি বিশ্বমানবের শাশ্বত কণ্ঠে আমাদের সুপ্তোত্থিত জাতির আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছেন। আপনি চিরকাল মৃত্যুঞ্জয়ী যৌবনশক্তির বাণী শুনিয়ে আসছেন। আপনি শুধু কাব্যের বা শিল্পকলার রচয়িতা নন। আপনার জীবনে কাব্য এবং শিল্পকলা রূপ পরিগ্রহ করেছে। আপনি শুধু ভারতের কবি নন— আপনি বিশ্বকবি। আমাদের স্বপ্ন মূর্ত হতে চলেছে দেখে যে সমস্ত কথা, যে সমস্ত চিন্তা, যে সমস্ত ভাব আজ আমাদের অন্তরে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে— তাহা আপনি যেমন উপলব্ধি করবেন, তেমন আর কে করবে? যে শুভ অনুষ্ঠানের জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি তার হোতা আপনি ব্যতীত আর কে হতে পারবে? গুরুদেব! আজকার এই জাতীয় যজ্ঞে আমরা আপনাকে পৌরহিত্যের পদে বরণ করে ধন্য হচ্ছি। আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা "মহাজাতি সদনের" ভিত্তি স্থাপনা করুন। যে সমস্ত কল্যাণ-প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তি ও জাতি মুক্ত জীবনের আস্বাদ পাবে এবং ব্যক্তির ও জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হবে— এই গৃহ তারই জীবন-কেন্দ্র হয়ে "মহাজাতি সদন" নাম সার্থক ক'রে তুলুক— এই আশীর্ব্বাদ আপনি করুন। এবং আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা অবিরাম গতিতে আমাদের সংগ্রাম-পথে অগ্রসর হয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করি এবং আমাদের মহাজাতির সাধনাকে সকল রকমে সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত করে তুলি।

৫

আমাদের সমালোচকগণ

'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকা, ১৯ আগস্ট ১৯৩৯ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

যেহেতু আমরা বৈধ সমালোচনার অধিকারে বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করি সুস্থ সমালোচনা বিকাশের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়, ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্ম থেকে তার উদ্দেশে যে সমালোচনা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে তাকে আমরা স্বাগত জানাই। সে সব সমালোচনা আমরা সযত্নে পরীক্ষা করেছি এবং তা থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করেছি। যথাসাধ্য তার উত্তর দেওয়ারও আমরা চেষ্টা করেছি। আমরা দেখে আনন্দিত হয়েছি যে তার ফলে আগে যাঁরা আমাদের সমালোচক ছিলেন, তাঁদের কয়েকজন এখন আমাদের সমর্থক।

কিন্তু মনে হচ্ছে এক শ্রেণির সমালোচক প্রতিজ্ঞা করেছেন, তাঁরা সন্তুষ্ট হবেন না, এবং তাঁরা একই সমালোচনার পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছেন। তাঁদের অধিকাংশ দক্ষিণপন্থী হলেও তাঁদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছেন যাঁদেরকে সাধারণত বামপন্থী বলে মনে করা হয়। দক্ষিণপন্থী সমালোচক, যাঁদের ভ্রান্তি কিছুতেই দূর করা সম্ভব নয়, তাঁদের সমালোচনার কারণ আন্দাজ করা কঠিন নয়, কিন্তু যাঁরা নিজেদেরকে বামপন্থী বলেন, কিন্তু মনে হয়.

ফরওয়ার্ড ব্লককে আক্রমণ করে আনন্দ পান, তাঁদেরকেই বোঝা কঠিন।

প্রথম দিকে বলা হত, ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্মের কারণ ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, ব্লকের কোনও ইতিবাচক কর্মসূচি নেই, এবং প্রকৃতপক্ষে সেটি একটি 'অ্যান্টি ব্লক'। বলা হত ফরওয়ার্ড ব্লক গান্ধীবাদের নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তবু কংগ্রেসের মধ্যে একটি নতুন সংগঠন গড়ে তুলতে চাইছে অকারণে বিভেদ সৃষ্টির জন্য, এবং ফরওয়ার্ড ব্লক গড়ে তোলার একমাত্র উদ্দেশ্য কংগ্রেস কার্যনির্বাহী সমিতি কিংবা তার শীর্ষনেতৃত্বের সঙ্গে সংঘাত। ২২ জুন বোম্বাইয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের বার্ষিক অধিবেশনের পর ওরকম অভিযোগ প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে, কারণ ব্লকের নীতি এবং কর্মসূচি সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে, যাতে ওসব বিষয়ে সন্দেহের আর কোনও অবকাশ নেই। কিন্তু অনেক উপলক্ষে যথোপযুক্ত জবাব দেওয়া সত্ত্বেও অন্য এক ধরনের সমালোচনা এখনও চলছে।

ওসব সমালোচনা দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণির সমালোচনার মূল বক্তব্য ফরওয়ার্ড ব্লক তাদের দলের মধ্যে সুবিধাবাদী ও গণতন্ত্রবাদবিরোধী ফ্যাসিস্টদের গ্রহণ করেছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের সুবিধাবাদের অভিযোগ সত্যিই হাস্যকর। ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্যকে দু'দিকে সংগ্রাম করতে হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং কংগ্রেস আমলাতন্ত্র এবং দু'দিক থেকেই তাকে অন্যায় নির্যাতন সহ্য করতে হয়। ব্যক্তিগতভাবে তার লাভ করার কিছু নেই। বরং সবকিছু হারাবার সম্ভাবনা আছে। যে পথে গেলে বাধাবিপত্তি সবচেয়ে কম আসে, সুবিধাবাদীদের যে পথ, তা সোজা পৌঁছে দেয় দক্ষিণপন্থীদের শিবিরে। সেখানে দেখা যায় কংগ্রেস মন্ত্রীদের, যাঁরা কংগ্রেসের বিরোধিতা করেছেন খোলাখুলি, যতদিন না কংগ্রেস সত্যাগ্রহ ত্যাগ করে সাংবিধানিক পথ গ্রহণ করেছে। অনেককে দেখা যায়, যাঁরা ব্রিটিশদের জেলখানার ত্রিসীমানার মধ্যে যাননি। দেখা যায় কোটিপতিদের যাঁরা দেশপ্রেমিকের ভান করেন, কারণ তাঁরা বলেন তাঁরা গান্ধীবাদী। দেখবেন এমন কংগ্রেসিদের যাঁরা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের সদসদ্যপদের জন্য মনোনয়ন লাভ করেন কংগ্রেসি মন্ত্রীদের আনুকূল্যে (যেমন, মধ্য প্রদেশে), যদিও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে সরকারি মনোনয়ন স্বীকার করায় কংগ্রেসের স্পষ্ট নিষেধ আছে। তারপর, আপনি দেখবেন, কংগ্রেসের মন্ত্রীরা (যেমন, বোম্বাইয়ে) দলে দলে জে. পি. (জাস্টিস অব দি পিস) হচ্ছেন অর্থাৎ সম্মানীয় অবৈতনিক বিচারক যাতে আরও বেশি বেশি সুযোগ-সুবিধা হাতে আসে, যদিও কংগ্রেস অনেক দিন আগে কংগ্রেসিদের পরামর্শ দিয়েছে, জে. পি. কিংবা অবৈতনিক বিচারক না হতে। যে-সব জমিদার শিল্পপতি এবং ক্রোড়পতি আমাদের কংগ্রেসি মন্ত্রীদের চারপাশে ঘোরাঘুরি করছেন তাঁরা যদি সুযোগসন্ধানী না হন, তবে তাঁরা কী? এবং বোম্বাই এবং মাদ্রাজের যে-সব ব্রিটিশ মালিকানার সংবাদপত্র রাতারাতি মন্ত্রীদের মুখপাত্র হয়েছে তারা কি নির্লজ্জ, সুবিধাবাদী নয়? সম্পূর্ণত দক্ষিণপন্থীরা এবং তাঁদের বন্ধুরাই প্রকৃত সুযোগসন্ধানী।

আর, আমাদের তথাকথিত বামপন্থীদের বিষয়ে বলতে গেলে, এ কথা কি বলা যায় না, যে মুখে বামপন্থার বুলি আওড়াল আর কাজে দক্ষিণপন্থীদের মতো আচরণ, মুখে বলা, গান্ধীবাদকে উৎখাত করব, আর দক্ষিণপন্থীরা ধমক দিলেই তাদের পদাবনত হব, ওয়ার্কিং কমিটিকে বয়কট করব, আবার তাদের সভা সমিতিতেও যোগ দেব, এসব কি সুবিধাবাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ নয়?

এবারে ফ্যাসিস্টদের কথায় আসি। বোঝা কঠিন ভারতীয় প্রসঙ্গে ফ্যাসিস্ট বলতে ঠিক

কী বোঝায়; যদি শব্দটি তার বৈজ্ঞানিক কিংবা লক্ষণগত অর্থে ব্যবহার করা হয়। তা সত্ত্বেও ফ্যাসিস্ট বলতে যদি তাঁদের বোঝায় যাঁরা নিজেদের হিটলার কিংবা হিটলারের চেয়েও বড় হিটলার কিংবা হবু হিটলার বলে বড়াই করেন, সেই জাতীয় মনুষ্য দক্ষিণপন্থীদের শিবিরেই দেখতে পাওয়া যাবে।

অন্য ধারায় যে-সমালোচনা, তার মূল কথা হল, ফরওয়ার্ড ব্লক কংগ্রেস বিরোধীদের সঙ্গে দহরম-মহরম করছে এবং শীঘ্রই কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে তাদের সহায়তায় নতুন সংগঠন তৈরি করবে। এই রকম ভাবে যাঁরা ঘুরিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের নিন্দা করতে চান কংগ্রেস-বিরোধী গোষ্ঠী অপবাদ দিয়ে, তাঁরা ভাল করেই জানেন, কংগ্রেসের সদস্য না হয়ে কেউ ব্লকের সদস্য হতে পারেন না, এবং আরও জানেন, ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্য হতে গেলে কংগ্রেসের সদস্য হওয়া ছাড়াও বিপ্লববাদী হতে হয়। উপরন্তু অসংখ্য মঞ্চ থেকে আমি অসংখ্য বার ঘোষণা করেছি, কোনও অবস্থাতেই আমরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসব না। আমরা কংগ্রেস পরিত্যাগ করতে চাই না, কংগ্রেসকে বদলে ফেলতে চাই। আমাদের সমালোচকবৃন্দও সে কথা যথেষ্ট জানেন, কিন্তু তবু তাঁরা আমাদের বিরুদ্ধে এইসব অভিযোগ করে চলেছেন, এই আশায় যে যথেষ্ট পরিমাণ কালিমা যদি লেপনও করা যায়, তার খানিকটা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত গায়ে লেগে থাকবে।

আমাদের সমালোচকেরা সম্ভবত এই জন্য আমাদের ঈর্ষা করেন যে তাঁদের দক্ষিণপন্থী বন্ধুরা তাঁদের দলে সংখ্যালঘুদের এবং ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষকে টেনে আনতে পারছেন না, যখন একদম শুরু থেকেই ফরওয়ার্ড ব্লক তাঁদের সহানুভূতি বহুল পরিমাণে আকর্ষণ করতে সমর্থ। এইসব সম্প্রদায়ের মানুষ, যাঁরা কংগ্রেসের বাইরে আছেন, তুলনামূলক ভাবে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের চেয়ে বামপন্থীদের প্রতি তাঁরা বেশি সহানুভূতিসম্পন্ন, অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা যদি কংগ্রেসে যোগ দেন সে কংগ্রেস হবে বামপন্থীদের নিয়ন্ত্রণাধীন। তার কারণ সম্ভবত, বামপন্থীরা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে, গণআন্দোলনের পাশে দাঁড়ায় এবং জনকল্যাণকারী কর্মসূচির পক্ষ নেয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার প্রতি আপসহীন বিরোধিতা ঘোষণা করে।

কিন্তু এই কৌশলে কাজ হবে না। আজ ভারতীয় জনগণকে এ দিয়ে বিভ্রান্ত করা যাবে না। তারা এখন আর অত অজ্ঞ নয় যতটা হলে স্বার্থান্বেষীর কার্যোদ্ধার সম্ভব। ফলে এইসব সমালোচকদের সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ফরওয়ার্ড ব্লক এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাবে। দক্ষিণপন্থীদের সংহতি ও শক্তিবৃদ্ধির এবং সাংবিধানিক-পন্থার একমাত্র বিকল্প ফরওয়ার্ড ব্লকের গৃহীত কর্মসূচি। ফ্রন্টের ত্রিবিধ কর্তব্য বামপন্থী সংহতি সাধন, কংগ্রেসের গরিষ্ঠসংখ্যক সদস্যকে আমাদের মতবাদ ও বিশ্বাসে প্রাণিত করে আমাদের দিকে নিয়ে আসা এবং কংগ্রেসের নামে ও কংগ্রেসের সম্মিলিত শক্তি নিয়ে জাতীয় সংগ্রাম পুনরায় আরম্ভ করা। ব্লক যার কথা বলছে তার চেয়ে ভাল কোনও বিকল্প যদি আপনারা দেখাতে পারেন, অবশ্যই, আমরা খোলা মন নিয়ে প্রস্তুত আছি, যদি আমাদের বোঝাতে পারেন, বোঝান। নেতিবাচক সমালোচনায় কোনও লাভ নেই, তাতে ব্যর্থতা এবং সর্বনাশ আসতে পারে।

৬

কালের দাবি

‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ পত্রিকা, ২৬ আগস্ট ১৯৩৯ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

যখন আমি এই নিবন্ধ লিখছি, সেই মুহূর্তে ইউরোপে কী হচ্ছে কে জানে? খবর এসেছে হের হিটলার পোল্যান্ডকে একটি চরমপত্র দিয়েছেন। সেটা খুবই সম্ভব। সেরকম হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। তাই যদি হয়ে থাকে, পোল্যান্ডের প্রতিক্রিয়া কী হবে? রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি যখন তাদের চোখের সামনে রয়েছে, স্বাধীনতা-প্রেমী পোলরা কি তাদের পবিত্র মাতৃভূমির জন্য লড়াই করবে? না কি চেকরা যে-পথে গেছে তারা সেই পথেই যাবে। মার্শাল পিলসুদস্কি যদি বেঁচে থাকতেন স্বচ্ছন্দে ভবিষ্যৎবাণী করা যেত, অনাক্রমণ চুক্তি এবং জার্মান চরমপত্র দেওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধ হবে। কিন্তু পোল্যান্ডের প্রধান সেনানায়ক আর নেই, এবং তাঁর অবর্তমানে তাঁর দেশবাসী কী করে সেটা দেখতে হবে। পোলরা যদি অত আবেগপ্রবণ না হত নির্ভয়ে বলা যেত জার্মানির কাছে তারা আত্মসমর্পণ করে শান্তি বজায় রাখবে। কিন্তু আজকের দিনে নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না, যদিও এ সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে যে গ্রেট ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের কূটনৈতিক চাপে শেষ পর্যন্ত পোল্যান্ড সিদ্ধান্ত নেবে, সাহসিকতার অপর দিক হল বিচারবুদ্ধিসংগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

এ কথা বললে ভুল হবে না যে জার্মানি আর পোল্যান্ডের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে ভারতবাসীদের সহানুভূতি পোলদের দিকে থাকবে। জার্মানির পক্ষে আমাদের বিশ্বাস করানো সহজ হবে না যে পোল্যান্ডের করিডর কিংবা অন্য কোনও এলাকা, যা নিয়ে যুদ্ধ বাধতে পারে, সেখানে পোলদের চেয়ে জার্মানদের সংখ্যা বেশি। তবে, ডানজিগের কথা বললে জার্মানিদের দাবি নিঃসন্দেহে তর্কাতীত এবং শুধু ডানজিগের প্রশ্ন নিয়ে যুদ্ধ বাধলে বিশ্বজনমতের সামনে জার্মানির দাবির কোনও জবাব থাকবে না।

আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ সম্পর্কে আমাদের মনোগত প্রতিক্রিয়া যাই হোক, জাতি হিসাবে আমাদের কী করা উচিত? যুদ্ধের আগুন যখন বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে তখন আমরা বসে বসে ভাবনাচিন্তা আর তর্কবিতর্ক করে যাব? জার্মান এবং রাশিয়ানরা, যারা গতকাল পর্যন্ত পরস্পরের চরম শত্রু ছিল, তারা যদি বিশ্বের এক সংকটের মুখে তাঁদের শত্রুতা শিকেয় তুলে রাখতে পারেন, কংগ্রেসের দুই প্রতিপক্ষ কি তাঁদের বিভেদ ভুলে পূর্ণ স্বরাজের দিকে হাত ধরাধরি করে জাতিকে নেতৃত্বে দিয়ে নিয়ে যেতে পারেন না? দলনিরপেক্ষ জাতীয় মন্ত্রিসভা কি ইউরোপীয়দেরই একচেটে হয়ে থাকবে? এরকম জরুরি অবস্থার সময় কি কংগ্রেসিরা অমিশ্র মন্ত্রিসভার ধারণা ত্যাগ করে মিশ্র মন্ত্রিসভা গঠন করতে শিখবেন না? এর উত্তর একমাত্র কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা এবং তাঁদের গুরু মহাত্মা গান্ধীই দিতে পারেন। বামপন্থীরা বরাবরই মিশ্র মন্ত্রিসভার নীতিতে বিশ্বাস করে এসেছেন, কিন্তু তাদের এখন পর্যন্ত অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সকলের একথা হৃদয়ঙ্গম করলে ভাল হয় যে, কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী এবং তাঁদের নেতারা যদি পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুযায়ী এই সংকটকালে জাতিকে প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব না দেন তাতে বহু লোকের এই ধারণাই সত্য বলে প্রমাণিত হবে যে কংগ্রেসের

দক্ষিণপন্থীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাইছিল। গ্রেট ব্রিটেন এবং তাদের হয়ে যাঁরা সাফাই গেয়ে থাকেন তাঁরা এখন পোলদের আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলছেন এবং ব্রিটেন যদি এখন যুদ্ধে নামে, তারা যুদ্ধ করবে মুখে 'আত্মনিয়ন্ত্রণের' বুলি নিয়ে। ব্রিটিশ শাসকদের এখনই কি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সময় নয় যে, সুয়েজ খালের পূর্বভাগে যে ভূখণ্ডটিতে অতি প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিসম্পন্ন এক জাতি তাঁদের জন্মগত স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে, ব্রিটিশ রাজ্যের দাসত্ব করতে বাধ্য হয়ে, ভেতরে ভেতরে ফুঁসছেন।

অতি সরল ভাষায় ব্রিটেনকে জানিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে, ভারত একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্য নিজের মানবসম্পদ, অর্থ এবং অন্যান্য সম্পদ ব্যবহৃত হতে দেবে না। কংগ্রেস যুদ্ধোদ্যম প্রতিরোধে সংকল্পবদ্ধ, যদিও সে প্রতিরোধ অবশ্যই অহিংস হবে। সেই কারণে ওয়ার্কিং কমিটি যে সম্প্রতি বলেছে যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থায় আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করব না, সেটা বলাই যথেষ্ট নয়। ওখানেই না থেমে আমাদের উচিত জোর করে একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যোগদানে আমাদের বাধ্য করার চেষ্টার বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধের সংকল্প পুনরায় ঘোষণা করা।

ওয়ার্কিং কমিটি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্যদের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী অধিবেশনে যেন তাঁরা যোগ না দেন। কিছু না করার চেয়ে সেটা ভাল, কিন্তু এ কোনওক্রমেই যথেষ্ট নয়। ভারত সরকারের সমর-প্রস্তুতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে তাঁদের উচিত এখনই তাঁদের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করা, এবং নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে এ সম্পর্কে নতুন আদেশের জন্য আবেদেন করা। জনগণের মধ্যে তাতে রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার হবে, এবং একজন সাধারণ দেশবাসীর কাছেও যুদ্ধে ভারতের যোগদান প্রশ্নটি জীবন্ত হয়ে উঠবে।

আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই যদি যুদ্ধ না বাধে, এখনকার উত্তেজনা কেটে যায় আমাদের এত নির্বোধ হওয়া উচিত নয়, যে আমরা মনে করব, সংকটের স্থায়ী সমাধান হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক উত্তেজনার পরিস্থিতি আবার ঘনীভূত হয়ে উঠতে পারে রুমানিয়াকে নিয়ে কিংবা নতুন উপনিবেশের জন্য জার্মানির দাবি নিয়ে। উপরন্তু হের হিটলার যদি যুদ্ধ চান, প্রয়োজনীয় বিষয়ের তাঁর অভাব হবে না। অতএব আমরা ভারতবাসীরা যেন উপলব্ধি করি বর্তমান আন্তর্জাতিক উত্তেজনা চলতেই থাকবে, এবং সেইভাবে আমাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত।

আজ সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে, আমি মহাত্মা গান্ধীর কাছে ও কার্যকরী সমিতির কাছে একটি প্রস্তাব রেখেছি। তাতে আমি বলেছি তাঁরা যদি সাহস করে একটি নীতি গ্রহণ করেন, এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভারতের জাতীয় দাবির প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন, আমরা আমাদের সব মতভেদ ভুলে তাঁদের সামান্য অনুসারী হিসাবে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ব, এবং যদি প্রয়োজন হয়, আমরা বামপন্থীরা যে-সব পদ অধিকার করে আছি সানন্দে পরিত্যাগ করব। তাঁদের উত্তরের জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করে আছি।

ইতিমধ্যে আমরা ব্রিটিশ সরকারকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিই, যুদ্ধ বাধলে আমাদের নীতি কী হবে, একমাত্র স্বাধীন ভারতই সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যুদ্ধ হোক আর না হোক, আমরা স্বাধীনতা চাই। স্বাধীনতা আমাদের পেতেই হবে।

৭

বন্ধুর কণ্ঠস্বর

‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ পত্রিকা, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

‘ভারতবন্ধু’ (The Friend of India), যে ‘দ্য স্টেটসম্যান’ নামে অধিক পরিচিত, কিছুদিন যাবৎ বিদেশনীতি এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অত্যুৎকৃষ্ট নিবন্ধ লিখে চলেছে। এই সংকটকালে ভারতবাসীর কী করা উচিত সে-বিষয়ে আমাদের মূল্যবান পরামর্শও দিচ্ছে। বর্তমান লেখক ‘ভারতবন্ধুর’ কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, আমার মতো একজন ক্ষুদ্র মানুষকে তাঁরা যে গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং তাঁর প্রতি যে মনোযোগ দিচ্ছেন তার জন্য।

এক বিচিত্র জগতে আমরা বাস করি এবং সে-জগৎ ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলে যাচ্ছে। একটা সময় গেছে যখন মস্কো ছিল আমাদের বন্ধুর চক্ষুশূল এবং ভেবেচিন্তে প্রচার করা হত মস্কোর অর্থ ভারতের বিক্ষুব্ধদের হাতে নিয়মিত পাচার করা হচ্ছে। হের হিটলারের ক্ষমতা লাভের পর থেকে তিনি স্ট্যালিন এবং ট্রটস্কির জায়গা নিয়েছেন, এবং সম্প্রতি কয়েকমাস বার্লিন, তার সঙ্গে রোম এবং টোকিয়োর জুজু আমাদের বন্ধুকে পেয়ে বসেছে এবং রাতের পর রাত তাঁর নিদ্রাহরণ করেছে। সেইসঙ্গে মস্কো হয়ে গেছে ভাল ছেলে এবং মস্কোর সোনা এসেছে বার্লিন, রোম ও টোকিয়োর হাতে। আমাদের ‘বন্ধু’-র কল্পনা ইদানীং সৃষ্টি করে চলেছে বার্লিন-রোম-টোকিয়োর সোনা ভারতের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে এ-দেশের শান্তশিষ্ট মানুষের মন বিষিয়ে দেওয়ার কাহিনী, কিন্তু এখন ‘ভারতবন্ধু’রা কী বলবেন? মস্কো কি এখনও ভাল ছেলে হয়ে থাকবে ‘তাঁদের চোখে, না কি রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির পর বার্লিনের সঙ্গে সংঘর্ষের কারণে তাকে বিষ নজরে দেখা হবে?

‘বন্ধু’ একটি আশ্চর্য আবিষ্কার কিংবা বোধহয় বলা উচিত উদ্ভাবন করেছেন যে, যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষুব্ধ ভারতীয়রা হিটলারের পিছনে, বার্লিন-রোম-টোকিয়ো অক্ষের পিছনে গিয়ে দাঁড়াবে। কল্পনাশক্তির জন্যে ব্রিটিশদের বিশেষ সুনাম নেই, কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আমাদের বন্ধু একটি ব্যতিক্রম— এবং ব্যতিক্রমই সাধারণ নিয়মের প্রমাণস্বরূপ। তাঁর তত্ত্বটি বাহবা পাওয়ার মতো।

যেহেতু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুব্ধ ভারতীয়রা ‘‘হেইল হিটলার’’ বলে চিৎকার করতে আরম্ভ করবে, অতএব ‘ভারতবন্ধু’ মতামত দিয়েছেন, তাদের ফাঁসি দেওয়া উচিত। যদি ফাঁসি দেওয়া না যায়, ভারতবন্ধুর মতে তাদের জেলখানায় বন্দি করে রাখতে হবে। তা হলেই ভারতে এবং ইউরোপে সব ঠিক হয়ে যাবে। এ রকম ‘বন্ধুর’ কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

‘ভারতবন্ধু’-র এইসব অপবাদ আমাদের প্রচুর আমোদের খোরাক হয়েছে, তবু এর যে একটা ক্ষতিকর তাৎপর্য আছে তাও আমাদের স্বীকার করা দরকার। ওই পত্রিকাটি অনেক সময়ে ভারত সরকারের মুখপত্র হিসাবে কাজ করে, তার কাজকর্মের সাফাই গেয়ে থাকে। তার ফলে আমরা গ্রেট ব্রিটেনের সরকারি মনোভাবের একটা আভাস পাই, কাজেই, ‘ভারতবন্ধু’-র বক্তব্যকে আমোদের উপকরণ বলে হালকা করে দেখা উচিত নয়।

একটি সাম্প্রতিক নিবন্ধে ‘বন্ধু’ আমাদের বলেছেন, যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে বলে যুক্তিরাষ্ট্র গঠন

মুলতুবি রাখা উচিত নয়। ওই পত্রিকা অবশ্য বরাবরই বলে আসছে, 'যুক্তরাষ্ট্র' পরিকল্পনাই একমাত্র ভারতীয় সমস্যার সমাধান করতে পারবে। ভারতীয়েরা নিজেরা তাদের নিজেদের সমস্যায় এই সমাধানের বিষয়ে কী মনে করে, সে বিষয়ে কেউ খোঁজ নেওয়া দরকার মনে করেনি। বোধহয় আমাদের 'বন্ধু' এ-কথা শুনে দুঃখিত হয়েছেন যে কোনও কোনও সরকারি মহলে এই ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে যে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা এমনিতেই মুলতুবি হয়ে গেছে, এবং এটাকে 'ভারতবন্ধু' এক বিপর্যয় ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না। অতএব তিনি জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন, মুলতুবি রাখার বদলে যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবর্তন আরও ত্বরান্বিত করা দরকার। সকলের যা মনে হবে, তা হল, বামপন্থীরা যখন দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে, তখন যুক্তরাষ্ট্র কী করে প্রবর্তিত হতে পারে? এই সমস্যা সমাধানের জন্যে 'ভারতবন্ধু' যে প্রস্তাব করেছিলেন তাতে বলেছিলেন অবাধ্য জনগণকে ফাঁসিতে লটকালে এবং জেলখানায় ভরে ফেলতে পারলে যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোর প্রবর্তন সহজ হবে।

সে-প্রস্তাব যদি ব্রিটিশ সরকারের মনঃপূত হয়ে থাকে, কিংবা সরকারি ভাবনাচিন্তার যদি কিছু আভাস পাওয়া যায় তা থেকে, তা হলে, যুদ্ধ আরম্ভ হলে যা হবে তা হল ব্রিটিশ সরকার বামপন্থীদের বিরুদ্ধে যা করবার ঝটপট করে ফেলবে, একেবারে আক্ষরিক অর্থে। তখন, রাস্তা পরিষ্কার হলে, যুক্তরাষ্ট্র বিনা বাধায় প্রবেশ করবে এবং ঢাক ঢোল পিটিয়ে, পতাকা উড়িয়ে তাকে স্বাগত জানানো হবে, তা কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতাকা— যে পতাকা শান্তি, গণতন্ত্র এবং প্রগতির প্রতীক।

কিন্তু, যত যাই হোক, এই তালিকায় তো এমন কিছু নেই যা মূলত নতুন। চিরকাল যা হয়ে আসছে শুধু তাই, দমন এবং তার সঙ্গে চলবে মিটমাট। তফাত শুধু এই যে এবার যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে সেটা আরও কঠোর।

এখন, এই চিকিৎসা প্রণালী, এ সম্পর্কে আমাদের কী বক্তব্য? অবশ্যই রোগীকে এ বিষয়ে কিছু বলতে দিতে হবে। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা 'ভারতবন্ধু'-কে বলতে পারি, এই চমৎকার পদ্ধতিটি যদি ইতিহাসে প্রত্যেকবারই বিফল হয়ে থাকে, এইবার যে ভারতবাসী খুশি মনে তা গ্রহণ করবে, তার কি বিশেষ আশা আছে? এখন আর তারা অবোধ পশুর মতো নয় এবং অন্যেরা তাদের জন্যে যা পরিকল্পনা করে রাখবে, তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে তারা রাজি না হতে পারে। তা ছাড়া, মানুষের মনমেজাজকে একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে না। জনসাধারণের একটি অংশের ওপর চাপানো কঠোর দমননীতিতে অন্য সকলেই, কিংবা তাদের কোনও অংশ ভীত হয়ে পড়বেই, তা নাও হতে পারে, বরং তার বিপরীতটাই হতে পারে, তারা আরও জেদি, একগুঁয়ে হয়ে উঠতে পারে, সে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে কে ঢাকঢোল পিটিয়ে স্বাগত জানাবে? প্রাথমিক ভাবে যদি দমনপীড়ন দিয়ে আরম্ভ করা যায়, এমনকী যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতী, তাঁদের পক্ষেও যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা, সাধারণের মনে বিদ্রোহের ভাব সৃষ্টি হওয়ার ফলে স্বীকার করে নেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে, তাতে পরিবর্তন করা হোক আর না হোক।

না, 'বন্ধু', সমাধান আপনি যা ভাবছেন, কিংবা লর্ড উইলিংডন একদা যা ভেবেছিলেন, তত সহজ নাও হতে পারে। আপনারা যা মনে করেন, বামপন্থীরা দেশে তত নগণ্য নন।

বামপন্থীদের দমন করা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু তাতে আপনাদের পরিকল্পনাও ভেস্তে যেতে পারে, আপনারা যে আপনাদের উদ্দেশ্য প্রকট করে দিলেন এবং আমাদের সতর্ক

করে দিলেন, সে জন্যে ধন্যবাদ। আমরা আপনাদের এ-বিষয়ে আশ্বস্ত করতে পারি যে সমস্ত রকম পরিস্থিতির জন্যে আমরাও প্রস্তুত এবং স্বাধীনতা যে আমরা জয় করব সে-বিষয়ে আমরা নিশ্চিত, 'ভারতবন্ধু'-র সাহায্য পাই আর না পাই।

৮

আত্মানুসন্ধান

'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকা, ২৮ অক্টোবর ১৯৩৯ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

প্রত্যেক জাতির জীবনে এক একটি পরিস্থিতি আসে যখন ক্ষণমাত্র সময়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয় যাতে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে পারে, ক্ষতিগ্রস্তও হতে পারে। প্রায়ই দেখা যায় সেই সময়ে শেষ সিদ্ধান্ত নিতে হয় অল্প সংখ্যক ব্যক্তিকে, এমনকী, একজন ব্যক্তিকেও। ১৯১৭ সালে লেনিন যদি অন্য রকম নেতৃত্ব দিতেন তা হলে রাশিয়ার কী হত তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করা যায়।

এই বিপুল দায়িত্ব তাঁরা কী করে পালন করেন, জাতির ভবিষ্যৎ যাঁদের হাতে? স্বভাবতই তাঁদের চিন্তা করতে হয়, গভীরভাবে চিন্তা করতে হয়। তাঁদেরকে সময়ের দিকে তাকাতে হয়, পিছনে তাকাতে হয়, বিভিন্ন বিকল্প বিবেচনা করতে হয়, সম্ভাব্য ফলাফল বিচার করতে হয়। এতদসত্ত্বেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি সহজ নয়। যে কোনও নেতাই, সংকট সামনে এলে সাহসের সঙ্গে পরিষ্কার নিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। কিন্তু সে-ক্ষমতা কারও থাকলেও, নির্দিষ্ট কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে গেলে যে-সব তথ্য এবং বিবেচ্য বিষয় জানা দরকার, মানুষের বুদ্ধি তার যোগান দিতে অক্ষম হতে পারে।

আমাদের কখনও কখনও বলা হয়, যুক্তি যেখানে কাজ করে না, সহজাত বোধ সেখানে সফল হতে পারে। ইতিহাসের বড় বড় নায়কেরা দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে গেছেন সহজাত বোধের সাহায্যে এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত পরবর্তী ঘটনাবলির দ্বারা সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

এই বক্তব্যের মধ্যে অনেকখানি সারবত্তা আছে। আমাদের সীমিত অভিজ্ঞতার মধ্যে, আমরা দেখেছি, নেতারা সংকটের সময়ে অভ্রান্ত রাজনৈতিক সহজাত বেধের তাগিদে অসাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, এবং পরবর্তী ঘটনাবলীর দ্বারা সে-সব সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। এই সহজাত বোধটি কী, যাকে ঠিক ধরা ছোঁয়া যায় না? এ কি রহস্যময় কিছু, যাকে ঠিক বোঝা যায় না, মানুষের মধ্যে আপনি জন্মায়? এটা ঠিক যে এর অনেকাংশই সহজাত বোধ। একজন চিত্রকর বা যন্ত্রশিল্পীর হাতের সূক্ষ্ম স্পর্শে যে অসামান্য সৃষ্টির পূর্ণতা লব্ধ হয়— সেই সূক্ষ্মতার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার প্রভাব এবং প্রশিক্ষণের মাত্রা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। শুরুতেই যদি তাঁর একটা সহজাত শৈল্পিক প্রবণতা না থাকে, শিল্পের

সর্বোচ্চ উৎকর্ষে তিনি পৌঁছতে পারেন না। রাজনৈতিক সংগ্রামীদের ক্ষেত্রে সেই একই কথা প্রযোজ্য। প্রথম থেকেই তাঁর রাজনৈতিক বোধ থাকা প্রয়োজন।

কিন্তু সহজাত বোধকে শাণ দিতে হয় নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষণ্ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। এবং সহজাত বোধ যদি আধডজন সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই সব সময়েই তা সঠিক হবে। তা হলে এমন কী আছে যা একজনের সহজাত রাজনৈতিক বোধকে যতদূর সম্ভব নির্ভুল করে তুলতে পারে?

প্রথমত, যা অবশ্য প্রয়োজনীয়, তা হল নিজের ব্রতে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হতে হবে। সহজাত বোধ যদি স্বার্থ বুদ্ধির দ্বারা বিকৃত হয়, সে সচেতনভাবেই হোক অথবা নিজের অজান্তেই হোক, সে ভুল পথে নিয়ে যাবে। যখন আত্মপরায়ণতা সহজাত বোধের ওপর আধিপত্য লাভ করে, সর্বনাশ সামনে এসে পড়ে। অতএব, যখন সমগ্র জাতির ভাগ্যনির্ণয়ের পরিস্থিতি আসে, চেষ্টা করতে হয় মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব, স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করার।

দ্বিতীয়ত, নিজের ব্যক্তি-চেতনাকে সমষ্টির চেতনার মধ্যে লয় করে দিতে হবে, যাতে ব্যক্তির সহজাত বোধের মধ্যে সমষ্টির চেতনা প্রকাশ পায়। একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে এ সহজ নয়। সৌভাগ্যক্রমে কেউ কেউ আছেন, যাঁরা অন্যদের চেয়ে সহজে জনগণের জীবনের মধ্যে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য মিলিয়ে দিতে পারেন। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, অন্য সব দিক যদি ঠিক থাকে, সেই নেতাই বেশি প্রভাবশালী, বেশি শক্তিশালী; বেশি কৃতকার্য হন যিনি জনমানস বেশি ভাল উপলব্ধি করেন। সেই উপলব্ধি শুধু যুক্তি-বিচারের সাহায্যে লাভ করা যায় না, তার জন্যে সহজাত বোধের প্রয়োজন হয়।

নিজের মনকে এমনভাবে শৃঙ্খলা-পরায়ণ করা যায় যাতে গণমানসের সঙ্গে সেটা এক সুরে বাঁধা হয়ে যায়। কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা এবং প্রহরা। কল্পনা করুন, একটি খরস্রোতা নদী গিরিসংকটের মধ্যে পথ করে প্রবাহিত হচ্ছে অবারিত গতিতে। যে-সব জলকণা দিয়ে সেই নদী গঠিত, তারা কি সেই সমগ্র স্রোতস্বিনীর মধ্যে নিজেদের মিলিয়ে দিতে দেয়নি? কল্পনা করুন, বার্গসঁ কথিত 'elan vital', প্রাণীকুলের মধ্যেকার সহজাত বোধ ও চালিকাশক্তি। প্রাণশক্তি। মানুষের চিত্ত সত্যের অন্তস্থলে প্রবেশ করে তার অবিরাম ধারার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে না? কল্পনা করুন হেগেল বর্ণিত 'Absolute Idea', কোনও পার্থিব প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যা আত্মপ্রকাশ করছে; একজন ব্যক্তি কি সেই বিবর্তনের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারে না, যাতে সেই প্রক্রিয়াটা তার বোধগম্য হয়? কল্পনা করুন এক 'দৈবী শক্তি'— সৃষ্টির বিচিত্র বর্ণালীর মধ্যে দিয়ে আপনাকে বিকশিত করছে। মানুষের আত্মা চিন্তায়, অনুভূতিতে তার সঙ্গে একাত্মতা লাভ করতে পারে না?

এক কথায়, ব্যক্তি মানুষের মন সমষ্টির মনের সঙ্গে সুর মেলাতে পারে। কিন্তু এই সহজাত বোধ ভুলও করতে পারে, অতীন্দ্রিয়বাদের অন্ধ গলির মধ্যে মানুষকে নিয়ে যেতে পারে, যদি আমরা জগৎ ও মানুষের বিবর্তনের সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য উপলব্ধির দ্বারা নিজেদেরকে দুর্বলতা থেকে রক্ষা করার মানসিক শক্তি না অর্জন করি। অতএব, তৃতীয়ত, আমাদের বিশ্লেষণ, সমালোচনা ও ব্যাপক অধ্যয়নের ভিত্তিতে ইতিহাস সম্পর্কে যুক্তি ও বিচারসিদ্ধ ধারণা অর্জন করতে হবে। যুক্তি যেখানে কাজ করে না, সেখানে সহজাত বোধ আমাদের পথ দেখাতে পারে। যখন সহজাত বোধ আমাদের কুয়াশাচ্ছন্ন দ্বিধাময়তায় নিয়ে যায়, যুক্তি সঠিক পথে ফিরিয়ে আনে।

চতুর্থত, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা প্রয়োজন। আমরা এমন

এক যুগে বাস করছি, যখন এক হিসাবে বিভিন্ন দেশের সীমানাগুলি লোপ পেয়ে গেছে। আজ পৃথিবী এক ও অখণ্ড। পৃথিবীর এক কোণে যে ঘটনা ঘটে সারা পৃথিবীতে, দূরে দূরান্তরে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। সেই কারণে, গণমানসের সঙ্গে যদি আমরা সুর মিলিয়ে থাকি, ইতিহাসের বিবর্তন সম্পর্কে আমাদের ধারণা যদি সঠিকও হয়, তবু আমাদের ভুল হতে পারে, যদি আন্তর্জাতিক বোধ আমাদের না থাকে।

বর্তমানে আমরা ভারতের এবং বিশ্বের ইতিহাসের এক বৃহৎ সংকটের সময় অতিক্রম করছি। ফরওয়ার্ড ব্লকের অল-ইন্ডিয়া ওয়ার্কিং কমিটি, ৮ সেপ্টেম্বর তাদের ওয়ার্ধার বৈঠকে, একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এবং সেই সিদ্ধান্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে জানানো হয়েছে। সে-সিদ্ধান্ত কি নির্ভুল ছিল? পূর্বে উল্লিখিত চারটি বিষয়ের পরীক্ষায় কি এই সিদ্ধান্ত উত্তীর্ণ হবে? তার গ্রহণযোগ্য উত্তর একমাত্র ভবিষ্যৎই দিতে পারে। ইতিমধ্যে আমাদের যতদূর সাধ্য সেই সিদ্ধান্তকে কার্যে পরিণত করতে হবে; যাই ঘটুক, আমরা অবশ্যই দাবি করতে পারি, আমরা আর কিছুই চাই না, সর্বোত্তম উপায়ে লক্ষ্যে পৌঁছন ছাড়া আমাদের আর কোনও অভীপ্সা নেই।

৯

আমার ভ্রমণের কিছু কিছু বৃত্তান্ত

‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ পত্রিকা, ২৮ অক্টোবর—২৫ নভেম্বর ১৯৩৯ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত নিবন্ধ

১৯৩৯-এর মে মাসের প্রথম দিকে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠার পর থেকে, আমি, একটু তাড়াহুড়ো করে হলেও কার্যত সমগ্র ব্রিটিশশাসিত ভারত ভ্রমণ করেছি। ভ্রমণকালে আমি কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের ভিতর দিয়েও গিয়েছি এবং সেইসব দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের বড় বড় জনসভায় এবং চলার পথের বিভিন্ন স্টেশনে ভাষণ দিয়েছি। এখন সময় এসেছে গত কয়েক মাস আমি কী দেখেছি এবং কী শিখেছি তার হিসাব নেবার এবং ভবিষ্যতের পথ নির্দেশের জন্যে তা থেকে শিক্ষা নেবার।

প্রথমেই বলা উচিত, গত কয়েক মাসের ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ফরওয়ার্ড ব্লকের গঠন সমুচিতই হয়েছে এবং এ-বিষয়ে কারও মনে আজ সন্দেহের ছায়া মাত্র থাকা উচিত নয় যে, ফরওয়ার্ড ব্লক দীর্ঘজীবী হবে, তার ঐতিহাসিক কর্তব্য সমাধা করার জন্য। এই উক্তির যাথার্থ্য এবার প্রমাণ করার চেষ্টা করি।

আমি যেখানে-যেখানে গিয়েছি তার বেশির ভাগ জায়গাতেই কংগ্রেস সংগঠন কিংবা কংগ্রেস নেতাদের কাছ থেকে আমি কোনও সহযোগিতা কিংবা সহায়তা পাইনি। এর

ব্যতিক্রমের সংখ্যা খুবই কম। কয়েকটি জায়গায় কংগ্রেসি কর্মকর্তাদের মনোভাব ছিল নিস্পৃহ, অনাসক্ত, আর অন্যত্র তাঁদের ভাব ছিল প্রকট কিংবা প্রচ্ছন্নভাবে শত্রুতাব্যঞ্জক। অন্ধ্র এবং তামিলনাড়ে (মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি), দুই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আবেদন করেছিলেন, জনসাধারণ যেন আমাকে বয়কট করেন। অন্য জায়গাতেও একই আবেদন করা হয়েছিল প্রকাশ্যভাবে। আরও কোনও কোনও জায়গায়, যেমন গুজরাটে, প্রচ্ছন্নভাবে প্রচার চালান হয়েছিল এবং আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কেউ কেউ বিনা দ্বিধায় নির্লজ্জভাবে, বিদ্বেষপূর্ণভাবে আমার কুৎসা রটনা করেছেন। পাটনায় প্রাদেশিকতার মনোভাবকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগানো হয়েছিল, 'গান্ধীবাদ দীর্ঘজীবী হোক', এই ধ্বনি দিয়ে জুতো এবং পাথর ছোঁড়া হয়েছিল। ৯ জুলাইয়ের ঘটনায় পরে যখন আমাকে শৃঙ্খলাভঙ্গের শাস্তি দেওয়া হল, প্রকাশ্য ঘোষণা করা হয়েছিল, আমি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আমার বিরুদ্ধে রকমারি প্রচার চালিয়েছিলেন। কখনও বলা হল, আমি হিন্দু মহাসভা এবং ড. আম্বেদকরের ইনডিপেনডেন্ট লেবার পার্টির মতো কংগ্রেস বিরোধীদের সাহায্য নিয়ে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গড়ছি। আবার কখনও তাঁরা বলেছেন আমি মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছি। এই ধরনের প্রচার তবু বরদাস্ত করা যায়, কিন্তু যে প্রচার মুখ থেকে মুখে চালাচ্ছেন সত্য ও অহিংসার পূজারীরা, সেই কুৎসিত অপবাদ, যার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়নি, তার কী হবে?

এই রকম পরিস্থিতি, এই রকম প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে আমাকে ভ্রমণ করতে হয়েছে। উপরন্তু মহাত্মা গান্ধী থেকে আরম্ভ করে পরিচিত নেতারা প্রায় সবাই আমার বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। লোকের আস্থা উৎপাদন করবার মতো প্রমাণপত্র আমার সঙ্গে কেমন ছিল তার বর্ণনা না করে কল্পনার ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল। তা সত্ত্বেও, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার ভ্রমণ ছিল এক জয়যাত্রার মতো। এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশে যত গিয়েছি, আমার জন্যে অপেক্ষা করে থেকেছে বিস্ময়ের পর বিস্ময়। আজ সত্যিই বলা কঠিন, কোন প্রদেশ সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে।

অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির কলকাতা সম্মেলনে ১৯৩৯-এর ২৯ এপ্রিল যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করি, আমি অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছিলাম। আমার বন্ধু ও সহকর্মীদের মধ্যে কয়েকজন তা অনুমোদন করেন, কিন্তু অন্যদের মতে আমি ভুল করেছিলাম। সেই সিদ্ধান্ত, যার ফল হয়েছিল গুরুতর, আমি নিয়েছিলাম সহজাত বোধ ও রাজনৈতিক চেতনার চালনায়। তবে, অল্প দিনের মধ্যেই আমি দেখে বিস্মিত হলাম এবং খুশি হলাম, যে পতদ্যাগ করে আমি অভাবনীয় পরিমাণে জনমত আমাদের দিকে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। বিশেষ করে বঙ্গদেশ একতাবদ্ধ হয়ে আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের যাত্রারম্ভ যতদূর সম্ভব শুভ হয়েছে।

কিন্তু অবশিষ্ট ভারতে কী হয়েছে? সেটা বুঝতে হলে নানা প্রান্ত ভ্রমণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। প্রথমেই আমি গেলাম যুক্তপ্রদেশে, কিংবা বলা উচিত উনাও এবং কানপুরে। ওই দু-জায়গাতেই ফরওয়ার্ড ব্লক খুব ভাল অভ্যর্থনা পেয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে, কিছু ভুল ধারণা বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল কিন্তু আমার নানা বক্তৃতায় আমি সে-সব দূর করতে সমর্থ হয়েছি। চলে আসবার সময়ে আমি আশা নিয়ে এসেছি, বঙ্গদেশের বাইরে প্রতিক্রিয়া আমাদের অনুকূল হবে।

উত্তর প্রদেশের পর পঞ্জাব। যখন আমি লাহোরে পৌঁছলাম, দেখলাম আমার সামনে এক বিপুল জনতা, প্রবল উৎসাহে ধ্বনি উঠছে, "ফরওয়ার্ড ব্লক জিন্দাবাদ!" গত বছর কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে আমি যে-লাহোরে গিয়েছিলাম, এ সে-লাহোর নয়। মুহূর্তের মধ্যে আমি বুঝে গেলাম ফরওয়ার্ড ব্লক সাধারণ মানুষের মন জয় করে নিয়েছে। কিন্তু সে অসম্ভব সম্ভব হল কী করে? সুদূর লাহোরে কে নিয়ে গেল ফরওয়ার্ড ব্লকের বাণী? সম্ভবত কোনও মনুষ্যদেহধারী বার্তাবহ নয়, কবির মেঘদূত, কিংবা বোধহয় ঐতিহাসিকেরা যে বলেন কালের চেতনা, সেই নিয়ে গেছে।

পঞ্জাবের জনতা স্বভাবতই আবেগ ও উৎসাহে টগবগ করে ফোটে, কিন্তু এবার আমি যা পেলাম সেটা মাত্রাতিরিক্ত। তাতে আমার স্ফূর্তি আরও বেড়ে গেল। সেখান থেকে আমি গেলাম উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। সেই একটা জায়গা, যেখানে আমি আগে কোনও দিন যাইনি এবং আমার কোনও ধারণা ছিল না, আমাদের পাঠান ভাইয়েরা ফরওয়ার্ড ব্লকের ডাকে কীরকম সাড়া দেবেন। সীমান্তের জনগণের ওপর খানভাইদের আশ্চর্য প্রভাবের কথা এত শোনা গিয়েছে যে, সেই পরিস্থিতিতে সন্দেহ হয়েছিল যে, খুব বেশি সাড়া পাওয়া যাবে না। এবং এই পরিস্থিতিতে তা অকারণ ছিল না। লাহোরেই আমার কাছে খবর পৌঁছেছিল যে খান আব্দুল গফফর খান সীমান্তবাসী জনগণের কাছে এই নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে কংগ্রেস যেন আমার সঙ্গে কোনও সংশ্রব না রাখে। অবশ্য আমাকে জানানো হয়েছিল, এতদসত্ত্বেও আমি উষ্ণ অভ্যর্থনা পাব। সীমান্ত প্রদেশে আমি প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল। চলার পথে স্টেশনে স্টেশনে দেখলাম বিপুল জমায়েত এবং তাদের মধ্যে লাল-কোর্তা স্বেচ্ছাসেবক (খোদাই খিদমৎগার)-দের উপস্থিতি চোখে পড়বার মতো। যত পেশোয়ারের কাছে আসছিলাম জনতার আকার স্ফীত হচ্ছিল এবং পেশোয়ার পৌঁছে সম্বর্ধনা হল রাজকীয়।

পেশোয়ারে আমি বড় জোর একদিন ছিলাম, কিন্তু তার মধ্যেই আমি বুঝতে পারলাম, স্বাধীনতা-প্রেমী পাঠান অন্তরে অন্তরে ফরওয়ার্ড ব্লক-পন্থী না হয়ে পারে না। পেশোয়ার শহরে এবং সেনানিবাসে জনসভা অতিশয় সফল হয়েছিল। প্রথমে সেনানিবাস কর্তৃপক্ষ আমাদের জনসভার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, যদিও মহাত্মা গান্ধীকে ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে সেখানে ভাষণ দিতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যখন আমরা ঠিক করলাম নিষেধাজ্ঞা অমান্য করব, সে আদেশ প্রত্যাহার করা হল। কংগ্রেস কর্মী এবং সমর্থকদের সঙ্গে আলোচনা অত্যন্ত সুফলপ্রদ হল, আমরা তৎক্ষণাৎ ফরওয়ার্ড ব্লকের উদ্বোধন করতে সক্ষম হলাম। নওশেরার মিয়াঁ আকবর শাহ সাহেবকে পেয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক একজন অদম্য যোদ্ধা ও সংগঠক লাভ করল।

সীমান্ত প্রদেশে আমার ঝটিকা সফরের পর এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, উত্তর ভারতের কথা বলতে গেলে, সেখানে সাগ্রহ জনসমর্থনের আশা ফরওয়ার্ড ব্লক করতে পারে। জনসাধারণের চিত্ত সে জয় করেছে, "ফরওয়ার্ড ব্লক জিন্দাবাদ" এর মধ্যেই জনগণের মুখের স্লোগান হয়ে উঠেছে। কিন্তু উত্তর ভারতই ভারতবর্ষ নয়। দক্ষিণপন্থীদের ঘাঁটি হল বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং আরও অন্যত্র, এবং সে-সব ঘাঁটিতে যত দিন না আমরা হানা দিচ্ছি, সমগ্র ভারত সম্পর্কে সাধারণভাবে কোনও কথা বলা চলে না। তাই আমি পেশোয়ারে ফ্রন্টিয়ার মেলে চেপে বসলাম, সোজা চলে গেলাম বোম্বাই, যেখানে শ্রীযুত কে. এফ. নরিম্যান ফরওয়ার্ড ব্লকের নিখিল ভারত সম্মেলন সংগঠিত করছিলেন।

১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে আমি বোম্বাই গিয়েছিলাম কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে। হরিপুরা কংগ্রেস থেকে আমি সোজা সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম এবং চমকপ্রদ অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম। সমস্ত গোষ্ঠীই এসে অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেছিল এবং যে অভূতপূর্ব প্রদর্শন হয়েছিল সেইটাই তার কারণ। এবার (জুন, ১৯৩৯) ঘটনাটা হল অন্য রকম। তখন আর আমি সভাপতি নই। আমি সফর করছিলাম ফরওয়ার্ড ব্লকের হয়ে এবং সেই জন্যে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিলাম ১ নং বিদ্রোহী বলে। গণশত্রু বলে আমাকে ঘোষণা করা সম্ভব ছিল না, কেন না মহাত্মা গান্ধী তাঁর কোনও একটি বিবৃতিতে বলেছেন, "যত যাই হোক, সুভাষ দেশের শত্রু নয়।"

বোম্বাই, যা কিনা গান্ধীবাদীদের শক্ত ঘাঁটি, এ-রকম একজনকে কী করে স্বাগত জানাতে পারে? এই শহরেই, ২২ এবং ২৩ জুন ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্মেলন আয়োজিত—কী হবে তার? স্বভাবতই আমি যখন গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া-র দিকে ধাবমান, তখন এই সব প্রশ্ন আমার মন অস্থির করে তুলেছিল। তবে আমি আশাবাদী ছিলাম। বোম্বাই থেকে যা খবর আসছিল তাতে ইঙ্গিতটা সেই দিকেই ছিল। তা ছাড়া ট্রেনে যেতে যেতে বিভিন্ন স্টেশনে আমি যে-রকম অভ্যর্থনা পাচ্ছিলাম, বিশেষ করে দিল্লি, জব্বলপুর এবং সে-রকম নানা জায়গায়, তাতে আমি জনসাধারণের চিন্তাভাবনার আভাস পাচ্ছিলাম। শুধু বিভিন্ন স্টেশনে প্রচুর জনসমাগমই নয়, তাদের প্রবল আগ্রহ, তাদের মুখের অভিব্যক্তি, তাদের চোখের দীপ্তি, সবই আমার নজর কেড়েছিল। আমার কোনও ছদ্ম আবরণ ছিল না। আমার সফরের পৃষ্ঠপোষক কারা, তার সবই তারা জানত। তবু তারা এসেছিল, নিজেদের তাগিদেই এসেছিল। সে-সময়ে আমার সমর্থনে কোনও সংগঠন ছিল না বললেই চলে। কিন্তু নিঃসন্দেহে ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে দিয়ে বর্তমান কালের চেতনা নিজেকে প্রকাশ করছিল। যে-সমস্ত অব্যক্ত অস্পষ্ট অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা, আশা জনগণকে চঞ্চল করে তুলছিল, ফরওয়ার্ড ব্লক তাকেই ভাষা দিচ্ছিল। সেই কারণেই তাদের কল্পনাকে ফরওয়ার্ড ব্লক স্বতঃই এমনভাবে অধিকার করে ফেলল, যা আগে কোনওদিন হয়নি।

বোম্বাইয়ে পৌঁছে যে অভ্যর্থনা লাভ করলাম, সংখ্যার বিচারে সেটা গত বছরের সমকক্ষ না হলেও, এবারকার আগ্রহ ও উদ্দীপনা অনেক বেশি ছিল, এবং এবার সেটা ছিল একান্তভাবেই স্বতঃপ্রণোদিত। কংগ্রেস সংগঠনের মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ অসহযোগিতার এবং মনে হল, তলে তলে কিছু পরিমাণে শত্রুভাবাপন্ন। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি। আজাদ ময়দানে আমাদের জনসভা হয়েছিল বিশাল, তারা আমাদের সম্পূর্ণ সমর্থন করছিল। এই বৃহৎ জনসভার পর শহরের প্রত্যেকটি মহল্লায় একপ্রস্থ ছোট ছোট জনসভা হয়েছিল। অনেকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন যে, শহরের বিভিন্ন অঞ্চল সাধারণভাবে যে-সব জায়গা গান্ধীবাদীদের ঘাঁটি বলে মনে করা হয়; সেখানে বড় বড় জনসভা হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল। অনেকেই বলেছিলেন, এ-সব দেখে তাঁদের ১৯৩০-এর গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না, আমরা বোম্বাইয়ের জনসাধারণের চিত্ত অধিকার করেছিলাম। ফরওয়ার্ড ব্লকের সর্বভারতীয় সম্মেলনের সময় প্রবল আগ্রহে উদ্বেল শ্রোতার ভিড়ে কাওয়াসজি জাহাঙ্গির হল উপচে পড়ছিল। এমনকী ভিতরে যাদের জায়গা দেওয়া যায়নি তাদের জন্য রাস্তায় মাইক

লাগাতে হয়েছিল। সম্মেলনে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন সমস্ত প্রদেশ থেকে এবং তাঁদের সহায়তা ও সহযোগিতায় ব্লকের কর্মসূচি রচিত হয়েছিল। তত দিন পর্যন্ত নানা দিক থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের ওপরে গোলাগুলি বর্ষণ করা হচ্ছিল। দক্ষিণপন্থীরা তাকে নিন্দা করছিলেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী গোষ্ঠী বলে, বামপন্থীরা (কিংবা তথাকথিত বামপন্থীরা কেউ কেউ) তাকে অপবাদ দিচ্ছিলেন বাহ্যত না হলেও প্রকৃতপক্ষে গান্ধীবাদী বলে। একটা সমালোচনা চালু রাখা হয়েছিল যে, ফরওয়ার্ড ব্লকের নাকি কোনও সুনির্দিষ্ট নীতি ও কার্যক্রম নেই। এবং নানা প্রকার সুবিধাবাদী এবং অসন্তুষ্ট ব্যক্তিদের সেটি একটি আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের সংবিধান এবং কার্যক্রম যখন গৃহীত হল এবং সংবাদপত্রে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হল, তখন ব্লকের বিরুদ্ধে ওই অপপ্রচার, যা অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল, আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

বোম্বাইয়ে আমাদের প্রধান সমস্যা যেটা ছিল, সেটা হল নতুন স্থাপিত ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে বর্তমান বামপন্থী দল এবং গোষ্ঠীগুলির সম্পর্ক কী হবে। স্বভাবতই আমরা চেয়েছিলাম, একটি সর্বসম্মত ন্যূনতম কার্যসূচির রূপায়ণের উদ্দেশ্যে সমস্ত বামপন্থী সংগঠন তাদের স্বাতন্ত্র বিসর্জন দিয়ে একটি সংগঠনে একত্র হোক। কোনও বামপন্থী দল ভেঙে দেওয়ার দরকার নেই, এবং অন্য কোনও কর্মসূচি কার্যকর করবার জন্যে তারা কাজ চালিয়ে যেতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে তা সম্ভব হল না। খানিকটা পারস্পরিক অবিশ্বাসের কারণে ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে মিলিত হওয়া সম্ভব হল না। কিংবা কোনও দল কিংবা গোষ্ঠী তার সদস্যদের এ-স্বাধীনতাও দিল না, যে তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেবেন। অতএব বামপন্থী ঐক্যসাধনের প্রচেষ্টা চালাতে হল এটা ধরে নিয়ে যে, বিভিন্ন বর্তমান দল ও গোষ্ঠী তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখবে।

এই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থার বিকল্প হিসেবে প্রথম গ্রহণযোগ্য। এর চেয়ে ভাল সমাধান সম্ভব ছিল না। অতএব বামপন্থী ঐক্যসাধন সমিতি (Left Consolidation Committee) গঠিত হল; যে-সব সংগঠনের সমবায়ে সমিতি গঠিত হল সেগুলি হল কংগ্রেসের সমাজবাদী দল, জাতীয় ফ্রন্ট গোষ্ঠী, র‍্যাডিক্যাল লীগ এবং নবগঠিত ফরওয়ার্ড ব্লক। স্থির হল এইসব সংস্থা হবে সমমর্যাদাসম্পন্ন এবং বামপন্থী ঐক্যসাধন সমিতি কাজ করবে একমাত্র যখন ওইসব সংস্থার মধ্যে ঐক্যমত হবে।

লিখিত বিবরণ থেকে যা মনে হয়, এই ব্যবস্থাটি তার চেয়ে বেশি কার্যকর ছিল। অল-ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভায় বামপন্থী ঐক্য সাধন সমিতির উপস্থিতি উপলব্ধি করা যেত কারণ বামপন্থীদের মধ্যে বেশ কার্যকর সহযোগিতা ছিল, এবং যদিও তাঁরা সংখ্যায় কম ছিলেন, তা সত্ত্বেও এ আই সি সি-র সভায় কার্যধারায় তাঁরা লক্ষণীয় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ আই সি সি-র সভায় পরে এল সি সি-র সভা বসত এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা রচিত হত।

এ আই সি সি-র সভা সম্পর্কে দু-একটি কথা। বামপন্থী, যাঁরা ছিলেন সংখ্যালঘিষ্ঠ, তাঁদের বিরোধিতা সত্ত্বেও কয়েকটি প্রস্তাব যদিও গৃহীত হয়েছিল, এ আই সি সি-তে সংগঠিত বামপন্থীরা দর্শকদের গ্যালারিতে ভাল ধারণার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বামপন্থী নেতারা, বিশেষত ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারা যখনই উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলেছেন সাদর সম্বর্ধনা ও হাততালি পেয়েছেন।

বোম্বাইয়ে সার্থক সফরের পর আমি পুনায় গেলাম। সেখানে আমি বাইরের লোক ছিলাম

না। পুনাতে গান্ধীবাদীদের শক্ত ঘাঁটি কোনও দিনই ছিল না। কাজেই আমি আগে থেকেই শুনেছিলাম আমি সাদর এবং সোৎসাহ অভ্যর্থনা লাভ করব। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কর্মীদের সঙ্গে আমি দেখা করি এবং সন্ধ্যায় এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিই। আমাদের সৌভাগ্য, মহারাষ্ট্রের খ্যাতনামা নেতা সেনাপতি বি. এম. বাপট ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেন। তাঁর সহযোগিতা লাভ করে আমরা আশ্বস্ত হই যে, মহারাষ্ট্রে ফরওয়ার্ড ব্লক দ্রুত অগ্রগমন করবে।

মহারাষ্ট্রের পর কর্ণাটক। সেখানে আমাকে কেউ চিনত না। সেখানে আমার জন্য কী অপেক্ষা করছে আমি জানতাম না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যা হল তা আমার সুদূরতম কল্পনারও অতীত, এবং দক্ষিণপন্থী মহলে একটি বোমা ফাটল আমার কর্ণাটক ত্যাগের ঠিক আগে। ঘোষণা করা হল কর্ণাটক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুত এস. কে. হোসমানি, এম এল এ (কেন্দ্রীয়) ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেছেন। এ বিষয়ে আরও কিছু পরের চিঠিতে লেখা হবে।

৩

পুনাতে আমি ধারওয়ার ও হুবলি যাওয়ার রাত্রির ট্রেন ধরলাম। ভোরের আলো ফুটলে আমি দেখলাম কয়েকটি জায়গায় ট্রেন পাহাড়-পর্বতের মধ্যে দিয়ে একেবেঁকে চলেছে। আর্দ্র শীতল আবহাওয়া ছিল, কিন্তু চারপাশের দৃশ্য আমাকে মোহিত করেছিল। চলতি পথের স্টেশনগুলিতে প্রত্যাশামতো ভিড় জমেছিল। তারা বক্তৃতা শুনতে চাইছিল, আমরা সোজা ধারওয়ার গিয়ে ট্রেন থেকে নামলাম।

কর্ণাটকে আমার কার্যসূচি ছিল ঠাসা। সেই প্রদেশের অধিকাংশ জায়গা, বিজাপুর বাদ দিয়ে, আমি সফর করলাম কতক ট্রেনে কতক গাড়িতে। সে প্রদেশটি আমার কাছে ছিল নতুন, সেখানে আমাদের অধিকাংশ সহকর্মীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। তা সত্ত্বেও, তাঁদের ব্যবহার ছিল আগ্রহ ও আন্তরিকতাপূর্ণ। বস্তুত ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষে যে পরিমাণ জনসমর্থন আমি সেখানে দেখলাম তাতে আমি আনন্দিত হলাম, অবাকও হলাম। যাঁরা বাইরের লোক তাদের অনেকের মতো আমারও ধারণা ছিল, যেহেতু শ্রীযুত গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে কর্ণাটক কংগ্রেসের প্রধান নেতা, ব্লক বোধহয় সেখানে বেশি দূর এগোতে পারবে না। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের মতো সেখানেও এত পরিবর্তন হয়েছে যে আগেকার সঙ্গে কোনও মিলই আর নেই। জনসাধারণের মধ্যে নবজাগরণের ফলে আমাদের আন্দোলনের মধ্যে নতুন শক্তি, নতুন উপাদান অনেক এসেছে। উপরন্তু অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগঠনের জন্ম হয়েছে গত কয়েক বছরে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে যাঁরা পাল্লা দিতে পারেননি এবং কংগ্রেসের নতুন গঠনে যে রদবদল হচ্ছে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারছেন না, অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগঠনের সঙ্গেও যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেননি, তাঁরা অধিকতর প্রগতিশীল এবং চলমান ব্যক্তিদের তুলনায় আড়ালে চলে গেছেন। আমার মনে হয়েছে (আশা করি আমি পরিস্থিতি বুঝতে ভুল করছি না) জি. আর. দেশপাণ্ডের মতো অধিক বয়স্ক নেতা, তাঁদের অতীতের কাজকর্ম সত্ত্বেও বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে যোগ রাখতে

পারছেন না, এখন যারা বড় হচ্ছে সেই প্রজন্মের সঙ্গে সুর মেলাতে পারছেন না। বস্তুত এরাই ভারতের ভবিষ্যৎ গঠন করবে। আমরা অনেকেই ভুলে যাই, যত যাই হোক, রাজনীতি একটি চলমান বস্তু, সদা পরিবর্তনশীল। চলা বন্ধ করে তুমি যদি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকো, যেহেতু আগে অনেক কাজ করেছ অতএব চিরকাল উচ্চপদে আসীন থাকার দাবি করো, নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সর্বদা যদি সামনে থাকতে চাও সর্বক্ষণ এগিয়ে যেতে হবে।

সারা ভারত সফরের সময়ে আমার মনে হয়েছে, কত দ্রুত কংগ্রেসের চরিত্র বদলে যাচ্ছে, নতুন নতুন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি জন্ম নিচ্ছে এবং সেই সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক চেহারার পরিবর্তন হচ্ছে। আমাদের বয়োঃজ্যেষ্ঠ নেতারা যদি এটা বুঝতে পারতেন আমাদের রাজনৈতিক অগ্রগতি দ্রুততর হত, আর অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ কম হত।

আমি জানি না, সবাই এটা স্বীকার করবেন কি না, কোনও দেশের বিপ্লব কেমন হবে তা নির্ধারণ করে প্রগতি-বিরোধী শক্তিগুলোর চরিত্রের ওপর এবং সেই চরিত্র আবার নির্ভর করে তখনকার সরকারের অথবা নেতাদের মানসিকতার ওপর। নেতাদের অথবা সরকারের মানসিকতা যদি হয় অনড়, কঠিন প্রগতির পথে বাধা হয় প্রবল, এবং তার প্রতিক্রিয়াও হয় তেমনি প্রবল এবং দৃঢ়। যা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় কংগ্রেসের ভিতরে প্রগতির বিরোধিতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রত্যেকের কাছেই এটা একটা চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। কোনও রকম করে এই বিরোধিতা যদি দূর করা যায়, ভারত দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে, এবং এক ঝটকায় তার আন্দোলনের রাজনৈতিক এবং আর্থসামাজিক পর্যায় দুটিই পেরিয়ে যাবে। অন্যথায় আমাদের ভাগ্যে অনেক দুঃখ, যন্ত্রণা আছে।

আমাদের কাহিনিতে আবার ফিরে আসি। ধারওয়ার থেকে শুরু করে আমার যাত্রা বেলগাঁওয়ে শেষ হল। আবহাওয়া সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল না। তা হলেও বেলগাঁওয়ে যখন আমরা পৌঁছলাম সেখানে দেখলাম প্রবল উৎসাহ, উদ্দীপনা। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেদিন ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, শহরে উত্তেজনা তুঙ্গে পৌঁছেছিল। ছাত্রদের এক বিশাল জমায়েতের পর আমি জনসভায় গেলাম। তুমুল বৃষ্টি হচ্ছিল এবং সেই বিশাল জনতা ছাতি মাথায় দিয়েও আষ্টেপৃষ্ঠে ভিজে গিয়েছিল। কিন্তু কেউ সেখান থেকে নড়েনি। এ এমন এক দৃশ্য যা দেখে কোনও সচেতন ব্যক্তির রোমাঞ্চিত না হয়ে গত্যন্তর নেই।

আমার যত দূর মনে পড়ছে, সভাপতিত্ব করেছিলেন শ্রীযুত এস. কে. হোসমানি, যিনি কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য। অন্তত এটা আমার মনে আছে যে তিনি আমার পাশে বসে ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানের পর ব্লকের প্রতি যাঁরা সহানুভূতিসম্পন্ন তাঁদের নিয়ে আমাদের একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক হল। শ্রীযুত এস. কে. হোসমানি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে প্রাদেশিক সংগঠক কমিটির সভাপতি পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়। তিনি দয়া করে সম্মত হন। প্রদেশের দক্ষিণপন্থী মহলে সংবাদটি যেন বিস্ফোরণ ঘটাল। তাঁরা কখনও ভাবেননি শ্রীযুত হোসমানির মতো একজন ঠাণ্ডা মাথার বিচক্ষণ বয়স্ক মানুষ ফরওয়ার্ড ব্লকের মতো একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীতে যোগ দেবেন। সব চাইতে লক্ষণীয় ছিল আমার কাছে তিনি যে মন্তব্যটি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বঙ্গদেশের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধে যদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা হলে আরেকজন সভাপতি দরকার যিনি তাঁর সঙ্গে থাকবেন। শ্রীযুত হোসমানি ছাড়াও দু'জন উৎসাহী কর্মী শ্রীযুত মাণ্ডগি এবং শ্রীযুত ইদগানজিকে আমরা পেলাম।

কর্ণাটক থেকে পুনা হয়ে আমি বোম্বাই ফিরে গেলাম। বোম্বাই পৌঁছে আমি দেখলাম বোম্বাই থেকে পুনা ও মহারাষ্ট্রের অন্যত্র গমনের আগে জুলাই মাসে, বোম্বাই সরকারের একটি নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে যে বিবৃতি আমি দিয়েছিলাম, তা নিয়ে ঝড় চলছে। কোনও কোনও মহলে আমার বিবৃতিটির ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছিল এবং তাই নিয়ে তার রাজনৈতিক অপব্যবহার করা হচ্ছিল। কোনও কোনও শত্রুভাবাপন্ন সংবাদপত্রের এটুকু সৌজন্য দেখা গেল না যে, আমাকে আক্রমণ করবার আগে আমার সম্পূর্ণ বিবৃতিটি প্রকাশ করে। জন্ম থেকেই ফরওয়ার্ড ব্লকের যে রকম অগ্রগতি দেখা যাচ্ছিল, কোনও কোনও মহলের দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল। কী করে তার অগ্রগতি রোধ করা যায়, সেটাই হয়েছিল প্রশ্ন। নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে আমার বিবৃতি আমাকে আক্রমণ করার একটা হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াল।

৪

কর্ণাটক থেকে দৃশ্য স্থানান্তরিত হল গুজরাটে। কিন্তু পাঠককে সেখানে নিয়ে যাওয়ার আগে আমি একটু অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চাই। জুলাইয়ের প্রথম দিকে বোম্বাই থেকে মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটক রওনা হওয়ার আগে আমি হঠাৎ করে সামান্য সময়ের জন্য জব্বলপুরে গিয়েছিলাম। আমাদের সহকর্মী ও সমর্থকবৃন্দ একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। সেটাই ছিল আমার যাওয়ার উপলক্ষ। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মহাকোশল প্রদেশে (অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশ, হিন্দুস্থানী প্রদেশে) ফরওয়ার্ড ব্লককে জনপ্রিয় করে তোলা। সে উপলক্ষে মহাকোশলের বিভিন্ন জেলা থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকপন্থীদের একটা জমায়েত মতো হয়েছিল, এবং আমাদের সংগঠনের কাজ আমরা সেখানে ভাল মতো আরম্ভ করতে পেরেছিলাম।

১৯৩২ সালে আমি জব্বলপুর গিয়েছিলাম, কিন্তু সে কেবল বন্দি হিসাবে এবং জব্বলপুর জেলে কয়েক মাস ছিলাম। তার পরের বার সেখান গিয়েছিলাম কংগ্রেস সভাপতি রূপে। তবে সেটা জব্বলপুরের কাছে ত্রিপুরীতে। কিন্তু ত্রিপুরী কংগ্রেসে গিয়েছিলাম রোগগ্রস্ত অবস্থায় এবং সেইভাবেই ফিরে এসেছিলাম। বস্তুত আমাকে নিয়ে যেতে হয়েছিল স্ট্রেচারে এবং অ্যাম্বুলেন্স করে এবং জব্বলপুরের, ত্রিপুরীর এবং ত্রিপুরী কংগ্রেসের বলতে গেলে কিছুই আমি দেখতে পাইনি। বন্ধুরাই আমাকে জানিয়েছিলেন, সভাপতিকে নিয়ে শোভাযাত্রা হয়েছিল রাজকীয় এবং নিকটবর্তী নানা অঞ্চল থেকে যাঁরা এসেছিলেন সেইসব বিপুল সংখ্যক আগন্তুক আমার অভাব তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। কিন্তু সভাপতির গরিমা নিয়ে যাওয়া এক কথা, আর একজন সামান্য কংগ্রেসি হিসেবে যার গায়ে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হিসাবে তকমা আঁটা আছে, সেইভাবে যাওয়া সম্পূর্ণ অন্য কথা। সে-পর্যন্ত আমি এমন কিছু করিনি যাকে বিদ্রোহ বলে দেগে দেওয়া যায়, আমি শুধু কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে পদত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দিয়েছি। তা হলেও কংগ্রেসের পদাধিকারীগণ এটাকে বিদ্রোহ বলেই মনে করেছিলেন এবং তা ঘোষণাও করেছিলেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের সারা ভারত সম্মেলনের পর আমি প্রথম জব্বলপুরেই গিয়েছিলাম। সেই কারণে আমার সেখানকার অভিজ্ঞতায় একটা অতিরিক্ত তাৎপর্য ছিল।

মধ্যপ্রদেশে আমার ট্রেন প্রবেশ করা মাত্র আমি বুঝতে পারলাম সেখানে আমার অভ্যর্থনা কেমন হবে। ভিড় ছিল, উৎসাহী মানুষের ভিড় ছিল ছোট ছোট স্টেশনে এবং স্পষ্ট বোঝা

গেল কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন নেতারা আমার গায়ে যে বদনাম সেঁটে দিয়েছিল, তার কিছুমাত্র প্রভাব তাদের ওপর পড়েনি। সব জায়গায় ''ফরওয়ার্ড ব্লক জিন্দাবাদ'' ধ্বনি প্রবলভাবে শোনা গেল। জব্বলপুরে যখন পৌঁছলাম, সেখানে মানুষে মানুষে ছয়লাপ। আমার মনের সব অনিশ্চয়তা কেটে গেল।

স্টেশন থেকে কোনও শোভাযাত্রা বেরোয়নি, পরে বেরোবে বলে ঠিক করা হয়েছিল। সাধারণভাবে শোভাযাত্রা আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। তাতে সময় নষ্ট হয় এবং চাপ পড়ে, কষ্ট হয়। বিশেষ করে দিনের বেলায়। তবে আরেক দিক থেকে দেখলে শোভাযাত্রার উপযোগিতা আছে। জনগণের মনস্তত্ত্বের একটা আভাস পাওয়া যায় শোভাযাত্রা থেকে। আমার এত রাজনৈতিক ব্যস্ততা সত্ত্বেও মনস্তত্ত্ব ও দর্শনে আমার আগ্রহ আমি ত্যাগ করতে পারিনি। লরিতে কিংবা গাড়ির মাথায় ওপরে সিংহাসনের মতো চেয়ারে বসে, কিংবা অতি সুসজ্জিত অশ্বচালিত গাড়ির ভিতর বসে পুরুষ ও নারীর ভিড় পর্যবেক্ষণ করবার তাদের মনস্তত্ত্ব অনুধাবন করার বিরল সুযোগ এতে পাওয়া যায়। তবে এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, সেই পর্যবেক্ষণ করা, শো-কেসের ভিতর বসে বসে একটি পুতুল যেমন ভাবে দেখে সেই রকম। তা হলেও কখনও কখনও সে অভিজ্ঞতার মূল্য থাকে।

জব্বলপুরে তাই হল। সেই বিশাল শোভাযাত্রা এ-বিষয়ে কোনও ভুল ধারণার অবকাশ রাখল না, আমি যে আদর্শ ও লক্ষ্যের কথা বলছি, তার প্রতি সেই জনসমাবেশের ভালবাসা কত প্রবল, তাঁদের সাড়া কত স্বতঃস্ফূর্ত, জনসভাটিও নিঃসন্দেহে সফল হয়েছিল। স্থানীয় বন্ধুদের মতে শোভাযাত্রা এবং সভা জব্বলপুরে আজ পর্যন্ত যা দেখা গেছে তার কোনটির চেয়ে কম সফল হয়নি।

এই সব প্রকাশ্য সভা-শোভাযাত্রার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না প্রদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কর্মীদের নিয়ে যে ছোট রুদ্ধ-দ্বার বৈঠক হয়েছিল। সেখানে কাজ চালিয়ে যাবার মতো একটি ছোট্ট সংগঠন স্থাপিত হল। স্থায়ী কিছু একটা যে রেখে যেতে পারলাম তাতে একটু সন্তোষ লাভ করা গেল। জব্বলপুর থেকে আমি তাড়াহুড়ো করে গাড়িতে একদিন মান্ডলা গেলাম। প্রখর রোদে এক বৃহৎ জনতা আশা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেটা হয়তো পাগলামিই ছিল, মধ্য গ্রীষ্মের এক প্রখর রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নে বিদ্রোহীর ভাষণ শুনবার জন্যে ঘন্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা। কিন্তু ও ধরনের পাগলামির মধ্যে একটা মহত্ত্ব থাকে, একটা পবিত্র কিছু করার প্রেরণা থাকে, যাতে মানুষকে রোদ বৃষ্টি ভুলিয়ে দেয়।

জব্বলপুর থেকে বোম্বাই ফিরবার সময়েও আবার দেখলাম মাঝ পথের স্টেশনগুলোতে আগ্রহী জনতা। সে-সব জায়গায় ছোট ছোট ভাষণ দিতে হল। মহাকোশলে আমার সফর অত সংক্ষিপ্ত করতে হল বলে খারাপ লাগল।

৭ জুলাই বোম্বাই ফিরে আমি দেখলাম একটি বিস্ময় আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। কংগ্রেস সভাপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ একটি বিবৃতি দিয়েছেন, আমরা ৯ জুলাইয়ে যে সারা ভারত সভা-শোভাযাত্রা ইত্যাদির পরিকল্পনা করেছিলাম সেটি কার্যত নিষিদ্ধ করে দিয়ে। পাঠকদের মনে থাকবে, জুনের শেষ দিকে বোম্বাইয়ে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হয়েছিল তাতে গৃহীত দুটি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আমাদের বামপন্থীদের তীব্র আপত্তি ছিল। তার একটিতে, পূর্বাহ্নে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অনুমতি না নিয়ে কংগ্রেস সদস্যদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন বা আইন অমান্য আন্দোলন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল; আরেকটিতে প্রদেশ কংগ্রেস মন্ত্রিসভাকে প্রদেশ কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। বামপন্থীদের

মতে এই প্রস্তাবগুলির উদ্দেশ্য ছিল, দক্ষিণপন্থীদের অবস্থানের শক্তি বৃদ্ধি করা এবং কংগ্রেসকে গণ আন্দোলনের পথ থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া। সেই কারণে মনে হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ জানানো দরকার। সেই উদ্দেশ্যে ৯ জুলাই একটি সারা ভারত দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বামপন্থী সংহতি সমিতি, একা ফরওয়ার্ড ব্লক নয়।

ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের এই বিবৃতির মধ্যে একধরনের অবগুণ্ঠিত শাসানি ছিল যে এই বিবৃতি মান্য করা না হলে যে কোনও ব্যক্তি নির্বিশেষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিবৃতিটি পাঠ করে আমার মনে হল, এই বিষয়ে আলোচনার জন্য বামপন্থী সংহতি সমিতির একটি বৈঠক হওয়া জরুরি। ন্যাশনাল ফ্রন্ট গ্রুপ, র‍্যাডিক্যাল লীগ এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিনিধিরা মিলিত হলেন এবং ওই বিবৃতিটি নিয়ে বিচারবিবেচনা করলেন ও সাধাণরভাবে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলেন। আমাদের আগেকার সিদ্ধান্ত বদল করবার কোনও কারণ আমরা দেখতে পেলাম না। অতএব বোম্বাইয়ে দিবসটি যথাযথভাবে পালন করার ব্যবস্থা গ্রহণ আরম্ভ হল।

তার পরে মি. এম. এন. রায় র‍্যাডিক্যাল লীগের তরফে সেই সিদ্ধান্ত যাতে কার্যকর না হয় তার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং সে উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট লীগকেও জওহরলাল নেহরুর মাধ্যমে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করলেন। তবে বোম্বাইয়ে এবং ভারতের অধিকাংশ জায়গাতে শোভাযাত্রা, সভা ইত্যাদি পরিচালিত হয়েছিল উপরোক্ত চারটি সংগঠনের এবং কিষাণ সভার যৌথ নেতৃত্বে।

বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে, বামপন্থী সংহতি সমিতি গঠিত হওয়ার পর সেটাই প্রথম খোলাখুলি সংঘাত, এবং বামপন্থীদের আহ্বানে জনসাধারণ কী রকম সাড়া দেয় তা দেখবার জন্যে বোম্বাইয়ের মানুষ অতিশয় উৎসুক ছিল। একটা ভাসা-ভাসা গুজব ছড়িয়েছিল দক্ষিণপন্থীদের সমর্থকেরা আমাদের সভাগুলি ভেঙে দিতে আসবে। কিন্তু অবাঞ্ছনীয় কিছু ঘটেনি। বোম্বাইয়ের সবগুলি সভাই বিপুলভাবে সফল হয়েছিল। ফ্রানজি কাওয়াসজি হলের সভাটিতে আমি উপস্থিত ছিলাম। হলটি কানায় কানায় ভরতি ছিল, বাইরেও অনেকে দাঁড়িয়েছিলেন। মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা তুঙ্গে উঠেছিল।

এই ভাবে আমরা প্রথম বাধাটি অতিক্রম করলাম।

১০

ফিরে দেখা

‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ পত্রিকা, ৪ নভেম্বর ১৯৩৯ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

গত সপ্তাহে আমরা একটু আত্মানুসন্ধানের চেষ্টা করেছিলাম। এ সপ্তাহে আমাদের প্রয়াস পিছন ফিরে তাকিয়ে গত বছরের পর থেকে রাজনৈতিক দাবার বোর্ডে কী কী অদলবদল হয়েছে তার হিসাব নেবার।

স্মরণ থাকবে, ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারি হরিপুরায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ঋর্ষিক অধিবেশনে গৃহীত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি ১৯৩৫-এর ভারত সরকার আইনে উল্লিখিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ সম্পর্কে। সেই সিদ্ধান্তে ব্যক্ত নীতিটি ছিল প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতি আপোসহীন বিরোধিতার। সেই সময়ে একটা গভীর আশঙ্কা ছিল, আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার জোর করে আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গিলিয়ে দেবে। যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা সম্পর্কে মাননীয় ভাইসরয়, লর্ড লিনলিথগোর অস্বাভাবিক আগ্রহ আমাদের আশঙ্কাকে অধিকতর বাস্তবতা দান করেছিল। মাসের পর মাস যত কাটতে লাগল, আমাদের মধ্যে অনেকের মনে হতে আরম্ভ করল, বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার ফলে কংগ্রেস সদস্যদের মনে সাংবিধানিক মনোভাবের সৃষ্টির ফলে তাদের সংগ্রামী চেতনা দুর্বল হয়ে পড়ছে। সেই সঙ্গে খবর আসতে আরম্ভ করে, ব্রটিশ সরকারের নিজেদের লোকেরা প্রচ্ছন্নভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, পরিকল্পনাটির জন্যে সমর্থন সংগ্রহ করবার, সেটির মূল রূপেই, কিংবা কিছু কিছু পরিবর্তিত আকারে। সেই কারণে ১৯৩৮-এর জুলাই মাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ওই পরিকল্পনার বিষয়ে আপোস করার বিপদ সম্পর্কে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য হই। ওই বিষয়ে আমার আপত্তি এত প্রবল ছিল যে, এমন যদি হয় যে কংগ্রেস কোনওক্রমে গরিষ্ঠসংখ্যক মত অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে আপোস অনুমোদন করে, আমি মনে করব আমার কর্তব্য কংগ্রেসের সভাপতিত্ব থেকে পদত্যাগ করা এবং এই আপোসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা। এই বিবৃতি গান্ধীবাদীদের মহলে বিরক্তির কারণ হয়, কারণ এতে পরিষ্কার বোঝা যায়, ওরকম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত যে সংখ্যালঘিষ্ঠর মুখ বন্ধ করবেই, এমন নয়, তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলবে এমনও কোনও কথা নেই। এরপর যে ঝড় উঠল, এটা বোধহয় তারই সূত্রপাত ছিল। এটা আমার আশ্চর্য লাগল যে, কোনও কোনও দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস সদস্য যখন খোলাখুলি পরিবর্তিত রূপে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ করছেন আপোসহীন বিরোধিতার কংগ্রেসি নীতি অগ্রাহ্য করে, তখন তাতে কোনও বিরক্তি কিংবা অস্বাচ্ছন্দ্যের উৎপত্তি হয়নি, আর আমার বিবৃতি যা ছিল ওই নীতির সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাতে ওঁরা অসন্তুষ্ট এবং বিরক্ত হলেন। বস্তুত আমরা বামপন্থীরা লক্ষ না করে পারলাম না যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশ্নে কংগ্রেসের পরিষ্কার এবং দ্ব্যর্থবোধহীন মনোভাবের পরেও তার বিরুদ্ধে কোনও দক্ষিণপন্থী কোনও জোরালো আন্দোলন আরম্ভ করলেন না।

অক্টোবর ১৯৩৮-এ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসি শিল্পমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে, আমি যার সভাপতি ছিলাম, সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়, একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা

হবে। সেখানে সাধারণ সম্পাদক সহ কংগ্রেসের কয়েকজন প্রধান নেতা উপস্থিত ছিলেন এবং কোনও ভিন্নমত ব্যক্ত করেননি। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ মহল ওই পদক্ষেপের সম্পর্কে অসন্তোষ ব্যক্ত করেন এবং জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিকে তাঁরা মনে করেন মহাত্মা গান্ধীর সৃষ্টি গ্রামীণ শিল্প সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পক্ষে বিপদজনক। অনেকে এরকমও বলেন যে, মহাত্মা গান্ধীর সারাজীবনের কাজ এর ফলে ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাতে আমাদের বিরুদ্ধে দাখিল করা অভিযোগপত্রে আরেকটি অভিযোগ যুক্ত হল।

যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে আমার জুলাই মাসের ঘোষণার পর ভারতে এবং বিদেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছিল এবং আমাদের মধ্যে অনেকে মনে করতে আরম্ভ করলেন, যুক্তরাষ্ট্র এখন আর আমাদের দেশের মানুষের বিপদের কারণ নয়। এর যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে যে, ব্রিটিশ সরকার তাদের নিজেদের স্বার্থেই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কয়েক বছরের জন্য মুলতুবি রাখবে, যতদিন না আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তাতে গভর্নমেন্টের কোনও ক্ষতি নেই। তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন ভালই কাজ করছিল এবং কেন্দ্রে পুরনো স্বেচ্ছাতন্ত্র ভালই চলছিল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রবর্তনের ফলে যদি গণপ্রতিরোধ এবং সম্ভবত আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়, যখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অত অন্ধকারাচ্ছন্ন, তা হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মুলতুবি রাখলে গভর্নমেন্টের লাভই হবে, তখন ভারতের সমস্যা হবে, প্রকৃতপক্ষেই যদি মুলতুবি হয়, আমরা কী করব।

আমি এই প্রশ্নটা প্রকাশ্যভাবে তুলেছিলাম গত বছর নভেম্বর মাসে, যখন আমি যুক্তপ্রদেশের এবং পঞ্জাবের কোনও কোনও অঞ্চলে সফর করছিলাম। আমি জোর দিয়ে বলেছিলাম, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা স্থগিত রাখারই সিদ্ধান্ত করে, আমরা যতদিন সে পরিকল্পনা আবার জিইয়ে তোলা যাচ্ছে ততদিন জাতীয় সংগ্রাম মুলতুবি রাখতে পারি না। আমাদের নিজেদেরই ভারতের জাতীয় দাবি উত্থাপন করতে হবে, তার উত্তর দেবার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে সময় দিতে হবে এবং ইতিমধ্যে আমাদের দাবি প্রথমে যদি প্রত্যাখাত হয়, সেই পরিস্থিতির জন্যে আমরা প্রস্তুত হব। জনসাধারণ আমাদের এই প্রস্তাবে প্রবলভাবে সাড়া দিলেন কিন্তু দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ এতে উদ্বুদ্ধ হলেন না। তাঁরা বরং প্রস্তাবটি নিয়ে হাসাহাসিই করলেন। তা সত্ত্বেও জলপাইগুড়িতে ১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গদেশের প্রদেশ কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে ওইরকমই একটি প্রস্তাব গৃহীত হল এবং তাকে জনপ্রিয় করবার জন্যে কিছু প্রচারও চালানো হল।

১৯৩৯-এর জানুয়ারির শেষদিকে, সে বছরের কংগ্রেস সভাপতির নির্বাচন হল। পুনর্নির্বাচনের জন্যে আমার প্রার্থী হওয়াটা দুঃসাহসের কাজ ছিল, কারণ কংগ্রেস সদস্যদের অধিকাংশের মনে হয়েছিল আমার সাফল্যের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। প্রার্থী হওয়ার পিছনে আমার যুক্তি ছিল আমি প্রার্থী হলে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধীদের শক্তি বৃদ্ধি হবে, নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, সেই ফলাফলে দক্ষিণপন্থীরা হতাশ হলেও, ভারতের বামপন্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করেছিল। সকলেই বলতে শুরু করলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাবনা নিশ্চিহ্ন।' ওয়ার্ধায় বলা হল, 'কুড়ি বছরের কাজ এক রাত্রে মুছে গেল।'

কিন্তু গান্ধীবাদীরা* অত সহজে অপ্রস্তুত হওয়ার মানুষ নন। মহাত্মা গান্ধী নড়ে চড়ে

---

* আমরা যখন কংগ্রেসিদের সম্পর্কে কথা বলি তখন গান্ধীবাদী এবং দক্ষিণপন্থী শব্দ দুটি একে অপরের স্থান পরিবর্তন করলেও অর্থান্তর ঘটে না।

বসলেন, সারা পৃথিবীর সামনে ঘোষণা করলেন, যে (আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, সে কথা সঠিক নয়) ড. পট্টভির পরাজয় তাঁর নিজেরই পরাজয়। পার্টির সংগঠন কাজে নেমে পড়ল পূর্ণ শক্তিতে এবং বিগত মার্চে ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের মহারণের জন্যে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হল।

ত্রিপুরীতে আমার সভাপতির ভাষণে আমি বললাম একটি নির্ভীক নীতি অবলম্বন করা উচিত, যাতে থাকবে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে একটি জাতীয় দাবিপত্র পেশ করা, উত্তরের জন্যে ছ' মাসের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া এবং মধ্যবর্তী সময়ে যাই ঘটুক তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকা। আমার পরামর্শে কেউ বিশেষ কান দিলেন না। স্বরাজের প্রশ্ন পিছনে পড়ে গেল এবং গান্ধীবাদীদের একমাত্র চিন্তা এবং প্রচেষ্টা হল সভাপতি নির্বাচনে পরাজয়ের তাঁরা কীভাবে শোধ তুলবেন। সে-বিষয়ে তাঁরা আশাবাদী ছিলেন, কারণ ইতিমধ্যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁদের দিকে চলে এসেছেন। তাঁদের জয় হল, কিন্তু তার জন্যে আমাদের জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের প্রয়াস কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হল, এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হল কলকাতায় গত এপ্রিলের শেষভাগে। কমিটির সামনে প্রধান সমস্যা ছিল কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি (অথবা ক্যাবিনেট) গঠন। জনসাধারণ ইতিমধ্যে জেনে গেছেন, যখন আমাকে একটি মিশ্র ক্যাবিনেট গঠন করতে দেওয়া হল না, যার মধ্যে দক্ষিণপন্থীরাও থাকবেন বামপন্থীরাও থাকবেন এবং কিছু নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে, তখন আমি পদত্যাগ করলাম। ততদিন পর্যন্ত দেশে বামপন্থী আন্দোলন চালান হচ্ছিল দক্ষিণপন্থীদের সহযোগিতার ভিত্তিতে। শেষোক্তগণ কলকাতায় পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নিলেন যে মিশ্র ক্যাবিনেট কাজের হবে না এবং বাম ও দক্ষিণপন্থীদের সহযোগিতা আর সম্ভব নয়। তখন আমাদের সামনে দুটো রাস্তাই মোটে খোলা ছিল, হয় দক্ষিণপন্থীদের কাছে আত্মসমর্পণ করা, নয় নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে বামপন্থাকে সংগঠিত করা। আমি শেষোক্ত পথটিই বেছে নিলাম।

কিন্তু কেন? ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার পত্রালাপে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, দক্ষিণপন্থীরা একটি জাতীয় সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবেন, এমন কোনও আশা নেই। অতএব দক্ষিণপন্থীদের কাছে আত্মসমর্পণের অর্থ সাংবিধানিক পন্থার কাছে আত্মসমর্পণ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোস। মহাত্মা গান্ধীর কাছে আমার প্রথম নিবেদন ছিল, তিনি যদি সংগ্রামের পক্ষে দাঁড়ান, আমরা সমস্ত বিভেদ বিসর্জন দিয়ে তাঁর পিছনে দাঁড়াব। তাঁর জবাবে আমরা হতাশ হলাম। ফলে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করতে হল।

ফরওয়ার্ড ব্লকের ত্রিবিধ কর্তব্য ছিল: (১) বামপন্থীদের সংহত করা, (২) কংগ্রেসের মধ্যে প্রকৃত এবং কার্যকর ঐক্য সাধন, (৩) কংগ্রেসের নামে জাতীয় সংগ্রাম পুনরায় আরম্ভ করা। এই ত্রিবিধ কর্তব্য আমরা সারা দেশে জনপ্রিয় করে তুলি। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, যে আমরা বিভেদ সৃষ্টি করছি, সংহতি বিনাশ করছি। প্রকৃতপক্ষে অনৈক্য সৃষ্টি করছিলেন দক্ষিণপন্থীরা, যাঁরা বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অসম্মত হন এবং তাঁদের বাধ্য করেন দক্ষিণপন্থীদের থেকে আলাদা হয়ে বামপন্থী ঐক্য স্থাপন করতে।

গত দু' বছর যেভাবে দক্ষিণপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ করা চলছিল, বামপন্থীদের ঐক্য স্থাপন তার স্বাভাবিক বিপরীত প্রক্রিয়া। দক্ষিণপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ করায় আপত্তির কিছু ছিল না এবং কোনও আপত্তি তোলা হয়নি যখন গান্ধী সেবা সঙ্ঘকে একটি রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত করা হল। কিন্তু যখন ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করা হল এবং বামপন্থীদের সংহত করার চেষ্টা

হল— বিভেদ সৃষ্টির এবং সংহতি বিনাশের অভিযোগ তুলে চেঁচামেচি আরম্ভ হল।

ফরওয়ার্ড ব্লকের মতে কংগ্রেসের বর্তমান কর্মসূচির মধ্যে জাতীয় স্বার্থের অনুকূল যা আছে, তাতে প্রাণসঞ্চার করে তাকে কার্যকর করতে হবে। তার ওপরেও একটি অতিরিক্ত কর্মসূচি প্রয়োজন, জাতিকে যেকোনও পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে। এবং এই দুটি কর্মসূচির যে কোনওটিকে কাজে পরিণত করার জন্য সাংবিধানিক মনোবৃত্তি ত্যাগ করে একটি সংগ্রামী মনোভাব অবশ্য প্রয়োজনীয়। যেকোনও কর্মধারার পিছনে যে তাগিদ প্রয়োজন তা আসে মনোভাব থেকে।

ফরওয়ার্ড ব্লক এবং তার কর্মসূচি নিয়ে নানা সমালোচনা হচ্ছে। তার কিছু বাস্তব, কিছু বিদ্বেষপ্রসূত। মানুষের কোনও প্রতিষ্ঠানই দাবি করতে পারে না যে, তারা দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে। কাজেই ফরওয়ার্ড ব্লকও ত্রুটিমুক্ত হতে পারে না। কিন্তু আসল কথা হল, তার চেয়ে ভাল কিছু, এমন কিছু যা তার স্থান গ্রহণ করতে পারে, কেউ বলতে পারেন কিনা, যার দ্বারা আমরা আমাদের জাতীয় লক্ষ্যে আরও দ্রুত পৌঁছতে পারি, যতদূর সম্ভব কম আত্মত্যাগের দ্বারা? সেরকম বিকল্পের কথা যদি কেউ বলতে পারেন, আমরা সানন্দে তা গ্রহণ করব। যত যাই হোক, লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্যই ফরওয়ার্ড ব্লক, ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্যে লক্ষ্যে পৌঁছনো নয়। তবে আমাদের আশঙ্কা, ফরওয়ার্ড ব্লকের চেয়ে ভাল কিছুর কথা বলা সম্ভব হবে না।

অতীতের দিকে তাকালে আমাদের মনে হতে বাধ্য, আমাদের আগেকার পরামর্শ যদি গ্রহণ করা হত এবং তাকে কার্যকর করা হত, আজকের পরিস্থিতি কতখানি অন্যরকম হত। ত্রিপুরী কংগ্রেসের ছ' মাস পরে ইউরোপে যুদ্ধ লাগল এবং ভারতকে জোর করে তার মধ্যে টেনে নেওয়া হল। যে-সংকট আমাদের ওপর এসে পড়ল, সারা পৃথিবী তার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস হয়নি। এমন অক্ষম নেতৃত্ব পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

যুদ্ধ বাধবার পরেও নেতারা চিন্তাই করছেন, চিন্তাই করছেন। খালি দ্বিধা, সংশয়, দুর্বলতা প্রতি পদে। হরিপুরা এবং ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলো মনে থাকল না। যদি মনে থাকত দ্বিধা, সংশয় না থাকত, তা হলে হয়তো দ্বিধা এবং নিষ্ক্রিয়তার পরিবর্তে আমরা দেখতাম স্থির সিদ্ধান্ত এবং তার অনুসারী সক্রিয়তা।

আমাদের কি এখনও বুঝতে বাকি আছে, নতুন দিল্লিতে গিয়ে ধর্না দিলে আমাদের লক্ষ্যপূরণ হবে না। স্বরাজ লাভের উপায় সেখানে পাওয়া যাবে না, আমাদের নিজেদের মধ্যেই খুঁজতে হবে।

তবে, চিন্তা যদি করতেই হয় এক মুহূর্ত ভেবে দেখুন পরিস্থিতি কীরকম হত, যদি প্রয়াত বিঠলভাই প্যাটেল, যাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়, তাঁর উত্তরাধিকার যদি ঠিকভাবে ব্যবহার করা হত, ভারত সারা বিশ্বে বেসরকারি দূতাবাস স্থাপন করত। কিন্তু কোনও কোনও ব্যক্তির কাছে হয়তো স্বরাজের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বামপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যাওয়া।

১১

কোন পথে শীর্ষ নেতৃত্ব?

'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকা, ১৮ নভেম্বর ১৯৩৯ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

যেসব সাধারণ মানুষ আলো এবং নেতৃত্বের জন্য সাধারণত কংগ্রেসের দিকে তাকিয়ে থাকেন, সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকেই তাঁরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ছেন, বিভ্রান্ত বোধ করছেন। আগে মনে করা হত যুদ্ধ সম্পর্কে হরিপুরা কংগ্রেসের প্রস্তাবই অভ্রান্ত পথনির্দেশক এবং স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিল সংকট আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। কিন্তু তা হল না, প্রথমে বিলম্ব হল, তারপর দক্ষিণপন্থী মহলে এই সঙ্গে মৃদু গুঞ্জন শুরু হল যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই প্রস্তাব অকার্যকর হয়ে পড়েছে। তার ফল হল দোলায়মানতা, আপেক্ষিক নিষ্ক্রিয়তা।

বিস্ময় ও বিভ্রান্তির পরে এল চূড়ান্ত বিহ্বলতা। সহজেই কল্পনা করা যায়, কংগ্রেসের কাছ থেকে এগিয়ে যাওয়ার আদেশ পাওয়া যাঁদের অভ্যাস, তাঁদের মানসিক অবস্থা কী দাঁড়াল। তাঁরা কী করবেন? যে হরিপুরা প্রস্তাব হওয়া উচিত ছিল তাঁদের ব্যক্তিনিরপেক্ষ পথনির্দেশক, তাকে বেমালুম পাশে সরিয়ে দেওয়া হল এবং আর কিছুকে তার জায়গায় আনা হল না। সন্দেহ নেই, সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটি বাক্যবহুল প্রস্তাব রচনা করল, যাকে আমাদের আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ এই বলে স্বাগত জানালেন যে সেটি "সারা পৃথিবীকে পথ প্রদর্শন করছে" কিংবা সেটি "পরাধীন জাতিসমূহের স্বাধীনতার সম্পদ"। কিন্তু প্রস্তাবটি বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, তাতে কতকগুলি শব্দ ছাড়া কিছুই নেই। বাগবাহুল্যের মাঝখানে সারবস্তু কিছু ছিল না। যুদ্ধের লক্ষ্য এবং ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের বিষয়ে যেসব প্রশ্ন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রদত্ত তার উত্তর যদি যথেষ্ট না হয়, অসন্তোষজনক হয়, তা হলে কংগ্রেস কী করবে?

প্রস্তাবের বীরত্বব্যঞ্জক ভাষা সরলমতি পাঠকের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশা জাগিয়েছিল, কাজও বীরত্বব্যঞ্জক হবে। কিন্তু সেই প্রস্তাবের প্রণেতাদের উদ্দেশ্য কি সেইরকম বীরোচিত ছিল? দক্ষিণপন্থী মহলে উচ্চ আশা ছিল, তাঁরা ভেবেছিলেন, সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া যাবে এবং সেভাবে সংকট এড়ানো যাবে। কিন্তু সেরকম উচ্চ আশার কারণ কী ছিল বোঝা যায় না। সেই পরিস্থিতিতে ওরকম আশা পোষণ করা, যিনি রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন বলে নিজেকে দাবি করেন, এমন কারও উচিত নয়। তা হলেও যথেষ্ট আশার মনোভাব ছিল, অক্টোবরে ভাইসরয়ের ঘোষণা যাকে ভূমিসাৎ করে দিল। আমাদের মন্ত্রীদের আয়োজনের বিবৃতিতে ছিল একটা আর্তনাদ। সে বিবৃতি পাঠ করা কষ্টদায়ক।

সেই একবার অন্তত দ্রুত কাজ করা হল। ভাইসরয়ের বিবৃতিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রতিক্রিয়া হল। অবিলম্বে আমাদের মন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হল। সে কাজ যেভাবে করা উচিত ছিল সে বিষয়ে যদিও আমাদের মত ভিন্ন ছিল, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না যে, জাতির সম্মানকে কালিমামুক্ত করা যার কর্তব্য সেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মন্ত্রীদের পদত্যাগ যোগ্য কাজ ছিল। অন্তত ওইটুকু কংগ্রেসকে করতেই হত, কিন্তু ওইটুকু যথেষ্ট নয়।

আমাদের দক্ষিণপন্থী বন্ধুরা ভাইসরয়ের বিবৃতিতে হতাশ ও বিস্মিত হয়েছিলেন। তারপর ভাইসরয় এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের হতাশ ও বিস্মিত হওয়ার পালা, কংগ্রেসের মন্ত্রীসভাগুলির পদত্যাগ। মন্ত্রীদের পদত্যাগে সরকারি মহলে হতাশা এবং বিস্ময়ের সৃষ্টি কেন হল, এই পদত্যাগ অনিবার্য বলে কেন মনে করা হল না, এ প্রশ্ন করা যেতে পারে। সে-প্রশ্নের উত্তর যাই হোক, প্রকৃত ঘটনা কী ঘটেছিল সেটা পরিষ্কার। তবে অনুমান করা যায়, কতকগুলি কারণে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মনে হয়েছিল, কংগ্রেস সংঘাতে যাবে না। সেপ্টেম্বরের প্রথমে মহাত্মা গান্ধীর বিবৃতি, যাতে গভর্নমেন্টের সঙ্গে নিঃশর্ত সহায়তার মনোভাব প্রকট হল, দক্ষিণপন্থী, বিশেষত মন্ত্রীদের মনোভাব, দক্ষিণপন্থীদের আধিপত্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রস্তুতির অভাব, এইসব এবং আরও কিছু কিছু বস্তুর অর্থ এবং তাৎপর্য একটাই এবং দিল্লি এবং হোয়াইট হল কর্তৃপক্ষের মনে করা স্বাভাবিক ছিল যে কংগ্রেসের তরফে কোনও অশান্তি সৃষ্টি করা হবে না। এই অনুমান যুক্তিসম্মত ছিল। কিন্তু একটা হিসাবের ভুল ছিল এর মধ্যে। কংগ্রেস সংগঠনটি স্থাণু নয় এবং তার মধ্যে সকলেই অভিন্নপ্রকৃতির নয়। কাজেই কংগ্রেসের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা তার ওপরে নিজেদের প্রভাব কার্যকর করতে পারেন এবং তার এমন ফল হতে পারে যা বাইরের লোকেরা মনে করতে পারেন, কংগ্রেসের কার্যধারা থেকে বিচ্যুতি কিংবা উন্নতির নিরিখে অন্তত অপ্রত্যাশিত।

বর্তমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রীদের পদত্যাগ একজন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে কখনওই একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে হতে পারে না। একজন সাধারণ মানুষ তাঁর সাধারণ বুদ্ধিতে, সহজাত যুক্তিবোধে এই পদত্যাগ তার স্বাভাবিক পরিণতি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে বলেই আশা করছিলেন। লোকাতীত কোনও যুক্তি, (শব্দটি যদি ব্যবহার করতে পারি) তাঁর এই ধারণা বদলে দিতে পারবে না। এই প্রাথমিক সত্যটি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, যদি কংগ্রেস এই সংকটের সময়ে ভারতের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাঘাতকতা না করতে চায়। বিচক্ষণতা সাবধানতা এমনকী সত্য ও অহিংসার নামে যত অজুহাত, যত সাফাই দেওয়া হোক না কেন জনসাধারণের যে দাবি, যে বর্তমানে আমাদের পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক, আত্মসম্মান এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে কংগ্রেসকে এখন তার লক্ষ্যের অভিমুখে এগিয়ে যেতে হবে, সে দাবি কণামাত্র দুর্বল হবে না। জাতির আত্মার এই মৌলিক দাবি যদি আমরা অগ্রাহ্য করি, তাতে আমাদের বিপদই ডেকে আনা হবে।

জাতি যে এগিয়ে যাওয়ার নীতি ও কার্যক্রম দাবি করে এসেছে, গত এক বছর কিংবা তার অধিককাল একভাবে মহাত্মা গান্ধী তা প্রতিরোধ করেছেন। প্রধানত দুটিই তাঁর বাঁধা-ধরা যুক্তি। তার মতের পিছনে, প্রথম কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দুর্নীতি এবং দ্বিতীয়ত জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ কালেই হিংসা আরম্ভ হওয়ার অবশ্যম্ভাবিতা। অতীতে আমরা প্রায়ই বলেছি, এই দুই যুক্তির সারবত্তা সন্দেহজনক এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া রোধ করতে কখনওই ওই দুটি যুক্তি ব্যবহার করা যায় না।

সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকে উপরোক্ত দুটি যুক্তির সঙ্গে যোগ করা হয়েছে তৃতীয় একটি, আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা আরম্ভ হবে। এর চেয়ে ভ্রান্ত, অর্থহীন যুক্তি কল্পনা করা যায় না। হিন্দু এবং মুসলিম, যাদের নামে এমন গুরুতর অপবাদ দেওয়া হয়েছে, আমাদের কোনও সন্দেহ নেই, তাঁরা প্রবলভাবে সে অভিযোগ অস্বীকার করবেন। আমরা যতদূর বুঝি এবং জানি, কংগ্রেসের তরফ থেকে কোনও অগ্রগামী নীতিতে

বর্তমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হবে। এবং দুটি সম্প্রদায় আগেকার চেয়ে পরস্পরের কাছে চলে আসবে।

আপনি যদি এগিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত না হন, তা হলে কোনওরকম যদি, কিন্তু, ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে খোলাখুলি সে-কথা বলেন না কেন? আমার যুক্তি ছিল আসল প্রশ্নটাকে গুলিয়ে দিচ্ছেন কেন?

বামপন্থীদের নীতি অত্যন্ত পরিষ্কার এবং অসংখ্যবার ব্যক্ত করা হয়েছে। কংগ্রেস যদি এগিয়ে না যায়, আমরা যাব। মহাত্মা গান্ধীর কিংবা ওয়ার্কিং কমিটির কোনও হুমকি আমাদের বিরত করতে পারবে না। আর, তাঁরা যদি আমাদের বাধা দেন, আমরা নির্ভয়ে সে বাধার সামনে দাঁড়াব।

কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি যদি পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়, আমরা তার সঙ্গে থাকব, অনুগত সৈনিকের মতো। মুহূর্তে সব বিভেদ দূর হবে এবং কংগ্রেসের সমস্ত সাধারণ কর্মী সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য সৈন্যবাহিনীর মতো সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে।

১২

কার বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াই?

‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ পত্রিকা, ২৫ নভেম্বর ১৯৩৯ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

আজ সকালের সংবাদপত্রগুলোর ওপর যখন চোখ বোলাচ্ছিলাম, একটি বেখাপ্পা জিনিস আমার নজরে পড়ল। প্রথম পৃষ্ঠাতে—এবং সম্ভবত গুরুত্বেও প্রথম— প্রকাশিত হয়েছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাব-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব। তার পরেই এসেছে রামগড় কংগ্রেসের সময়সূচি। তারপর আমরা পাই বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ প্রস্তাব।

প্রথম প্রস্তাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাক্যটি হল, ‘ওয়ার্কিং কমিটি একটি সম্মানজনক মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্যে সমস্ত রকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে কংগ্রেসের মুখের সামনে সমস্ত দরজা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বন্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও।’ সোজা করে বললে কথাটা দাঁড়ায়, ‘ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আমাদের পদাঘাত করা সত্ত্বেও আমরা তার পদলেহন করেই যাব।’

একে আমরা রাজনীতি বলি না, আধুনিক জগৎও একে রাজনীতি বলে না। তবে বাইবেলের কিংবা বৈষ্ণবীয় মতে হয়তো তা হতে পারে। এই নীতি কোনও একজন ব্যক্তি বা মুষ্টিমেয় লোকের পছন্দ হতে পারে, কিন্তু যে-জাতি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মর্জির চেয়ে স্বাধীনতায় বেশি আগ্রহী, যে-স্বাধীনতা একটি জীবনমরণের প্রশ্ন, তার কাছে কি এ-নীতি গ্রহণযোগ্য হবে? দেখতে হবে, যে পা দিয়ে আমাদের লাথি মারা হল, সেই পা-ই আমরা

চাটব, এই দাবি যে নীতি করে সে-নীতি আমরা প্রত্যাখ্যান করি কিনা।

সেই একই প্রস্তাবে আরও আছে: 'ওয়ার্কিং কমিটি পরিষ্কার করে জানাতে চায়, আইন অমান্য আন্দোলনের জন্যে আমরা প্রস্তুত কিনা, তার আসল পরীক্ষা, কংগ্রেসিদের নিজেদের চরকা চালান, এবং মিলের কাপড় বাদ দিয়ে খাদির উন্নয়নের চেষ্টা করা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন করবার জন্যে কংগ্রেসিদের ব্যক্তিগতভাবে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের জন্যে যখনই সম্ভব সেবার কাজ করা। এবং প্রত্যেক হিন্দু কংগ্রেসি ক্রমাগত সুযোগের অন্বেষণ করে চলেছেন, যত বেশিবার হরিজন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে একেবারে ভাই ভাই গলাগলি করতে পারা যায়। অতএব কংগ্রেস সংগঠনকে এবং কংগ্রেসিদের ওই কার্যসূচি রূপায়িত করে ভবিষ্যতের জন্যে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হবে...।'

প্রস্তাবের এই অংশে এসে আমাদের চোখ রগড়াতে হয়েছিল। এর তারিখটা ঠিক দেখলাম তো? ২৪ নভেম্বর ১৯৩৯। তা হলে খ্রীস্টীয় ১৯৩৯ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিণত রাজনৈতিক দল দেশকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করতে ওইরকম একটি চমৎকার পরিকল্পনা করেছে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য কোনও কর্মীবাহিনী, কোনও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে দলভুক্ত করার কোনও উল্লেখ নেই। উচ্চতর চেতনার প্রতি কোনও আয়োজন নেই, যাতে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে রোমাঞ্চের শিহরণ প্রবাহিত হয়, তাকে দুঃখ ভোগ, নির্যাতন ভোগ করার জন্য ইস্পাতের কাঠিন্য দান করে। একটি তহবিল গঠনের কোনও পরিকল্পনা নেই, যা কিনা সহিংস বা অহিংস— যে ধরনের আন্দোলনই হোক না কেন— তার জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। অন্য সব গুরুত্বহীন ব্যাপার গুটিয়ে ফেলে আন্দোলনের জন্য সমস্ত শক্তি ও সময় ব্যয় করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কথাও নেই। তার বদলে আমাদের বলা হল, রামগড় কংগ্রেসের জন্য প্রস্তুতি, প্রতিনিধি নির্বাচন, সভাপতি নির্বাচন প্রভৃতি পুরোদমে চালিয়ে যেতে হবে, যেন কিছুই হয়নি, কিছুই হবে না। কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণ কিছুদিন আগে যেমন ছিল, এখন আর রাজনৈতিক বিষয়ে সেরকম অজ্ঞ, সেরকম সরলমতি নেই। আজকের দিনে একটি শিশুও কি জানে না, যে যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থায় যেকোনও সরকারের প্রথম কাজই নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করে দেওয়া?

এই পটভূমিতে জ্বলজ্বল করছে কংগ্রেস কমিটির বিভিন্ন অগ্রগণ্য নেতা, ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ, মাঝে মাঝে যেসব বিবৃতি দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, তাঁরা আশা করেন এবং বিশ্বাস করেন অচিরে কংগ্রেসি মন্ত্রীরা তাঁদের মন্ত্রীপদে ফিরে যেতে পারবেন। কীরকম সতৃষ্ণ নয়নে, সাশ্রু নয়নে তাঁরা সেইসব শূন্য চেয়ারের কথা ভাবছেন এইরকম পরিস্থিতিতে, এইরকম জরুরি অবস্থার মধ্যে। আমি ভাবি, তাঁরা কি সব জাতীয় আত্মসম্মান হারিয়েছেন? এবং অবাক হতে হয়, বেদনা বোধ হয় যখন মনে পড়ে এই দুঃখজনক অবস্থার মধ্যে একজন ভারতীয় প্রাক্তন বিপ্লবী, প্রাক্তন বামপন্থী নেতা, একাকী, একদা গুণমুগ্ধ বিশ্ববাসীর সামনে জোর দিয়ে বলেছিলেন, তিনি অমিশ্র ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ গ্রহণ করবেন না, সেটা দক্ষিণপন্থীদেরই হোক, আর বামপন্থীদেরই হোক। কে বলে দেবে, এই সমুচ্চ ঘোষণা— যা তিনি বর্তমানে পুনর্বিবেচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর বর্তমান অবস্থানে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে তাঁর নিজেকে সম্পূর্ণ মিলিয়ে দেওয়া এবং দেশের বামপন্থী আন্দোলনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করাকে কীভাবে খাপ খাওয়ানো যায়?

অতএব আমরা সোজাসুজি স্পষ্ট কথা বলব, যদিও তাতে কারও কোনও দুর্বল স্থানে

আঘাত লাগতে পারে। আমাদের জাতির ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে বক্তব্যকে মিষ্টি করে বলবার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। ওয়ার্কিং কমিটির ওইসব প্রস্তাব বাগাড়ম্বর ছাড়া, দেশের নিরপরাধ মানুষের চোখ ধুলো দেওয়ার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। এক বছর কিংবা তার বেশি সময় ধরে মহাত্মা গান্ধী এক কথাই বলে যাচ্ছেন, জাতীয় সংগ্রামের প্রশ্নই ওঠে না, দেশ তার জন্য তৈরি নয়। যদিও প্রশ্ন করা যেতে পারে, তৈরি নয় কী? দেশ, না ওয়ার্কিং কমিটির উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করা? মহাত্মা যদি প্রথম থেকেই সংঘর্ষ চাইতেন, বাম ও দক্ষিণপন্থার মধ্যে এখনকার বিতর্ক-বিবাদের উদ্ভবই হত না। কাজেই এত দেরিতে আর যে তিনি, গত বারো মাস ধরে যা বলে আসছেন, তা যে ফিরিয়ে নেবেন, সে আশা কম। ঘটনার চাপে এবং জনমতের ঠেলায় তাঁকে অনেক কিছু করতে বাধ্য করতে পারে, কিন্তু দেশব্যাপী সংঘর্ষ তাঁকে দিয়ে আরম্ভ করাতে পারবে না। জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে যারা সাঁতার দিচ্ছে তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া এক কথা, কিন্তু অন্যদের সন্তরণ দেখেই যার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, তাকে পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিলে, সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। ১৯২১-এ 'ইয়ং ইন্ডিয়া'-তে যে অনুপ্রেরণাদায়ক প্রবন্ধগুলো বেরোচ্ছিল, তার সঙ্গে তুলনা করুন বর্তমানে 'হরিজন' সাপ্তাহিকে যা পাচ্ছি তার সঙ্গে। আমরা এক পরিবর্তনশীল জগতে বাস করছি এবং এই জগৎ যত বদলাচ্ছে, যেসব ব্যক্তিত্ব এর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছেন, তাঁরাও তত বদলাচ্ছেন।

আজকের সমস্যা শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করার সমস্যা নয়। যদি করতেই হয়, সে কাজ এমনভাবে করতে হবে যাতে তা কার্যকর হয়, নাহলে সেটা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করা হবে না, প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে অকেজো করে দেওয়া হবে। আরও প্রশ্ন আছে। সে-সংগ্রাম জয়লাভ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে, মাঝপথে বন্ধ করে দিলে চলবে না। আবার খোলাখুলি বলি, বর্তমান ওয়ার্কিং কমিটি যদি প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভও করে, বামপন্থীদের মনে আশঙ্কা থেকেই যাবে, যে-কোনও সময়ে আবার চৌরি চৌরা কিংবা হরিজন আন্দোলন, সম্ভবত নতুন রূপে, আবার দেখা দেবে এবং আমাদের সংগ্রাম যখন সাকার এবং শক্তিতে বেড়ে উঠছে, ঠিক তখনই তাকে চাপা দিয়ে দেবে।

আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন— এই আশঙ্কা কি যুক্তিযুক্ত? অবশ্যই যুক্তিযুক্ত, না হলে যুদ্ধ ঘোষণার পরেও বামপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সমান তীব্রতায় চালিয়ে যাওয়া হত না। সমস্ত প্রদেশ থেকে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে এই অভিযানের খবর আসছে ক্রমাগত এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের ক্ষেত্রে এটাকে বলা যায় নিরবচ্ছিন্ন শত্রুতা। স্বাভাবিকভাবেই ওয়ার্কিং কমিটির আক্রোশ ঘনীভূত হয়েছে বঙ্গদেশের ওপর এবং বঙ্গদেশের দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন সভাপতি নিজে। প্রদেশের সর্বত্র খবর চলে গেছে যে, সুদূরতম প্রান্ত থেকে কেউ সরাসরি ওয়ার্কিং কমিটির কাছে কোনও অভিযোগ ওয়ার্কিং কমিটি কিংবা সভাপতির সকাশে পাঠালেই হল। তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিকে সঙ্গে সঙ্গে সমন পাঠিয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। ফলে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক দেখেন, সংবাদপত্রে সুদীর্ঘ বিবৃতিতে ঐক্য এবং শৃঙ্খলার আদর্শের গুণগান এবং কার্যক্ষেত্রে কংগ্রেসের অভ্যন্তরের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের দমন ও নিপীড়ন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বেলায় ভাইসরয়ের প্রাসাদে তীর্থ গমন, এবং পদাঘাতকারীর পদলেহন, আর বামপন্থী সহকর্মীদের বেলায় সত্য ও অহিংসার প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে, সহিষ্ণুতা, শুভ ইচ্ছা এবং উদারতার কোনও প্রকাশের একান্ত অভাব। এবং শত্রুতার আচরণ, আক্রোশ পূর্ণমাত্রায় বজায়।

এই অরুচিকর কাহিনি আমাদের কি শিক্ষা দেয়? এই শিক্ষা, যে দক্ষিণপন্থীদের কাছে ভারতীয় বামপন্থীগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর চেয়ে বড় শত্রু। শেষোক্তের সঙ্গে আপোস করা যায়, কিন্তু বামপন্থীদের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে হবে তাদের খতম করা পর্যন্ত, এবং সম্ভবত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যদি ভারতীয় বামপন্থার ওপর আঘাত হানে, তাতে তাদের দুঃখ পাবার কিছু থাকবে না।

'ভারতকে যদি স্বাধীন করতে হয়, আমরাই করব, নইলে স্বাধীন করার দরকার নেই'— এই বঙ্গপ্রবাদ অনুযায়ী, এটাই আমাদের দক্ষিণপন্থীদের মত।

১৩

আমাদের ওয়ার্কিং কমিটি

'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকা, ২ ডিসেম্বর ১৯৩৯ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

ফরওয়ার্ড ব্লকের অল ইন্ডিয়া ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হল কলকাতায় ২৪ নভেম্বর এবং তার পরের কয়েক দিন। অন্যান্য বামপন্থী সংগঠন, যেমন সারা ভারত কিষাণ সভা এবং জাতীয় মোর্চা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরাও আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতি এবং পরামর্শ অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী, যিনি সারা ভারত কিষাণ সভার সাধারণ সম্পাদক এবং একাই একশো এবং ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের শক্তির এক মস্ত বড় উৎস, তিনি সানুগ্রহে এক পক্ষকালের মধ্যে দু'বার কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয়বার আগমন হয়েছিল অল ইন্ডিয়া ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের সময়ে। কমিটি গভীরভাবে অনেক চিন্তাভাবনা করেছে, আত্মানুসন্ধান করেছে এবং নানা বিষয়ে বিবিধ মাত্রার গুরুত্বপূর্ণ ষোলোটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। দৈনিক পত্রিকায় প্রস্তাবগুলি আগেই প্রকাশিত হয়েছে, তবু এই সংখ্যাতে একসঙ্গে সেগুলো প্রকাশ করা হল।

প্রধান প্রস্তাবটি ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি সংক্রান্ত। প্রস্তাবটি যুদ্ধ সংক্রান্ত নীতি এবং ভারতের জাতীয় দাবি নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছে এবং কোনও কোনও বিষয়ে কমিটির বিরূপ সমালোচনা করেছে। প্রস্তাবটি জনসাধারণের অনুধাবন করা উচিত। প্রস্তাবটির মূল বক্তব্য হল, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বক্তব্য এবং মনোভাব এখনও পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা হয়নি, যার ফলে সাধারণ মানুষের সেসব বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে গিয়েছে। কমিটির সদস্যদের এবং মহাত্মা গান্ধীরও কোনও কোনও উক্তি এবং বিবৃতি থেকে ধারণা হয়, যে তাঁরা সংগ্রামের কথা বলছেন। অন্যগুলিতে আবার তার বিপরীত ধারণার সৃষ্টি হয়, যেমন, এই অর্থে মহাত্মাজির উক্তি যে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হলে তিনি তার বিরোধিতা করবেন এবং মাদ্রাজের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুত রাজাগোপালাচারীর

এই মর্মে উক্তি যে কংগ্রেসি মন্ত্রীরা তিন মাসের ছুটিতে আছেন। এইসব মন্তব্য ছাড়াও মাঝে মাঝে খবর পাওয়া যাচ্ছে, যাতে এই ধারণাই সমর্থিত হয়, শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সংঘর্ষে যাবে না। যেমন বিহার থেকে খবর এসেছে, পরামর্শদাতাগণ, যাঁরা মন্ত্রীদের সাম্প্রতিক পদত্যাগের পর থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করছেন, কোনও কোনও ক্ষেত্রে আদেশ দিয়েছেন, ফাইলগুলো কংগ্রেস মন্ত্রীরা কাজে ফিরে এলে তাঁদের সামনে যেন রাখা হয়।

ফরওয়ার্ড ব্লক একাধিকবার পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যদি তার কাছে প্রত্যাশিত যে নেতৃত্ব, তা না দেয়, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করবে, যদিও নিঃসন্দেহে সবচাইতে ভাল হয়, যদি কংগ্রেসের সংগঠনের নামে আহ্বান জারি করা হয়। এখন প্রশ্ন, শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কী করবে। এরকম কোনও অভিযোগের কোনও অবকাশ যেন না থাকে যে, তাঁরা সে-আহ্বান দিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং অন্য কেউ তাতে নাক গলিয়েছিল। এতাবৎকাল সি. ডব্লিউ. সি. অন্যদের অপেক্ষা করতে এবং তাকে জনসাধারণের দাবি পূরণ করার সুযোগ দিতে বলে আসছে। কিন্তু আমাদের ধৈর্যের একটা সীমা থাকা উচিত। অতএব, যত তাড়াতাড়ি ওয়ার্কিং কমিটি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছোয়, আন্দোলন করবে কি করবে না, এবং সে-সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, সকলের পক্ষে ততই ভাল।

অন্য অনেক বিষয়ের মতো, এ-বিষয়েও আমাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ আমাদের বিরুদ্ধে দু-মুখী প্রচার চালাচ্ছেন। সি. ডব্লিউ. সি.-র এবং মহাত্মা গান্ধীর মুখাপেক্ষা না করে আমরা কাজে নামব বলে হুমকি দিচ্ছি বলে আমাদের নিন্দা করা হচ্ছে, আবার একই সঙ্গে আমাদের সমালোচনা করা হচ্ছে এই বলে, আমরা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ ঘোষণা করছি না। খবর পাওয়া যাচ্ছে, সি. ডব্লিউ. সি.-র সদস্যরা জনসভায় খোলাখুলি আমাদের চ্যালেঞ্জ করেছেন সংগ্রাম আরম্ভ করতে। দুরকম নিন্দার কোনওটাই আমরা গায়ে মাখছি না, কেননা আমরা ঠিক করে ফেলেছি, জাতির স্বার্থে কোন পথে আমাদের এগোনো উচিত, আমাদের সমালোচকেরা তাতে খুশিই হন, আর ভুরুই কোঁচকান।

ফরওয়ার্ড ব্লক যে মনোভাবের কথা ঘোষণা করেছে, তাতে কেউ যেন মনে না করেন যে সি. ডব্লিউ. সি.-র প্রতি কোনও হুমকি দেওয়া হয়েছে কিংবা তাকে চ্যালেঞ্জ জানান হয়েছে, কেননা তাতে সেরকম কিছু নেই। সেই কারণে বারে বারে এও বলা হয়েছে যে, সবচাইতে ভাল হয় যদি সি. ডব্লিউ. সি. এগিয়ে যায় এবং ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেস তার পিছনে থাকে। তা হলেও, একথা স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের মনোভাব সি. ডব্লিউ. সি.-কে সংকল্পে স্থির থাকতে সাহায্য করেছে। সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ বাধবার পর সি. ডব্লিউ. সি. কী করত কিংবা এতদিনে কংগ্রেসি মন্ত্রীরা পদত্যাগ করতেন কি না, এখন কে বলতে পারে, যদি যুদ্ধ সংক্রান্ত নীতি ও জাতীয় দাবির বিষয়ে বামপন্থীরা সাহসের সঙ্গে তাঁদের অবস্থান গ্রহণ না করতেন?

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রস্তাবটিও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাতে বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাদের মনোভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। অধিকাংশ মানুষই এটা বুঝতে পারেন না যে, ইউরোপে আমরা বর্তমান যে অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি দেখছি তার জন্যে প্রধানত যে দুটি দেশ দায়ী তারা হল— ব্রিটেন এবং ফ্রান্স। ওই দুটি দেশই সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি তাদের বিজাতীয় বিদ্বেষের কারণে এবং সেই দেশকে ইওরোপের রাজনীতি থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নানা ধরনের ফ্যাসিজমকে উৎসাহিত করেছে। তা ছাড়া জার্মানিকে

চারিদিক থেকে ঘিরে রাখবার জন্যে প্রধানত এম. লাভালের প্রচেষ্টায় ফ্রান্স যে মৈত্রী সংগঠন ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল তাকে তলায় তলায় আঘাত করে শেষ পর্যন্ত বিনষ্ট করবার জন্যে গ্রেট ব্রিটেনই দায়ী। সেইভাবে হৃতশক্তি ফ্রান্স স্বাভাবিক কারণেই ব্রিটেনের বাহুবন্ধনে ধরা দিল। তার ফলে রাশিয়া, জার্মানি এবং ইতালির বাইরে যে ইউরোপ, এখন পরিচালিত হচ্ছে ব্রিটেনের বিদেশনীতি অনুযায়ী। রাশিয়া একভাবে এবং দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছিল গ্রেট ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের সঙ্গে এবং পোল্যান্ডের সঙ্গেও একটা বোঝাপড়ায় আসতে। যখন সে বুঝল সে-আশা পূর্ণ হওয়া একান্তই অসম্ভব, একমাত্র তখনই সে জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নিল। বিদেশনীতি সম্পর্কে সাম্প্রতিক কয়েক মাসে এম. মলোটভ যেসব বিবৃতি দিয়েছেন, স্বচ্ছতা এবং প্রাঞ্জলতার জন্যে সেই বিবৃতিগুলো লক্ষ্যণীয় এবং সমস্ত বিদেশমন্ত্রীদের সেগুলো আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

সম্প্রতি পণ্ডিত ভি. ডি. ত্রিপাঠী, যিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের সারা ভারত কমিটির সেক্রেটারি এবং প্রদেশ ফরওয়ার্ড ব্লকের সভাপতি, তাঁর গ্রেপ্তার নিরতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। সর্বসাধারণের চোখে এ গ্রেপ্তার একটি জিনিসকে বড় করে তুলে ধরেছে, যা আমরা আগেই জানতাম, যে ফরওয়ার্ড ব্লকের ওপর দমন-নীতি পুরোদমে চলছে। একটি অ-যথার্থ কিন্তু মনের মতো শব্দ ব্যবহার করে বলা যায়, যুক্তপ্রদেশের উনাও জেলা, যেটি ত্রিপাঠীর নিজের জেলা, সেখানকার তিনি মুকুটহীন রাজা। ফরওয়ার্ড ব্লকে তাঁর যে পদ, তা ছাড়াও তিনি উনাও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, যুক্তপ্রদেশের বিধানসভার সদস্য, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতির সদস্য এবং অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্য, যুক্তপ্রদেশ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির যুদ্ধ-কাউন্সিলের সদস্য। অত বড় একজন নেতার গ্রেপ্তার যথেষ্ট অর্থপূর্ণ।

ফরওয়ার্ড ব্লকের সারা ভারত কার্যকরী কমিটির গৃহীত অন্য প্রস্তাবগুলি পড়লে দেখা যায়, আমরা এখন দু' পক্ষেরই গুলিগোলার মুখে। একদিকে সরকারি দমন, আরেকদিকে কংগ্রেসের অপ্রশমিত শত্রুতাচরণ। এই মুহূর্তে প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টিই আমাদের পক্ষে বেশি পীড়াদায়ক হয়েছে। কিন্তু ওই দুই আক্রমণ সত্ত্বেও আমরা বেঁচে থাকব।

বঙ্গের রাজনৈতিক বন্দিগণ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তা অত্যন্ত সময়োপযোগী। এই সিদ্ধান্ত পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে যে, রাজনৈতিক বন্দি বিষয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের আবেদন ফরওয়ার্ড ব্লক সম্পূর্ণ সমর্থন করেছে। এমন অনুমানের আর উপায় নেই যে এই আবেদনের গুরুত্ব হ্রাস পেতেও পারে। পৃথক বিষয় হিসেবেই হোক, কী সারা ভারতের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই হোক, বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি রাজনৈতিক বন্দিদের হয়ে লড়াই চালিয়ে যাবে এবং ফরওয়ার্ড ব্লক সর্বান্তঃকরণে, সম্পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি সহযোগে প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে থাকবে।

মুসলমানগণের বিবিধ বিষয় সম্পর্কে যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তাতে আরও মনোযোগ ও দৃষ্টি প্রদান প্রয়োজন— বিশেষত মুসলমান ব্যক্তিবর্গের। তাঁরাই হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে পরিষ্কার সমাধানের উপায় বলতে পারতেন। মজলিস-ই-আহরার সম্পর্কে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। কারণ, দুর্ভাগ্যের বিষয়, আহরারগণ তাঁদের প্রাপ্য মনোযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন।

উপসংহারে বলা যায়, আগামী ২৬ জানুয়ারি ১৯৪০, স্বাধীনতা দিবসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, একথা সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তি গুরুত্ব সহকারে স্মরণে রাখছেন। আমাদের ওয়ার্কিং কমিটিও এই প্রসঙ্গ যথোপযুক্তভাবে উল্লেখ করেছে।

১৪

আবার একই

‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ পত্রিকা, ৯ ডিসেম্বর ১৯৩৯ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

চিরাচরিত ভূমিকা থেকে সাময়িকভাবে সরে আসার পরে ‘দ্য ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া’ আবার তার স্বরূপ প্রকাশ করেছে। সাময়িকভাবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ের আলোচনার সময়ে পত্রিকাটি ভারসাম্য, আত্মমর্যাদা এবং মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে থাকে। কিন্তু নিজের মূর্তিতে ফিরে এলে তার আচরণ হয় পাগলা কুকুরের মতো। একটি বিষয়ে কিন্তু ‘ভারতবন্ধু’ আগাগোড়া একইরকম থেকে গেছে, বর্তমান লেখক সম্পর্কে তার গভীর বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা। অধিকাংশ ব্রিটিশদের সঙ্গে তার প্রভেদ এই যে, রাজনীতিতে অকপটতা তার সহ্য হয় না, যারা পায়ে লুটিয়ে পড়ে তাদেরকেই পছন্দ করে।

আমাদের এইটুকুই আশা, ‘দ্য ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া’ ভারতে যেসব ব্রিটিশ বাস করছেন, তাদের মনোভাব প্রতিফলিত করছে না, তাঁরা সরকারিই হন আর বেসরকারিই হন। তা যদি হত, তাঁদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা নিচু হতে বাধ্য। কল্পনা করা কঠিন যে তাঁরা এত খামখেয়ালি হতে পারেন, এমন অসংগতিপূর্ণ হতে পারে তাঁদের আচরণ, এমন ক্ষণে ক্ষণে বদলে যেতে পারে তাঁদের রাজনৈতিক মত। মাসের পর মাস আমাদের ‘বন্ধু’ ভারত সম্পর্কে প্রগতিবাদী, উদারপন্থী নীতির পক্ষে বলে এসেছেন। কিন্তু অক্টোবর মাসে ভাইসরয়ের বিবৃতির ঠিক আগে পত্রিকাটি প্রাচীনপন্থী রূপ ধারণ করল। তারপর থেকে তারা আজ যা বলছে কাল বলছে তার উল্টো কথা।

বৈদেশিক বিষয়ে যুদ্ধের আগে পর্যন্ত ‘ভারতবন্ধু’ রীতিমতো ওয়াকিবহাল ছিল। যদিও বৈদেশিক বিষয়ে তার নীতি সব মহলের হয়তো পছন্দ না হয়ে থাকতে পারে। অতীতে পত্রিকাটি ছিল হাড়ে হাড়ে সোভিয়েত-বিরোধী। কিন্তু নাৎসিরা ক্ষমতায় আসার পর থেকে তার রাশিয়া-বিরোধিতার ধার কমেছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি একটা নরম মনোভাব ধীরে ধীরে চোখে পড়তে আরম্ভ করে এবং পত্রিকার রোষ গিয়ে পড়ে নাৎসি জার্মানির ওপর। এই প্রবণতা বজায় থাকে পূর্ব ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া এবং পূর্ব পোল্যান্ড সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরেও। কিন্তু ফিনল্যান্ডের সঙ্গে সোভিয়েতের লড়াই বাধবার পর আমাদের ‘বন্ধু’-র মাথা খারাপ হয়ে গেছে এবং তার সব লেখা পাগলের প্রলাপের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে, দায়িত্বশীল এবং বুদ্ধিসম্পন্ন সাংবাদিকতা নয়। সম্ভবত এই মস্তিষ্কবিকৃতির ফলেই পত্রিকাটি দায়িত্বজ্ঞানহীন সাংবাদিকতার পথ ধরেছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের সারা ভারত কর্মসমিতি যখন কলকাতায় ২৪ নভেম্বর থেকে তাদের বৈঠক করছিল, সমস্ত সংবাদপত্রে তাদের প্রস্তাবগুলি প্রকাশ করে এবং আমাদের মুখপত্র ‘ফরওয়ার্ড ব্লক’-এর সম্পাদকীয়ও পুনর্মুদ্রিত করে, কিন্তু ‘দ্য ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া’ তা করেনি। তা ৪ ডিসেম্বর সম্পাদকীয়তে ‘আপনাদের সতর্ক করে দেওয়া হল’ এই শিরোনামে পত্রিকাটি একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ সম্পাদকীয়তে ওই বিষয়ে মন্তব্য করে।

‘দ্য ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া’-র যে আমাদের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা আছে, ভারতে কে না জানে? আর এই স্নেহ আরও গাঢ় হয়েছে যখন তাকে আদালতে হাজির হয়ে জবাবদিহি করতে

হয়েছিল তারপর থেকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাংবাদিকতায় সততা বলে কিছু কি থাকতে নেই? অতীতে যেসব জাতীয়তাবাদী ভারতীয়কে অভিযুক্ত করা হত, বলা হত তাঁরা বামপন্থী কিংবা রাশিয়ার চর, যখন তখন যে জুজুর ভয় দেখানো হত সেটি হল কমিউনিজম। জনসাধারণের চোখের সামনে ঝুলিয়ে রাখা হত ভারতে রাশিয়ার লোহিত প্রভাব ছড়িয়ে দেওয়ার ছবি। কিছুদিন পরে মস্কোর স্থান অধিকার করল রোম-বার্লিন-টোকিয়ো অক্ষ। কিছুকালের জন্য রাশিয়া জাতে উঠল। আর এই জাতে ওঠার কারণ জেনেভার সঙ্গে রাশিয়ার সুসম্পর্ক, না স্টালিনবাদ-কর্তৃক ট্রটস্কিকে অস্বীকার করা, নাকি বার্লিনের প্রতি বিতৃষ্ণার অগ্রাধিকার, কে জানে। তবে, বার্লিনের নাক কাটবার জন্যে আমাদের 'বন্ধু'র মস্কোর সঙ্গে মাখামাখি দেখে আমোদই হয়েছিল। কোনও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর পক্ষে মস্কোর 'বন্ধু' তকমাটি আর তেমন ভয়প্রদ নয়। নাৎসিদের প্রতি কিংবা রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষের প্রতি কোনও সহানুভূতি মনে হয়েছিল আসলে বিপদের কারণ। আমাদের 'বন্ধু'র দৃষ্টিতে ভারতে রুশ প্রভাব বন্ধ হয়ে গেল এবং এখন থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মন বিষিয়ে দিতে লাগল অক্ষশক্তিদের প্রভাব। বর্তমান লেখকের বই 'দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল ১৯২০-১৯৩৪' থেকে প্রসঙ্গ বিচ্যুত কয়েকটি বাক্য খুব কাজে লাগল, এবং পরপর কয়েকটি নিন্দামূলক প্রবন্ধ 'দ্য স্টেটসম্যান'-এ বেরোল। এই নিন্দার ঝড় মনে করিয়ে দিল, আট বছর আগে ১৮১৮ সালের Regulation III-এর বলে এই লেখককে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করার আগে তাঁর বিরুদ্ধে এই বিষয়েই একটি আক্রমণ চালানো হয়েছিল।

স্বল্পকাল বিরতির পর আক্রমণ আবার শুরু হল। ৪ নভেম্বর পত্রিকাটির সম্পাদকীয় তাতে অগ্রগামীর ভূমিকা নেয়। এইবার কিন্তু আমাদের 'বন্ধু'-র পক্ষে একটা অসুবিধা আছে। কী নিয়ে তাঁরা ভীতির সৃষ্টি করবেন? মস্কো, না সন্ত্রাসবাদ, না বার্লিন বিপ্লব, না অন্য কিছু? এই সমস্যার সমাধান করবার জন্য তাঁরা যে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনটি সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছেন সেটি হল, হিটলার-স্টালিন সংযোগ। এবং দেশে এঁরা যে আতঙ্ক সৃষ্টির প্রয়াস করছেন, তার প্রেক্ষাপট হিসাবে ৬ এবং ৭ ডিসেম্বরের দুটি সংখ্যায় 'ভারতে কমিউনিজম' শীর্ষক দুটি সম্পাদকীয়তে এরা যতরকম সম্ভব অলীক জুজুর সম্মিলন ঘটিয়েছেন। এই বিচিত্র সংমিশ্রণে খলনায়ক হিসাবে সকলের ওপরে, এখন আর হিটলার নন, স্টালিন।

আমাদের 'বন্ধু' বোধহয় হিসাবের একটি ভুল করেছেন। ভারতের জনসাধারণ আর কয়েক বছর আগেকার মতো অত সরলমতি নন। 'ভারতবন্ধু'-র চালাকি এবং তাদের পত্রিকার মাধ্যমে সযত্নে রচিত সরকারি প্রচারকাজের ব্যাপারটা তারা ধরতে পেরেছেন। আমরা শুধু জানতে চাই, এ কি, আমরা যাকে ক্রিকেট বলি সেই জিনিস?

ছায়া পূর্বগামিনী। এইসব সম্পাদকীয়ও তাই। আমরা বুঝতে পারছি এরপর কী আসছে। কিন্তু আমরা ঘাবড়াচ্ছি না। সবকিছুর জন্যে মূল্য দিতে হয়, স্বাধীনতার জন্যেও। স্বাধীনতার মূল্য আমাদের দিতে হবে। কিন্তু ব্রিটিশরাও যেন মনে রাখেন, ভয় দেখানো, ভ্রূকুটি, তা সে প্রচ্ছন্নই হোক আর প্রকটই হোক, ওসবে এখন আর কাজ হবে না। আজকে আমরা যে ভারতে বাস করি, সে পরিবর্তিত ভারত।

এবং যে ইউরোপ আজ আমাদের সামনে, সেও পরিবর্তিত ইউরোপ।

১৫

স্মরণ করিয়ে দিই

‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ পত্রিকা, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৯ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

স্মরণ থাকতে পারে ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্মের অল্পদিন পরেই আমরা ঘোষণা করেছিলাম, আমাদের বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করা ছাড়াও ব্লক অবিলম্বে ত্রিবিধ লক্ষ্য পূরণ করবার চেষ্টা করবে। প্রথমত বামপন্থীদের মধ্যে সংহতি-সাধন, দ্বিতীয়ত কংগ্রেসকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করানো এবং তৃতীয়ত কংগ্রেসের নামে জাতীয় সংগ্রাম পুনরায় আরম্ভ করা। পরবর্তীকালে এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি, বিশেষত গত সেপ্টেম্বরের পর, যাতে মনে হতে পারে সেই লক্ষ্যে বিশেষ পরিবর্তন দরকার। তবে অল্পস্বল্প রদবদল দরকার হতে পারে। ঘটনার চাপে বাধ্য হয়ে আমাদের আন্দোলনকে অধিকতর গতিশক্তি দান করতে হয়েছে। সেই কারণে, কবে আমরা কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠকে আমাদের মতে নিয়ে আসতে পারব এবং কংগ্রেসের নামে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারব, তার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে পারি না। একদিকে দ্রুত কাজ করতেই হবে, আরেকদিকে কংগ্রেসের গরিষ্ঠ সংখ্যককে যে আমাদের দিকে নিয়ে আসব, সে কাজও কঠিন হয়ে পড়েছে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থীদের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে এবং নানারকম গঠনতান্ত্রিক উপায়ের সাহায্যে ও দল পরিচালন-সংক্রান্ত পদক্ষেপের ফলে। কংগ্রেসকে আমাদের মতে দীক্ষিত করবার চেষ্টা অবশ্যই চলবে, কংগ্রেস যাতে সামনে এগিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আন্দোলন আরম্ভ করে, তার চেষ্টাও চলবে। কিন্তু সেসব চেষ্টা যদি এখনই ফলবতী না হয়, তা হলে কী হবে? সময় কারও জন্য অপেক্ষা করে না এবং পৃথিবী আজ এগিয়ে চলছে দুর্বার গতিতে। বর্তমান সংকটের মুহূর্তে ফরওয়ার্ড ব্লককে সামনে এগিয়ে যাওয়ার আন্দোলন আরম্ভ করবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে এবং যদি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এগিয়ে যেতে না চায়, নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে চায়, ফরওয়ার্ড ব্লককে সচল হয়ে কাজ করতে হবে। কবে আমরা কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠ হব, কবে কংগ্রেসকে দিয়ে সামনে এগোনোর নীতি গ্রহণ করাতে পারব, তার জন্যে আমরা বসে থাকতে পারি না। ইতিহাসে এমন হয়ে থাকে যে, যারা পুরোগামী তাদের অন্যদের আগেই কাজ করতে হয়। তার জন্য বাকিদের থেকে একরকম সাময়িক বিচ্ছিন্নতা ঘটে। চরম সংকটের কালে দুর্বারভাবে সংকট নিরসন করতে হয়।

এই নীতির বিরুদ্ধে দুটি যুক্তি দেখানো হবে। যারা শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে পুঁথিগত ধ্যানধারণা পোষণ করেন, তাঁরা বলবেন, বামপন্থীরা, কিংবা পুরোগামীরা যদি এরকম কাজ করেন, তাতে শৃঙ্খলা ভঙ্গ হবে এবং সাংগঠনিক ঐক্য বিনষ্ট হবে। যাঁরা তথাকথিত বাস্তববাদী, তাঁরা বলবেন, পুরোগামীরা এরকম করলে নিজেদেরকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন করে ফেলবেন এবং শক্তিহীন হয়ে যাবেন, যখন তাঁদের উচিত দক্ষিণপন্থী নেতৃবর্গকেই সাধারণ কর্মীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা।

প্রথম যুক্তির জবাবে আমাদের বক্তব্য, ঐক্য এবং শৃঙ্খলা শেষ লক্ষ্য নয়, উপায় মাত্র। ওই দুটির মূল্য আছে এই কারণে যে, কাজের জন্যে, সংগ্রামের জন্যে ঐক্য ও শৃঙ্খলা শক্তি জোগায়। তার বদলে যদি আমাদের নিষ্ক্রিয় করে দেয়, তা হলে ঐক্য ও শৃঙ্খলার কোনও

মূল্য নেই। দ্বিতীয় যুক্তির উত্তরে আমাদের বক্তব্য পুরোগামীরা যদি এগিয়ে চলার নীতি গ্রহণ করেন, সাধারণ কর্মীদের থেকে তাঁরা যে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারেন, তার একটা সম্ভাবনা আছে ঠিকই, তা এরকমও হতে পারে যে, সংকটের কালে রাজনৈতিক হ্যামলেটদের প্রভাবে সক্রিয়তা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বামপন্থীদের দিক থেকে নির্ভীক পদক্ষেপ সেই সচল অবস্থার অবসান করতে পারে। আগ্রহী সাধারণ কর্মীদের কর্মের স্রোতের মধ্যে নিয়ে আসতে পারে এবং তার ফলে দক্ষিণপন্থী নেতৃবর্গকে তাঁদের আগেকার অনুগামীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে। অবিরত প্রচার এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় সংগ্রামের দ্বারাই শুধু দক্ষিণপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব, এ ধারণা ভুল। আবার এ ধারণাও ভ্রান্ত যে, আগে আমাদের দক্ষিণপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করে তারপরে বামপন্থীদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করব যে তাঁরা দেশব্যাপী আন্দোলন করবেন। আমাদের কখনওই ভোলা উচিত নয়, কোনও কোনও পরিস্থিতিতে দক্ষিণপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করার শ্রেষ্ঠ উপায় বামপন্থীদের অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে পড়া, এবং একটি গতিশীল নীতি গ্রহণ করা। এ এক ধরনের অতি-সাহসিকতা হতে পারে কিন্তু দুঃসাহসিকতাই যে হবে তার কোনও মানে নেই।

কিন্তু ওরকম সাহসিকতার কাজের ফলে বামপন্থীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন কিনা, আমরা কী করে বিচার করব? ওরকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। এ একটা রাজনৈতিক সহজাত বোধের প্রশ্ন।

আজ আমরা চিন্তাভাবনা করতে পারি, ১৯১৭ সালে লেনিনের অগ্রগমন যদি বিফল হত, তা হলে কী হত? কিংবা আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি, ১৯১৬ সালের আইরিশ আন্দোলন যদি তাদের হঠকারিতার ফলে রেডমনডাইট পার্টির কবর খোঁড়ার বদলে তাদের নিজেদেরই রাজনৈতিক মৃত্যু ডেকে আনত?

তারপর মহাত্মা গান্ধীর ১৯১৯ সালের সত্যাগ্রহের কথা ভাবা যায়, যেটা শুধু যে ব্যর্থ হয়েছিল তাই নয়, দেশকে জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মান্তিক ঘটনার মধ্যে এনে ফেলেছিল। আর হিটলারের ১৯২৩ সালে মিউনিখে আকস্মিক অভ্যুত্থান? তা সারা পৃথিবীতেই উপহাসাস্পদ হয়ে পড়েছিল, এমনকী জার্মানিতেও।

মস্কো, ডাবলিন, দিল্লি এবং মিউনিখের এইসব নানা ধরনের ঘটনার মধ্যে কোনও সাদৃশ্য নেই, শুধু এইটুকু ছাড়া যে এর সব ক'টি থেকেই শিক্ষা একই পাওয়া যায়। এটি হৃতশক্তি, অবসন্ন নেতৃত্বকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবার কোনও প্রশস্ত, বাঁধানো, রাজকীয় সড়ক নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরোগামীদের সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ তার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এবং ক্লান্ত নেতৃত্বকে বিচ্ছিন্ন করে না ফেললে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হয় না।

সদ্যোজাত ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষে ৯ জুলাই ছিল এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। তার কর্মজীবনের প্রারম্ভেই অত বড় একটা বাধা যখন সামনে এসে দাঁড়াল, অনেকেই মনে করলেন তার মৃত্যুর বেশি দেরি নেই। কিন্তু আমরা আশাবাদী ছিলাম, কারণ জনগণের নাড়ি আমরা অনুভব করতে পেরেছিলাম। আমাদের অনুমান যথার্থ বলে প্রমাণিত হল। সেই পরীক্ষা ফরওয়ার্ড ব্লক উত্তীর্ণ হল, অধিকতর শক্তি ও মর্যাদা লাভ করল, তারপরে আমাদের সদস্যদের যে নির্যাতন, তাতে অগ্রগতি আরও দ্রুত হল। ব্লক স্থায়ীত্ব লাভ করেছে, ভারতীয় জনগণের জীবনে সে এখন আর উপেক্ষার বস্তু নয়। এমনকী 'ভারতবন্ধু'-ও তাকে উপেক্ষা করতে পারবে না।

আমরা প্রথমেই বলেছি, ফরওয়ার্ড ব্লক এক ঐতিহাসিক এবং দ্বান্দ্বিক অপরিহার্যতা থেকে উদ্ভূত। সে বিষয়ে কোনও ভুল নেই। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লককে নীতিতে এবং কর্মে অগ্রমুখী হতে হবে, তা হলেই সে ভবিষ্যতেও নিজের অস্তিত্বকে সংগত বলে প্রমাণ করতে পারবে। এবং ফরওয়ার্ড ব্লক যদি অগ্রগামীই থাকে, তার নিজের এবং দেশের সবকিছুই ঠিক থাকবে।

১৬

সঠিক নীতি

‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ পত্রিকা, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৩৯ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

জীবনে, বিশেষ করে রাজনীতিতে অনিশ্চয়তার মনোভাবের মতো ক্ষতিকর কিছু নেই। ক্ষতি আরও বেশি হয়, যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতা, অন্য ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে। গত সেপ্টেম্বরের পর থেকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মনোভাব বিবেচনা করা যাক। যুদ্ধ-সংক্রান্ত নীতির বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর মনোভাব প্রথমে যা ছিল সেটা বুঝতে কোনও অসুবিধা ছিল না, যদিও দেশের জনমতের সঙ্গে তার মিল ছিল না। তিনি বলেছিলেন, যুদ্ধের প্রশ্নে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আমাদের পুরোপুরি সহযোগিতা করা উচিত। কিন্তু তা ছিল কংগ্রেসের পুনঃপুন গৃহীত যে প্রস্তাব বিশেষ করে ১৯৩৮-এর হরিপুরা কংগ্রেসে, তার সম্পূর্ণ বিপরীত। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সর্বদাই মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের অনুসরণ করে, তার অন্যথা হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে তা করেনি। বরং তাঁরা একটি সুদীর্ঘ অতি সুরচিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন, যেটি পড়ে সাধারণ লোকের ধারণা হয়েছিল কংগ্রেস সংগ্রামের পথ ধরেছে। কিন্তু আসলে প্রস্তাবটি একটি ছদ্ম আবরণে কংগ্রেসের প্রকৃত মনোভাবকে ঢাকা দিয়ে রেখেছিল। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কংগ্রেস কোনও সিদ্ধান্তেই আসতে পারেনি। একটির পর একটি অধিবেশনে কংগ্রেস চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ মুলতুবি রেখেছে। প্রথমবার সেপ্টেম্বরে তাঁরা যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখেন, তখন তাঁরা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছ থেকে যুদ্ধে তাঁদের কী লক্ষ্য এবং ভারতের বিষয়ে তাদের কী নীতি, সেটা জানতে চাইলেন। কিন্তু ভাইসরয়ের জবাব যাকে বলা যায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির গালে একটি চপেটাঘাত, তার পরে আর দীর্ঘসূত্রতার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ থাকে না।

গান্ধীবাদীদের দল মাদ্রাজের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভাইসরয়ের ঘোষণায় তাঁদের গভীর হতাশা ব্যক্ত করলেন। অর্থাৎ তাঁরা প্রথমেই আশাবাদী ছিলেন, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না, সরকারের কাছে অন্য কিছু কী করে আশা করলেন। আমাদের দিক থেকে আমরা সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, কী আসছে। কাজেই আমরা বিস্মিতও হইনি, হতাশও হইনি, যখন ব্রিটিশ সরকারের উত্তর জানা গেল।

এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে জর্জরিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ত্বরিতে সিদ্ধান্ত নিল প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে নির্দেশ দেবে, তখনকার আবহাওয়ায় ওই সিদ্ধান্ত খানিক দূর পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু আমরা যাকে সঠিক রণকৌশল মনে করেছিলাম, তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল না। দায়িত্ব ঝেড়ে না ফেলে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির উচিত ছিল নিজেদের পদে বহাল থাকা এবং কংগ্রেসের কর্মসূচি বাস্তবায়িত করে যাওয়া। তাঁদের উচিত ছিল তাঁদের আইনগত দায়িত্ব পালন করা এবং পদচ্যুতির জন্যে অপেক্ষা করা। এই নীতি যদি তাঁরা অনুসরণ করতেন, শেষ মন্ত্রীসভাটি যতদিনে বরখাস্ত হত, ততদিনে জনসাধারণের আবেগ টগবগ করে ফুটতে থাকত।

তবু কংগ্রেসি মন্ত্রীসভাগুলির পদত্যাগকে আমরা স্বাগতই জানিয়েছিলাম, এই আশায় যে, এটা হবে সামনে এগিয়ে যাওয়ার নীতির প্রথম পদক্ষেপ। বাস্তব রাজনীতিতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা চলে না, হয় এগোতে হয়, নয় পিছোতে হয়। অতএব আমরা আশা করেছিলাম, একবার মন্ত্রীসভাগুলি পথ থেকে সরে দাঁড়ালে, নীচের দিক থেকে যে চাপ আসবে তাতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বাধ্য হবে নির্ভীক এবং গতিশীল নীতি গ্রহণ করতে।

জনসাধারণের চাপ আছে ঠিকই, কিন্তু মহাত্মার নেতৃত্বে কমিটি, আমাদের পূর্বতন বামপন্থী নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও যার মধ্যে আছেন, এখন পর্যন্ত সে-চাপ প্রতিরোধ করতে পেরেছেন। কমিটির নিজস্ব স্বত্ত্বা কিছু নেই, মহাত্মা গান্ধীর তাঁরা ছায়ামাত্র। যাঁর হাতে ক্ষমতা সমর্পণ করে তাঁরা পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী এখন আর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একচ্ছত্র অধিনায়ক নন, তিনি শুধুমাত্র সেই মহৎ প্রতিষ্ঠানের দক্ষিণপন্থীদের এবং কতিপয় পূর্বতন বামপন্থীরই অধিনায়ক, কারণ বামপন্থী গোষ্ঠী কখনওই অন্ধভাবে তাঁর আদেশ প্রতিপালন করবে না।

এতদিন পর্যন্ত কীভাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি জনগণের চাপ প্রতিহত করে এসেছে, সে কাহিনি কৌতূহলোদ্দীপক, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম স্থগিত রেখে ওয়ার্কিং কমিটি নির্মম এবং নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে বামপন্থীদের, বিশেষ করে ফরওয়ার্ড ব্লকের বিরুদ্ধে। তাতে এই একটা উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে যে, সামনে আমাদের কর্তব্যের যে পথ, তা থেকে মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া গেছে। জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করবার জন্য এবং সেইভাবে সংগ্রামের পথ থেকে ভয় দেখিয়ে তাঁদেরকে সরিয়ে আনবার জন্য বিভিন্ন সময়ে অলীক ভীতির সৃষ্টি করা হয়েছে। যুদ্ধের আগে আমাদের বলা হত, সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, কেননা কংগ্রেসের ভিতরে দুর্নীতি আছে এবং অগ্রগমনের কাজ আরম্ভ করলে তার ফলে হিংসা আরম্ভ হবে। গত সেপ্টেম্বরের পরে ওঁদের মাথায় নতুন ভাবনা থেকে গেছে এবং এখন ওঁরা বলছেন, কংগ্রেস যদি সত্যাগ্রহ শুরু করে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধতে বাধ্য। এগিয়ে চলার নীতি থেকে বিরত থাকার জন্যে আর কী কী অজুহাত উদ্ভাবন করা হয়, আমরা তারই অপেক্ষায় আছি। কংগ্রেস নেতৃত্বের উচ্চস্তরের যে বেদনাদায়ক অবস্থা তার প্রধান কারণ মন্ত্রীত্ব গ্রহণ-জনিত নৈতিক বলের হানি। এটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। কে ভেবেছিল, যাঁরা বছরের পর বছর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন, কারাবাসের কষ্ট স্বীকার করেছেন, তাঁরা পর্যন্ত আমাদের ইতিহাসের এই ঘোর সংকটের সময়ে আমাদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হবেন?

একদিকে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে এই আক্রমণ যেমন তাঁরা চালিয়েছেন এবং পূর্বে উল্লিখিত নানা অলীক ভীতির উদ্ভাবন করেছেন, তেমনি আরেকদিকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাঁদের

বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের দিকটা ঠিক রাখতে চেষ্টার কোনও কসুর করেননি; বামপন্থীদের বুলি সমানে আউড়ে গেছেন, একটা আশা জাগিয়ে রেখেছেন, যে শীঘ্রই কংগ্রেস আগে চলতে আরম্ভ করবে। যেসব খবর আমরা বিভিন্ন প্রদেশ থেকে, বিশেষ করে প্রাক্তন মন্ত্রীদের মহল থেকে পাচ্ছি, তাতে সে আশা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হচ্ছে। সবদিক থেকে কানাঘুঁষো শোনা যাচ্ছে যে, কংগ্রেসি মন্ত্রীসভাগুলি আবার ফিরে আসবে এবং সেই উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা চলছে। এ অভিযোগ অতিশয় অপ্রিয় কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা করতে বাধ্য হচ্ছি, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও মহাত্মা গান্ধী আজকের দিনে দেশের বিপ্লবী ও প্রগতিপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছেন।

দেশের দক্ষিণ এবং বামপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ ও অস্বাচ্ছ্যন্দকর সম্পর্ক ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা আমাদের নেতাদের উচ্চতর স্তরকে গ্রাস করেছে, স্বাধীনতা থেকে যে ক্ষমতা, সে-ক্ষমতার জন্য নয় যে-ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোস করলে লাভ করা যায়, তার জন্য, তার ফলে দক্ষিণপন্থীরা সুযোগ পেলে আপোস করতে দ্বিধা করবেন না, কিন্তু বামপন্থীদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার কথা চিন্তা করবেন না, যদিও একটি জাতীয় সংকট দাবি করছে ঐক্য। ক্ষমতার রাজনীতি তার নিকৃষ্টতম রূপ ধারণ করেছে। এ বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই যে দলীয় সংঘর্ষের আড়ালে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে আসলে সারাক্ষণ যা চলছে, সেটা হল নিরন্তর শ্রেণি-সংঘর্ষ।

সর্বশেষ যে চমকটি উদ্ভাবন করা হয়েছে সংঘর্ষ পাশে ঠেলে রাখার জন্য এবং কালক্রমে যেটি দেখা যাবে, ভারতীয়দের প্রতি তাদের নিজেদের নেতৃবর্গের সর্ববৃহৎ প্রবঞ্চনা, একটি সংবিধান-পরিষদ (Constituent Assembly) গঠন। ইতিহাস এবং রাজনীতি নিয়ে আমরা কিছু গুরুতর অধ্যয়ন করেছি এবং আমাদের মতে, সংবিধান পরিষদ, যদি কথাটির অপপ্রয়োগ না করা হয়, গঠিত হতে পারে একমাত্র ক্ষমতা হস্তগত করার পরে। যেমন, কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ সরকার যদি ভারতের সমস্যা নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, কংগ্রেসকে আগে জয়লাভ করতে হবে এবং ক্ষমতা হাতে নেওয়ার জন্য একটি সাময়িক সরকার গঠন করতে হবে। একমাত্র সেইরকম সাময়িক জাতীয় সরকারই একটি সংবিধান পরিষদ আহ্বান করতে পারে। ভারতের জন্য বিস্তারিত সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে, যে পরিষদ গঠনের প্রস্তাব এখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি করছেন সেটি একটি 'মহিমামণ্ডিত' সর্বদল সম্মেলন হতে পারে। কিন্তু সংবিধান পরিষদ সেটি অবশ্যই নয়। এটির অধিবেশন বসলে তার নিয়তি হবে 'আইরিশ কনভেনশন'-এর মতো, মি. লয়েড জর্জ যার সৃষ্টিকর্তা ছিলেন। ভারতীয় জনসাধারণের কোনওরকম সম্পর্কই রাখা উচিত নয় ওইরকম একটি পরিষদের সঙ্গে, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আমাদের মূল কর্তব্য থেকে আমাদের পথভ্রষ্ট করা, ১৯৩২ এবং ১৯৩৩ সালে হরিজন আন্দোলন যা করেছিল।

আমাদের রাস্তা পরিষ্কার। এখন আমরা আমাদের আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। সমস্ত আপোসহীন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীদেরকে এখন আমাদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। এখন শুধু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে দিয়ে জোর করে তাদের কাজ করানোই আমাদের সমস্যা নয়। সে-কাজ আমাদের করতে হবে, কিন্তু তাতে যদিও আমরা কৃতকার্য হই এবং মহাত্মা গান্ধী আমাদের হাল ধরে থাকেন, আরেকটি চৌরি চৌরা, কিংবা আরেকটি হরিজন আন্দোলন কিংবা আরেকটি গান্ধী-আরউইন চুক্তির বিপদ সবসময়ে থাকবে। আগে থেকে আমাদের সেই বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, যাতে সময় উপস্থিত

হলে আমরা তার মোকাবিলা করতে সক্ষম হই।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি চিরতরে জাতির নেতা হয়ে থাকত, তাতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু নেতাকে নেতৃত্ব দান করতে হবে। এখন আমরা আশা ছাড়িনি যে, কমিটি অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করবে। কিন্তু তা যদি তাঁরা না করেন, আমাদের কাজে নামতে হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জনগণ অনুসরণ করবে, যিনিই কেননা নেতৃত্ব দান করুন।

সাম্রাজ্যবাদের অবসানের পর আমাদের আন্দোলনের সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ের আরম্ভ হবে। ক্ষমতা যাঁরা জয় করে নেবেন, তাঁদেরকে হাতে নিতে হবে সংগ্রামোত্তর পুনর্গঠনের দায়িত্ব।

১৭

নেতাগণ পথভ্রান্ত করছেন

'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকা, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৩৯ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ

সাধারণ সরলমতি মানুষ, যারা রাজনৈতিক মনোভাবসম্পন্ন নয়, সাধারণত মনে করে, যে দেশনায়ক অনেকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, তিনি শেষ পর্যন্ত জিতেই চলবেন। তাদের কদাচিৎ মনে থাকে, অস্টারলিটজের জয় ওয়াটারলুর বিপর্যয় নিয়ে শেষ হতে পারে। সেরকম বিপর্যয় ঘটলে তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। দেবতা বলে যাকে পূজা করেছি, তার কাঠ-খড়ের মূর্তিটি প্রকট হয়ে পড়লে যথার্থই কষ্ট পেতে হয়। সত্য উদ্ঘাটিত হলে লোকে ক্রোধে ও হতাশায় ফুঁসে ওঠে। আগে যাকে দেবতা বলে পূজা করত তাঁকে ধিক্কার জানায়। এইভাবে স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, একদা যাঁকে বলা হত সারেন্ডার-নট ব্যানার্জি, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের যিনি একজন জনক ছিলেন, তাকে তাঁর স্বদেশবাসী যাঁরা একদা তাঁর পূজা করত, তাঁকে অস্বীকার করেছিল।

এ থেকে এরকম সিদ্ধান্তে আসা অন্যায় এবং অসংগত হবে যে, সাধারণ মানুষ অকৃতজ্ঞ এবং তাদের স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ। এর একটাই অর্থ, কোনও নেতার অতীতের দেশহিতের কাজের জন্য দেশ কৃতজ্ঞ বোধ করে ঠিকই, তার জন্যে দেশ তাঁকে ভালও বাসে কিন্তু তাঁকে দেশ ততদিনই অনুসরণ করবে যতদিন তিনি সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবেন, দেশবাসীর আগে আগে যাবেন। অতীতের দুঃখকষ্ট ও ত্যাগ কখনওই কোনও অবস্থায়, ভবিষ্যতের নেতৃত্বের অধিকার দান করে না।

একটি জীবন্ত ও প্রগতিশীল জাতিতে প্রবীণ এবং নবীনের মধ্যে সর্বদাই একটা যোগসূত্র থাকে। প্রবীণের প্রজ্ঞা এবং অভিজ্ঞতা পরবর্তী প্রজন্মের কাজে লাগে, তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। অপরপক্ষে, যাঁরা নবীন, এবং স্বভাবতই বিপ্লবধর্মী এবং প্রগতিশীল, তাঁরা পক্ককেশ

প্রবীণের কাছে পরামর্শ ও পথনির্দেশ চান, কিন্তু নিজেদের গতিশীলতা বিসর্জন দিতে চান না। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লর্ড বল্ডউইন তাঁর খ্যাতি ও ক্ষমতার শীর্ষে যখন ছিলেন তখনই পদত্যাগ করেছিলেন এবং তারপর থেকে অপেক্ষাকৃত নিরালায় জীবনযাপন করছেন। এখন আর তিনি প্রতিবন্ধক নন, কিন্তু বয়োবৃদ্ধ রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে প্রভূত প্রতিপত্তির অধিকারী, সিংহাসনের পিছনে এক শক্তিধর পুরুষ বলে তাঁকে মনে করা যায়।

যে-জাতিকে ক্রীতদাস করে রাখা হয় কিংবা দাসত্বের মনোভাব যে-জাতিকে গ্রাস করে, তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয় অন্যরকম। নেতারা একবার পাদপীঠে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর স্বেচ্ছায় আর সেখান থেকে নেমে দাঁড়াতে চান না। তাঁদেরকে তখন টেনে নামাতে হয় যেমন স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে হয়েছিল। সে কাজটি বেদনাদায়ক অবশ্যই। সেরকম দেশে মানুষ বীরপূজার দিকে ঝোঁকে এবং অন্য জায়গার চেয়ে সেখানে তাদের মোহমুক্তি ঘটতে সময় বেশি লাগে। কিন্তু সে দুর্দিন অনন্তকাল ঠেকিয়ে রাখা যায় না। কাল পূর্ণ হলে নগ্ন সত্য প্রকট হয়ে পড়ে।

বর্তমান ক্ষেত্রে একটি কৃতজ্ঞচিত্ত আবেগপ্রবণ জাতি, যে তার নেতাদের প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখে এসেছে এবং যাদের নেতারা দু' দশক ধরে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত, অনেক সংগ্রাম করেছেন (কম-বেশি সাফল্য সহকারে), জীবনের যাত্রাপথে অনেক ঝড়-ঝাপটার সম্মুখীন হয়েছেন, তাঁরা যে চরম পরীক্ষার মুহূর্তে দেশকে নেতৃত্ব দানে ব্যর্থ হবেন, এমন কথা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু এছাড়া আর কিছু কি আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি? গত বছর থেকে বারংবার সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও এই আসন্ন ঘটনাবলীর জন্য প্রস্তুত হতে তাঁরা বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি। তার বদলে তাঁরা আমাদের বিদ্রূপ করেছেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসে জাতির স্বার্থের প্রতি যত্নশীল হওয়ার বদলে আমাদের ওপর প্রতিহিংসা কী করে চরিতার্থ করা যায়, নিজেদের হৃত মর্যাদা কী করে পুনরুদ্ধার করা যায়, তাই নিয়েই তাঁরা বেশি চিন্তিত ছিলেন। তাঁদের কল্যাণে দেখা গেল পৃথিবীতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই একমাত্র বড় রাজনৈতিক দল যাঁরা ঘনায়মান আন্তর্জাতিক সংকটের জন্য প্রস্তুত হওয়া থেকে ইচ্ছে করে বিরত থাকল।

এ তো কেবল শুরু। সেপ্টেম্বর মাসে যখন যুদ্ধ সত্যি সত্যি শুরু হল, তখন তাঁরা কী করলেন? ১৯৩৮-এর হরিপুরা কংগ্রেস এবং ১৯৩৯-এর ত্রিপুরী কংগ্রেসের অসুবিধাজনক প্রস্তাবগুলি নিঃশব্দে এবং বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁরা মুলতুবি করে দিলেন। আমাদের বলা হল কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কার্যকারিণী চিন্তা-ভাবনা আরম্ভ করেছে। কিন্তু চিন্তা-ভাবনার কী ছিল? ১৯২৭ থেকে যুদ্ধকালীন সংকট নিয়ে কংগ্রেস চিন্তাভাবনা করে আসছে এবং একের পর এক প্রস্তাবে তার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছে। নতুন করে ভাবার কিছু ছিল না, বাকি ছিল শুধু প্রস্তাবগুলি কার্যকর করা, যেসব প্রস্তাব ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে একাধিকবার। আসল প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়ার সবরকমের কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল।

সামনে এগোনোর নীতি গ্রহণ করার বিরুদ্ধে দুটি অতি পরিচিত যুক্তির সঙ্গে সেপ্টেম্বরের পর আরেকটি যুক্তি যোগ করা হয়েছে যে, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ফলে শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা আরম্ভ হবে। এটা ছল এবং শঠতা ছাড়া আর কিছু নয়। মজলিস-ই-আহরার যে সেপ্টেম্বর মাসে পঞ্জাবে তাদের আন্দোলন আরম্ভ করল, তার পরে কী হল? তা ছাড়া অনিষ্টকারীরা যদি এখানে-ওখানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধাতে সক্ষমই হয়, তাতে কী আসে যায়? ওরকম দাঙ্গা কি ১৯২১ আর ১৯৩০ এবং ১৯৩২-এও বাধেনি। ওঁদের ওই যুক্তি যদি

সবাই মেনে নেয়, অগ্রগামী নীতি বানচাল করবার জন্যে সর্বদাই আমাদের ওই একই যুক্তিই দেখানো হবে।

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক যে ঘটনাটি সেপ্টেম্বরের পর ঘটেছে তা হল, স্বরাজের দাবি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত এবং চুপে-চাপে তার জায়গায় তথাকথিত, সংবিধান-পরিষদের দাবি তোলা। নীচের সারি থেকে জনগণের দাবি রাখবার জন্য কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব সুচতুরভাবে আসল প্রশ্নটিকে পাশ কাটিয়ে একটি মেকি প্রশ্নের অবতারণা করেছেন।

আগের সংখ্যায় আমরা সংবিধান-পরিষদের প্রস্তাব খুঁটিয়ে দেখেছি এবং দেখিয়ে দিয়েছি, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এখন যার দাবি করছে সেটা সংবিধান পরিষদ অবশ্যই নয়। একটি সাম্রাজ্যবাদী সরকারের প্রেক্ষাপটে সেরকম একটি পরিষদ গঠিত হতে পারে না। সেরকম পরিষদ আহ্বান করতে পারে একমাত্র একটি জাতীয় সরকার, তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার পর, স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভের পর। কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব জাতীয় দাবিকে ছেঁটে ছোট করে দিয়েছে, সংগ্রাম এড়াবার জন্য, কারণ ব্রিটেনে অবস্থিত তাঁদের পরামর্শদাতারা বলছেন, সে-দাবি পূরণ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

আমরা শুধু আশা এবং প্রার্থনা করতে পারি, সে-দাবি ব্রিটিশ সরকার যেন পূরণ না করে, কারণ তা হলেই কংগ্রেস বিপদে পড়ে যাবে। ওয়ার্কিং কমিটি যে স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর প্রস্তাব স্বীকার করে নিয়েছে তার ফলে প্রস্তাবিত সংবিধান পরিষদের গঠন এমন হবে যাতে সেটি সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের রণক্ষেত্রে পরিণত হবে। শেষপর্যন্ত পরিষদ বিশৃঙ্খলার মধ্যে ভেঙে যাবে এবং ভারতের শত্রুরা কংগ্রেসের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবে, এই বিষাদাত্মক পরিণতির জন্য প্রকৃতপক্ষে ওরাই দায়ী।

সেই সংবিধান পরিষদ যদি একটি সংবিধান প্রণয়নে সক্ষমও হয়, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যে-কোনও সময়েই কোনও না কোনও অজুহাত খুঁজে বার করতে পারবে, ভারতের জন্য সেই সংবিধান গ্রহণ না করার জন্য। ব্যাপারটা ওইরকমই দাঁড়াবে, যদি ইতিমধ্যে বর্তমান আন্তর্জাতিক সংকটের অবসান না হয়। আমাদের আশ্চর্য বোধ হচ্ছে, আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতারা সংবিধান রচনা করতে বসবার আগে প্রথমে সে অধিকার অর্জন করা প্রয়োজন বোধ করলেন না। জিজ্ঞাসা করি, সে অধিকার কি তাঁরা পেয়েছেন? পাননি। সেই কারণেই আমরা বলছি, একটি প্রকৃত সংবিধান-পরিষদ আহ্বান করতে পারে একমাত্র একটি জাতীয় সরকার কিংবা একটি সাময়িক জাতীয় সরকার।

একটি জিনিস আমরা বুঝতে পারছি না, আমাদের নেতারা যদি কিছু করতে না চান, বড় বড় কথা বলেন কেন? তার চেয়ে বরং তাঁরা যদি মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বই অনুসরণ করেন সেটাই বেশি সততার কাজ হবে, সে নেতৃত্ব যতই ভ্রান্ত হোক। সুদীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করা, লম্বা চওড়া কথা, বামপন্থী গন্ধ মাখানো, সফেন ভাষণ, থেকে থেকে 'যুদ্ধং দেহি' ভাব দেখানো, থেকে থেকে নতুন পৃথিবী গড়ার কথা, যার জন্য কোনও সংগ্রামের প্রয়োজন নেই যা আকাশ থেকে পড়বে— বাইরে থেকে কোনও আঘাত ছাড়াই সাম্রাজ্যবাদ নিজস্ব ধর্মে ভেঙে পড়ছে— এসবই আমরা যাকে কেরেনস্কি কৌশল বলে জানি তার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়, বাস্তব রাজনীতির সঙ্গে যার কোনও মিল নেই। অল্পদিনের মধ্যেই কংগ্রেসের মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ করল এবং কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের সরকারি মুখপত্র ঘোষণা করল, কাজের জন্য ক্ষেত্র পরিষ্কার করবার সময় এসেছে। তারপর থেকে অনেকবার সে-সময় পেরিয়ে গেল, কিছুই করা হল না। সরকারি মুখপত্র যতদিন ক্ষেত্র পরিষ্কার করছিল ততদিন 'যুদ্ধ-পরিষদ'

গড়া হল কয়েকটি প্রদেশে। আমাদের বলা হল এইসব যুদ্ধ-পরিষদ তাদের নেতাদের নিয়ে চরকা চালাতে খুব ব্যস্ত। কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের আদেশে আমাদের চরকার সুতো কাটতে হবে এবং সুতো কেটেই স্বরাজে গিয়ে পৌঁছতে হবে। এরকম একটি শক্তিশালী অস্ত্র আমাদের হাতে থাকলে সংবিধান পরিষদের কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

এখন এইসব পিছিয়ে যাওয়া, এড়িয়ে চলা, এসবের কারণ কী? কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের এবং সত্যাগ্রহের যিনি সর্বাধিনায়ক, তাঁর কী হল? যে সোজা রাস্তাটি স্বরাজে গিয়ে পৌঁছেছে, সেটিকে কী করে পরিহার করা যায়, তারই পন্থা তাঁরা আকাশ-পাতাল জুড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন কেন?

তাঁদের ভয়, যদি এবং যখন সংগ্রাম আরম্ভ হয়, নেতৃত্ব তাঁদের হাত থেকে চলে যাবে। নতুন নতুন শক্তি, নতুন নতুন উপাদানের আবির্ভাব ঘটবে এবং তাদেরই হাতে হয়তো চলে যাবে কংগ্রেসের নেতৃত্ব এবং সংগঠন। অতএব, যেমন করে হোক সংগ্রাম এড়িয়ে চলো, যতটুকু ক্ষমতা হাতে পেয়েছ ধরে রাখো এবং আরও ক্ষমতার জন্যে সরকারি বেসরকারিভাবে কথাবার্তা চালিয়ে যাও। ইতিমধ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করো বামপন্থীদের দাবিয়ে রাখতে। একদিন তোমরা হয়তো সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটা আপোসে আসতে পারবে, কিন্তু বামপন্থীদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত।

এই যে, আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে যে অসংগতি, বামপন্থীদের সঙ্গে, বিশেষ করে ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে এই শত্রুতা— যখন আমরা চরম সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, যখন নেতারা নিজেরাই বারে বারে জাতীয় ঐক্যের জন্য আবেদন জানাচ্ছেন; এর কারণ কেউ বলতে পারেন? বামপন্থীদের ওপর থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহারের যে অসংখ্য আবেদন করা হয়েছে, বিশেষ করে আর কেউ নয়, স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন আবেদন করেছেন, সরাসরি তাকে খারিজ করে দেওয়ার কারণ কেউ ব্যাখ্যা করতে পারেন? হ্যাঁ, আমরা বোধহয় পারি। একে বলে বাস্তব ব্যবহারিক রাজনীতি, যার মধ্যে আবেগ অনুভূতি, মানবিকতা, এসবের কোনও স্থান নেই। কংগ্রেসের অভ্যন্তরের এই গোষ্ঠী রাজনীতির পিছনে ক্রমাগত যা চলছে তা হল শ্রেণি সংগ্রাম এবং যেখানেই শ্রেণি সংগ্রাম, সেখানেই দয়ামায়াহীনতা, সত্য ও অহিংসার কথা যতই বলা হোক।

আমাদের দেশবাসীর এক বৃহৎ অংশ এখনও মনে করেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এবং মহাত্মা গান্ধী কর্তব্য সাধনে অপারগ হবেন না। আমরা তাঁদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলি, তাই যেন হয়। কিন্তু যে যাই বলুন, এ কি ইচ্ছাপূরণের কল্পচিন্তা নয়? আমাদের বলা হচ্ছে ওয়ার্কিং কমিটির আগামী বৈঠকে মহাত্মা একটি সমাধানসূত্র বার করবেন (বোধহয় লবণ সত্যাগ্রহের মতো একটি জাদু সূত্র) এবং মার্চ মাসে রামগড়ে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে সেই সূত্রটি হাজির করা হবে। ইতিমধ্যে রামগড় কংগ্রেসের প্রস্তুতিতে কংগ্রেসের নির্বাচনগুলি চলবে। অতএব মার্চের শেষ পর্যন্ত শীর্ষ নেতৃত্বের কর্মসূচি ঠিক হয়ে গেছে। ততদিন লোকে জোরদার চরকা চালিয়ে যাক এবং কংগ্রেসের নির্বাচন পর্বের সঙ্গে সঙ্গে যেসব বিবাদ-বিতর্ক শুরু হয়ে যায়, লোকে তাই আরম্ভ করুক। অগ্রগামী নীতির চমৎকার প্রস্তুতি।

পরিশেষে আরেকটি কথা। প্রবীণেরা যদি মনে করে থাকেন, সংগ্রাম এড়িয়ে গিয়ে তাঁরা তাঁদের এখনকার পদাধিকার বজায় রাখবেন, তাঁরা ভুল করছেন। বর্তমান সংকটে তাঁরা যদি সাহসে ভর করে এগিয়ে যেতেন তা হলে যা হত, এতে কিন্তু তাঁদের অবস্থা তার চেয়ে বেশি খারাপ হয়ে যাবে। আমাদের কথা বলতে গেলে আমাদের নিজের পথেই চলতে হবে, তাতে

যাই হোক। স্বাধীনতা জয় করে নেওয়ার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, সে-পথ কণ্টকাকীর্ণ, কিন্তু সে-পথের শেষে, ক্লান্ত তীর্থযাত্রীর জন্য অপেক্ষা করে আছে স্বাধীনতার পূর্ণ প্রস্ফুটিত গোলাপ। অতএব, এগিয়ে চলো, সর্বদা সামনের দিকে।

১৮

ভারতীয় ছাত্রদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণ

জানুয়ারি ১৯৪০, দিল্লিতে সারা ভারত ছাত্র সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ

কমরেডগণ,

কোনও সম্মেলনের সভাপতি তাঁর ভাষণ এই বলে শুরু করেন যে সম্মেলনটির অনুষ্ঠান হচ্ছে এক সংকটের সময়ে, এটা একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আজ যদি আমি সেই কথাই বলি সেটা কেবলমাত্র প্রথার অনুসরণ করার জন্য নয়। হালকা মেজাজে আপনারা যদি আমাকে ডেকে না এনে থাকেন (আমি নিশ্চিত আপনারা তা করেননি) তা হলে নিঃসন্দেহে অতি উচ্চ সম্মান আপনারা আমাকে দান করেছেন। সম্মান ছাড়াও, এই উপলক্ষে যে আস্থা এবং ভালবাসা আপনারা আমার প্রতি জ্ঞাপন করলেন সে সম্বন্ধেও আমি অতিশয় সচেতন। আপনাদের আহ্বানে সাড়া দিতেই আমি আপনাদের মধ্যে এসেছি এবং সভাপতি হিসাবে আমাকে নির্বাচিত করে সম্মানিত করার জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

নববর্ষের আগমনে আমরা একত্রিত হয়েছি, উৎকণ্ঠিত জাগ্রত প্রত্যাশায় আমাদের হৃৎস্পন্দন দ্রুততর। আজ সর্বপ্রধান প্রশ্ন, যে সংকট আজ সামনে এসেছে তার মোকাবিলা ভারতীয়েরা কীভাবে করবে? একজন গড়পরতা ছাত্র, যিনি স্বাভাবিক সময়ে তাঁর প্রতিষ্ঠানের চার দেওয়ালের বাইরে তাকান না, তিনিও তাঁর বই এবং তাঁর যেসব সমস্যা, সেসব কিছুদিনের জন্য পাশে সরিয়ে রেখে সেই সংকট এবং সে-বিষয়ে তাঁর কী কী কর্তব্য চিন্তা করতে বাধ্য হচ্ছেন। আপনারা জানেন, সেরকম কঠিন সংকটের সময়ে বিদেশে রীতি হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে সমগ্র ছাত্র সমাজকে মিলিটারির ড্রিল সার্জেন্টদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এখন আমাদের ছাত্রদের এই ভারতবর্ষে কী করতে হবে?

যুদ্ধকালীন যে-সংকট এখন আসন্ন, ১৯২৭ সালের পর থেকেই সেটা দিগন্তরেখার ওপরে দেখা যাচ্ছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বছরের পর বছর তা নিয়ে আলোচনা করেছে, তার বিবিধ সিদ্ধান্ত একের পর এক প্রস্তাবে লিপিবদ্ধ করেছে। সর্বশেষ প্রস্তাব যেটি এখন ঐতিহাসিক মূল্য পেয়েছে, হরিপুরা কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছিল ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮-এ। জনসাধারণের স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিল প্রত্যাশিত সংকট আরম্ভ হলেই হরিপুরা প্রস্তাব কার্যকর করা হবে।

তা হয়নি। গত চার মাস ধরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি চিন্তা করে চলেছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অত চিন্তাভাবনার কিছু নেই। চিন্তাভাবনা যা করবার কংগ্রেস ১৯২৭-এর পর থেকে করে রেখেছে। আরও চিন্তার দরকার থাকলে গত সেপ্টেম্বরের আগেই তা আরম্ভ এবং শেষ করা উচিত ছিল, যখন আমরা চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছিলাম এই বলে যে, আগামী ঘটনাবলীর জন্য দয়া করে প্রস্তুত হন। পৃথিবীতে যত বড় বড় রাজনৈতিক সংগঠন আছে, দেখা গেল তার মধ্যে একমাত্র কংগ্রেসই সেই সংকট মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি। এতেই কি প্রবীণদের রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানের দেউলিয়াপনা প্রকাশ পায় না?

আজকের আকাশের কালো মেঘে একটা রুপালি রেখা দেখা যাচ্ছে। কংগ্রেস যখন ভাবনাচিন্তা করছে, স্থিরভাবে ঠিক করতে পারছে না কী করবে, পঞ্জাবের মজলিস-ই-আহরার কাজ করছে। তা সত্ত্বেও এমন লোক আছেন, যাঁরা বাড়ি থেকে বেরোন না, অথচ সাধারণভাবে ভারতীয় মুসলিমদের স্বদেশ প্রেমের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে যাঁদের বাধে না।

বিগত বারোটি মাস, কিংবা তারও বেশিকাল ধরে আসন্ন সংকট সম্পর্কে আমাদের যত পরামর্শ তার সবগুলোকেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হয়েছে। আমরা যে বলেছিলাম একটা চরমপত্র দেওয়া হোক এবং আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া হোক, ১৯৩৯-এর মার্চ মাসের ত্রিপুরি কংগ্রেসে তাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে, উপহাস করা হয়েছে। আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠগণ বিভিন্ন জরুরি জাতীয় সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করার চেয়ে নিজেদের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, ত্রিপুরীতে তাঁরা সঠিকভাবে জাতীয় স্বার্থের রক্ষণাবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের কর্তব্যও করতে পারেননি, যা তাঁদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল। তাঁরা নিজেদের স্বার্থ ও ব্যক্তিগত মান-সম্মানকে জাতির স্বার্থ, জাতির মানসম্মানের ওপরে স্থান দিয়েছেন।

প্রসঙ্গক্রমে, যাঁরা ত্রিপুরীতে আমাদের উপহাস করেছেন, তাঁদের আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৩৯ সালে যে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছিল, সেটা কি কার্যত একটা চরমপত্র ছিল না? সেই চরমপত্রই যদি গত মার্চ মাসে আমরা পেশ করতাম কত ভাল হত।

গত সেপ্টেম্বরের আগে দুটি বাঁধা-ধরা যুক্তি, জাতীয় সংগ্রাম পুনরায় আরম্ভ করার আমাদের দাবি প্রতিহত করবার জন্য মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অনুগামীরা উপস্থাপিত করতেন। প্রথমত, কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে দুর্নীতি বিদ্যমান এবং দ্বিতীয়ত, সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করলে হিংসা আরম্ভ হবে। সেপ্টেম্বরের পর তাদের মাথায় একটা নতুন চিন্তা খেলে গেল। নতুন একটি যুক্তি তাঁরা যোগ করলেন, হিন্দু-মুসলিম সমস্যার আশঙ্কা। আগেও সাম্প্রদায়িক সমস্যা এসেছে, কিন্তু তাকে আমাদের লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রগমনের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসাবে কখনও খাড়া করা হয়নি। ভবিষ্যতে আবার অন্যান্য কী যুক্তি ওঁরা আবিষ্কার করেন দেখা যাক।

একথা অবশ্যই বলা যায় যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সেপ্টেম্বরের পর থেকে যে চুপ করে বসে আছে, তা নয়। লম্বা লম্বা প্রস্তাব পাশ হয়েছে এবং শুধু তাই নয়, আটটি প্রদেশে কংগ্রেসি মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করানো হয়েছে। কয়েকটি প্রদেশে যুদ্ধ-পরিষদ গঠন করা হয়েছে এবং স্বেচ্ছাসেবী শিবির ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কথা হচ্ছে। এসবই সত্য। কিন্তু একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর তিন মাসের ছুটি ভোগ করার যে কথা শোনা যাচ্ছে, সেটা কী ব্যাপার? চারদিকে

ফিসফাস চলছে কেন, কংগ্রেসি মন্ত্রীরা শীঘ্রই আবার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবেন? সাধারণ লোকে স্বাভাবিকভাবেই বিভ্রান্ত হচ্ছে, কী করবে বুঝতে পারছে না। বিভ্রান্তি যাতে আরও তীব্র হয়, যুদ্ধ-পরিষদকে বলা হয়েছে, চরকা কেটে যাও। এখন আশা করা হচ্ছে আমরা চরকায় সুতো কেটে স্বরাজে পৌঁছে যাব, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর এই স্বরাজ মন্ত্র যে খুব কার্যকর তা আমরা কী করে বিশ্বাস করব, যখন আমরা জানি, এক শতাব্দী আগে, যখন ভারতীয়েরা খাদি এবং হয়তো সুতো কাটা ছাড়া আর কিছুই জানত না, তারা বিদেশির প্রভুত্বের অধীনে চলে গিয়েছিল। না, এখন স্পষ্ট কথা বলার সময় এসেছে, আমাদের দেশবাসীকে বলবার সময় এসেছে যে, চরকায় সুতো কেটে স্বরাজ জিতে নেওয়ার ধারণা অলীক। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে চরকা কাটার স্থান আছে, কিন্তু তাকে অত বড় করে দেখার দরকার নেই যেন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেটা একটা অস্ত্র। এবং স্বাধীনতা দিবসের শপথের মধ্যে চরকা ইত্যাদির কথা ঢুকিয়ে তাকে যেন খেলো না করি।

খোলাখুলি বলতে গেলে, তালগোল পাকানো চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া, এমন পথে চলা যে-পথ অনবরত দিক পরিবর্তন করে, কোথাও আমাদের পৌঁছে দেয় না, তার চেয়ে সততার পরিচয় দেওয়া হয় যদি আমরা যুদ্ধে ব্রিটেনকে নিঃশর্ত সমর্থন করার ব্যাপারে গান্ধীর স্পষ্ট নির্দেশই অনুসরণ করি, সে-নীতি যতই ভ্রান্ত হোক।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে কর্মসূচির রূপরেখা প্রস্তুত করেছে তা থেকে স্পষ্ট বোঝা উচিত, রামগড়ে কংগ্রেসের অধিবেশন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৪০-এর মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত কোনও অগ্রগমনের কথা চিন্তা করা যাচ্ছে না। আমরা জানি, যেখানেই কোনও গুরুতর পরিস্থিতির উদয় হয়েছে, অনির্দিষ্টকালের জন্য নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়েছে। কংগ্রেসে তা হয়নি। কংগ্রেস চলছে যেন শান্তিকালীন কর্মসূচি অনুযায়ী। আর আমরা আগেই জেনে গেছি, কংগ্রেস এই এক অনন্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে যে, বামপন্থীদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ তারা চালিয়ে গেছে, যখন এইরকম পরিস্থিতিতে অন্য সব দেশ দলীয় রাজনীতি অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবি করে রেখেছে।

কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের এই অদ্ভুত আচরণের কারণ কী? তারা ফ্যাসিবাদী ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে আপোসের কথা চিন্তা করতে পারে, কিন্তু বামপন্থীদের এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের সমর্থকদের বেলায় লড়াই তাদের শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে। এর ব্যাখ্যা করার ভার আমি আপনাদেরই দিলাম। আমি শুধু কথায় কথায় এই একটা ধারণার কথা বলতে পারি যে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দক্ষিণ এবং বামপন্থীদের যে সংঘাত, সে সংঘাত আজকের ততটা নয় যতটা আগামীকালের এবং এর বাইরে দলীয় সংঘর্ষের একটা আবরণ থাকলেও, ভিতরে ভিতরে একটা শ্রেণিসংঘর্ষ, সম্ভবত একটা অবচেতন স্তরের শ্রেণি সংঘর্ষ, নিরন্তর চলছে। আমাদের শীর্ষ নেতৃত্বের ঠান্ডা মাথার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং নিষ্করুণ মনোভাবের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় অহিংসার লেশমাত্র নেই। ভারতীয় পরিস্থিতিতে ক্ষমতার রাজনীতির এ এক দৃষ্টান্ত।

সমস্যা হল, 'আমাদের যখন শীর্ষ নেতৃত্বের এবং তাদের বিচিত্র গতি নীতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তখন আমরা কী করব?' অতীতের অভিজ্ঞতা, বিশেষত ১৯৩৯-এর জানুয়ারির পরে যা হয়েছে, সেই আলোকে বিচার করলে, আমার কোনও সন্দেহ থাকে না যে, ওঁরা নিজেদের লোকেদের সম্পর্কে কী কৌশল অবলম্বন করতে হয়, সেটা খুবই ভাল জানেন। তাঁদের নিজেদের স্বরূপ এবং তাঁদের ভ্রান্ত নীতি লোকের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হতে

সহজে দেবেন না, নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন হতেও দেবেন না। তাঁদের সর্বশেষ চমক, একটি মেকি সংবিধান-পরিষদের দাবি, তার একটি উদাহরণ। অত্যন্ত কৌশলে এবং প্রায় সবার অলক্ষ্যে আমাদের পূর্ণ স্বরাজের দাবির জায়গায় তাঁরা তুলেছেন সংবিধান-পরিষদের দাবি। বোধহয় ওঁরা মনে করছেন এই মেকি সংবিধান পরিষদ তাঁদের পাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে এবং সে-বিষয়ে যদি তাঁরা সফল হন, তাঁরা সংগ্রাম এড়িয়ে যেতে পারবেন। দেখে মনে হচ্ছে, ওঁরা যেকোনও কৌশলের আশ্রয় নিতে প্রস্তুত, যদি তার দ্বারা সংকটটা স্থগিত করা যায়।

কিন্তু এভাবে তাঁরা সংঘর্ষ এড়িয়ে চলছেন কেন? এই সমগ্র খেলার পিছনে প্রকৃত সত্য কী? এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন, তবে আমার মনে হয়, তাঁদের ভয়, একবার যদি দেশ জুড়ে সংগ্রাম আরম্ভ হয়, জাতীয় আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ ও নেতৃত্ব তাঁদের হাত থেকে বেরিয়ে যাবে। সেই কারণে তাঁদের কৌশল হচ্ছে, বিভিন্ন প্রদেশে যে-ক্ষমতা তাঁরা আগেই হাতে পেয়েছেন, তা ধরে রাখা এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপোস-আলোচনা করে কেন্দ্রে খানিকটা ক্ষমতা যাতে পাওয়া যায় সেই চেষ্টা করা। সেইজন্যই এইসব গুজব, যে কংগ্রেসি মন্ত্রীসভাগুলি আবার ফিরে আসছে। সেইজন্যই বামপন্থীদের দূর করে কংগ্রেসকে 'শোধন' করার চেষ্টা, সেইজন্যই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ওপর ক্রমাগত আক্রমণ। এবং সেইজন্যই কিছুদিন থেকে চেষ্টা চলছে, আরও সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে কংগ্রেসে জনগণের প্রবেশ রোধ করার চেষ্টা, যাতে কংগ্রেস দক্ষিণপন্থীদের সংরক্ষিত এলাকায় পরিণত হয়।

ওপরে যে-আশঙ্কার কথা বলা হল সেটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়। বিগত কয়েক বৎসরে যেসব নতুন নতুন শক্তি এবং নতুন নতুন মানুষ ও আন্দোলন উঠে এসেছে তার সঙ্গে দক্ষিণপন্থীদের কোনও যোগাযোগ নেই। জিজ্ঞাসা করি, যেসব কিষাণ আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, যুব আন্দোলন এবং ওইরকম বৈপ্লবিক এবং প্রগতিবাদী আন্দোলন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চলেছে সে-সবের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র কোথায়? উপরন্তু প্রদেশের জনগণের মধ্যেও তাঁদের প্রভাব হ্রাস পেয়েছে। সেই কারণেই তাঁদের মনে এমন আশঙ্কার সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে যে, সংগ্রাম শুরু হলে আন্দোলনের ওপর তাঁদের এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে।

কিন্তু এই যুক্তির মধ্যে একটা ভ্রান্তি আছে, যেটা দক্ষিণপন্থীদের পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। এইরকম একটা আশঙ্কার কারণেই যদি তাঁরা সংগ্রাম এড়িয়ে চলেন, তার ফলেই তাঁরা বাতিল হয়ে যেতে পারেন।

তা হলে আমাদের এখন দক্ষিণপন্থীদের রণকৌশলের বিষয়টা ভেবে দেখতে হবে। এমন হতে পারে যে, অবস্থার চাপে পড়ে তাঁরা তাঁদের রণকৌশল বদলাতে পারেন এবং সত্যি সত্যিই সংগ্রাম শুরু করতে পারেন। তা হলেই যে আমাদের সমস্যা মিটে যাবে তা নয়। ওইরকম পরিস্থিতিতে যদি সংগ্রাম শুরু হয়, দক্ষিণপন্থীদের কৌশল হবে সময় না হতেই সংঘর্ষ বন্ধ করে দেওয়া, কোনও না কোনও উপায়ে। অতএব আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, যেন ১৯২২ সালের চৌরিচৌরার ঘটনার মতো কিছু না ঘটে। ১৯৩২-এর হরিজন আন্দোলনের মতো কিছু আমাদের মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে না দেয়, কিংবা ১৯৩১-এ গান্ধী-আরউইন চুক্তির মতো কিছু না হয়। আমরা যদি সতর্ক নজর না রাখি, দক্ষিণপন্থীদের আরম্ভ করা সংগ্রাম অবাঞ্ছিতভাবে শেষ হতে পারে, অতএব সবচেয়ে ভাল হবে বামপন্থীরা যদি আগেই ঘোষণা করে দেন কী উদ্দেশ্য নিয়ে ও কীরকম মনোভাব নিয়ে তাঁরা সংগ্রামে

অবতীর্ণ হচ্ছেন, সে-সংগ্রাম দক্ষিণ, না বামপন্থী, কারা শুরু করছেন।

এখানে সংবিধান-পরিষদের বিষয়ে দু-একটা কথা বলা দরকার। প্রকৃত সংবিধান পরিষদ হল সেটিই, ক্ষমতা হস্তান্তরের পর গভর্নমেন্ট যার আহ্বান করে। যে সংবিধান- পরিষদ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং নির্বাচকমণ্ডলীর ছত্রতলে সম্মিলিত হয়, সেটা কংগ্রেস এবং ভারতীয় জাতির সমূহ ক্ষতির কারণ হবে। সময় থাকতে আমরা যেন এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হই এবং আগে থেকে আমাদের দেশবাসীকে সাবধান করে দিই, এই দাবি যদি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট মেনে নেয়, তা নেবে তার নিজের স্বার্থে। দেশবাসীকে জানানো দরকার তার ফলে কী বিপদ হতে পারে।

আমাদের সামনে বর্তমান সমস্যা হল জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ করা, সে-আন্দোলন কি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আরম্ভ করবে? আমরা সকলে তাই চাই এবং সেটাই ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেসকে আন্দোলনের মধ্যে নিয়ে আসবে। কিন্তু তারা যদি এগিয়ে না আসে, আমরা কী করব? আমরাও পিছিয়ে থাকব? এ দেশ যেমন ওদের, তেমনি আমাদেরও। আমাদের প্রত্যেকের মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্য আছে। কাজেই এই সন্ধিক্ষণে আমরা পিছিয়ে থাকতে পারি না। আমাদের নেতারা যদি তাঁদের দায়িত্ব পালন না করেন, আমাদেরকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে, আমাদের যত শক্তি যত ক্ষমতা আছে তাই নিয়ে।

সংঘর্ষ যদি বামপন্থীরাই শুরু করেন, তার মানে এই নয় যে, সেটা বামপন্থী সংগ্রাম হবে, সে হবে জাতীয় সংগ্রাম, তার আহ্বান যেই করে থাকুক— বামপন্থী কিংবা দক্ষিণপন্থী। আহ্বান কোন পক্ষের, আর সংগ্রাম কাদের এই দুটোতে গুলিয়ে ফেললে সে হবে এক মারাত্মক ভুল।

এই প্রসঙ্গে অবিসংবাদিত তথ্যের ভিত্তিতে আমি বলতে বাধ্য, কংগ্রেস আজ ১৯২১ কিংবা ১৯৩০ অথবা ১৯৩২-এ যা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। এর চেয়ে কম শক্তি এবং কম সহায়সম্বল নিয়ে আমরা যদি তিনবার সংগ্রাম করে থাকি, বর্তমান সংকটের সামনে কি আমরা ভয় পেয়ে যাব?

তাই আমি আপনাদেরকে বলছি, আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হন, সেইভাবে নিজেদেরকে তৈরি করুন, সংগ্রাম আসছে, কে তার জন্যে আহ্বান জানাল তাতে কী এসে যায়?

আজকের এই জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এমন হতেও পারে যে, কিছুক্ষণের জন্যে আপনারা বিভ্রান্ত বোধ করবেন। কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের অস্থির, এলোমেলো পরিবর্তনশীল নীতি মানুষের বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়ে দেয়। কয়েকটি সাম্প্রদায়িক সংগঠনের বিপজ্জনক মনোভাব পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলছে। বামপন্থীদের নিজেদের মধ্যেও একতার অভাব মানুষের মনোবল প্রায় নষ্ট করে দিচ্ছে। তবু আপনাদের পিঠ যদি দেওয়ালে ঠেকে গিয়ে থাকে, এক মুহূর্তের জন্যও সাহস হারাবেন না, আত্মবিশ্বাস হারাবেন না। মনে রাখবেন, কমরেডগণ, আজ বামপন্থী আন্দোলনের পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হই কিনা, তার ওপরে নির্ভর করছে তার ভবিষ্যৎ। আরও মনে রাখবেন, ভারতের স্বাধীনতা জয় করে নেওয়ার আজ চরম সুযোগ উপস্থিত। এই বিরল সুযোগ হারালে আমাদের ঘোর বিপদ; এই সময়ে আমাদের দায়িত্ব যদি আমরা পালন করতে না পারি, ভবিষ্যৎ আমাদের ক্ষমা করবে না।

আমি স্বীকার করছি, যারা নিজেদের ছোট করে দেখে আমি তাদের দলে নই। আমি বিশ্বাস করি, বামপন্থীদের দিক থেকে যদি আহ্বান আসে জনসাধারণ সাড়া দেবে। সংগঠনের

দিক থেকে যদিও আমরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ বামশক্তির জনসমর্থন নিঃসন্দেহে ঐক্যবদ্ধ দক্ষিণপন্থী শক্তির চেয়ে বেশি। যে নেতৃত্ব দেশ এখন প্রত্যাশা করছে, যার জন্যে প্রতীক্ষা করছে, মহাত্মা গান্ধী কিংবা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যদি তা না দেন, আমরা ইতস্তত করব কেন? ইতিহাসের যুক্তি যদি বামপন্থীদের ডাক দেয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করতে, আমরা যেন তাতে দুঃখিত না হই। বরং আমরা সেই সুযোগকে যেন স্বাগত জানাই। তা হলে আমরা স্বরাজ জয়ের যুদ্ধে সাহায্য করতে পারব, দক্ষিণপন্থীদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারব এবং শেষ পর্যন্ত দেশবাসীর হৃদয়ে বামপন্থী আন্দোলনকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব।

দক্ষিণপন্থীদের ক্রমাগত আক্রমণে এবং তারা যে কৌশলে আমাদের মনোযোগ ভুল দিকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করছে, যার ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন একটা মেকি সংবিধান পরিষদের দাবিতে পর্যবসিত হয়েছে, এসবের দরুন আপনাদের মধ্যে কেউ যদি বিচলিত বোধ করেন, আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি, আপনাদের বিশ্বাস এবং সাহস হারাবেন না। এই সংকটের সময়ে আপনারা যেন হতোদ্যম হবেন না। একটি জাতীয় আন্দোলনের রূপে এক প্রত্যাখ্যান হানুন দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে। একমাত্র সেইভাবেই আমাদের দক্ষিণপন্থী বন্ধুদের অপকৌশল আমরা প্রতিহত করতে পারি।

এই চরম লগ্নে এক প্রাক্তন বামপন্থী নেতা 'ইয়ং ইন্ডিয়া'-কে যে বাণী দিয়েছিলেন, তার কথা মনে পড়ছে, "স্বাধীনতা তাদের কাছেই আসে যারা সাহস অবলম্বন করে, কাজ করে।" আমাদের সকলেরই সময় এসেছে সাহস অবলম্বন করার, কাজ করার। এক বিখ্যাত ইতালীয় সেনানায়ক, বিপ্লব যখন চলছিল, সেই সময়ে তাঁর অগণিত অনুগামীদের প্রতি যে উদ্দীপনাময় ভাষণ দিয়েছিলেন, তাও আমার মনে পড়ছে। "যদি তোমরা আমার অনুগমন করো আমি তোমাদের দেব ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অভাব, জোর করে এগিয়ে যাওয়া, মৃত্যু।" ওই কথাগুলো যেন আমাদের কানে ঝংকার তোলে, আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে সামনে এগোতে, সাহস রাখতে, কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

১৯

সামনে বিপদ

'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকা, ৬ জানুয়ারি ১৯৪০ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

আমাদের গত সংখ্যায় আমরা আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম কংগ্রেসের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ অর্থাৎ একটি সংবিধান পরিষদের দাবির প্রতি। সংবিধান পরিষদের চিন্তা কিংবা তার জন্য দাবি, এর কোনওটাই নতুন কিছু নয়। তার কথা কংগ্রেস তাদের বিভিন্ন প্রস্তাবে বারে বারে বলেছে। কিন্তু এখনকার এই দাবি যেভাবে রচিত হয়েছে এবং যেভাবে

দাবিটি উত্থাপন করা হয়েছে, তার মধ্যে নতুনত্ব আছে এবং সে নতুনত্ব অবাঞ্ছনীয়। এবং তার মধ্যে সবচেয়ে যেটা বিপজ্জনক, তা হল সকলের অলক্ষ্যেই দাবিটি চুপিসারে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কার্যত পূর্ণ স্বরাজের জাতীয় দাবির পরিবর্তে, রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে অসাধারণ চাতুর্যের পরিচায়ক এবং এর ফলে বহুসংখ্যক কংগ্রেসি বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন। তাঁদের মধ্যে বামপন্থীরাও থাকবেন যাঁরা অত্যন্ত সতর্ক নন।

উপরোক্ত পদক্ষেপটি যে কতটা বিপজ্জনক তা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে আমাদের পরিষ্কার ধারণা করা দরকার সংবিধান পরিষদ বলতে আসলে কী বোঝায়। সন্দেহ নেই, সংবিধান পরিষদ বলতে বোঝায় সংবিধান রচনার জন্য নির্বাচিত একটি পরিষদ। কিন্তু সে-পরিষদ কে আহ্বান করবে? কখন এবং কী পরিস্থিতিতে তা আহ্বান করা উচিত, কিংবা তার অধিবেশন যথার্থই হওয়া উচিত? তার সিদ্ধান্তসমূহকে কীভাবে কার্যকর করা হবে, কে করবে? সংবিধান পরিষদ সম্পর্কে এইসব প্রয়োজনীয় প্রশ্ন, যার উত্তর পাওয়া জরুরি।

সংবিধানবিষয়ক চিন্তার সূত্রপাত যখন কংগ্রেস করল, ইতিহাসে এবং রাজনীতি সম্পর্কে যাঁদের কিছু জ্ঞান আছে তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিলেন যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরে স্বাধীনতা অর্জিত হলে তার পরে সংবিধান পরিষদ গঠন করা হবে। সংঘর্ষে সাফল্য লাভের পর জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে, তাঁরা জাতীয় সরকার কিংবা অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন করবেন। সেই সরকার সংবিধান পরিষদ আহ্বান করবে জনগণের জন্য একটি সংবিধান রচনা করবার উদ্দেশ্যে। সেইরকম একটি সরকারের ছত্রছায়ায়, সংগ্রামে সাফল্য লাভ করার পর যে সরকার প্রকৃত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, ভারতীয় কিংবা বিদেশি, অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত কোনও শক্তির পক্ষে দুরূহ হবে, হয়তো অসম্ভব হবে, কোনওভাবে সেই পরিষদের উদ্দেশ্য বিফল করা। কিন্তু এখন যদি ব্রিটিশ সরকার বর্তমান দাবি পূরণ করে, তা হলে কী হবে? সংবিধান পরিষদ কি আহ্বান করবে ব্রিটিশ সরকার? পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে তার নির্বাচন হবে। আর অধিবেশন বসবে বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পক্ষপুটে। পরিষদের সিদ্ধান্তগুলি যে ব্রিটিশ সরকার কার্যকর করবে তার কোনও নিশ্চয়তা থাকবে না। বস্তুত পরিষদ হবে একটি সিংহচর্মাবৃত বিতর্কসভা, উপরন্তু পরিষদ কক্ষটি হয়ে দাঁড়াবে দেশের সমস্ত সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর যুদ্ধক্ষেত্র। বর্তমান সরকার আড়ালে দাঁড়িয়ে যেমন দরকার মনে করবে সুতো ধরে টানতে পারবে। অলৌকিক কিছু যদি না ঘটে, পরিষদের ভিতরের সব বাদবিসংবাদ শেষ পর্যন্ত একটি অচল অবস্থার সৃষ্টি করবে, এবং দেখা যাবে সংবিধান পরিষদ ব্যর্থ হল। তখন ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবে, ওঁরাই এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী এবং তারা যে কংগ্রেসের দাবি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিয়েছিল তার জন্যে কৃতিত্ব দাবি করবে। সেইরকম অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতিতে কংগ্রেস কী জবাব দিতে পারবে?

না, এই পদক্ষেপ অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং আমাদের একমাত্র আশা ব্রিটিশ সরকার, তাদের নিজস্ব কারণেই এটি প্রত্যাখ্যান করবে। যদি তারা তা না করে, কংগ্রেস এক ঘোর বিপদের মধ্যে পড়বে।

একজন সাধারণ দেশবাসীর পক্ষে বোঝা কঠিন, ঠিক এইরকম সময়ে ওরকম একটি প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কীভাবে করতে পারল। পৃথক নির্বাচনে তাঁরা সম্মত হয়েছেন, তার পরিণতি কী হবে তা জেনেও। তাঁরা এমন দাবি করেননি যে, সংবিধান পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ ব্রিটিশ সরকার অবশ্যই কার্যকর করবে। এ ঘোষণা আগেই করতে হবে। ফলে,

পরিষদ যদি কোনও সর্বসম্মত সমাধানে পৌঁছোয়, ব্রিটিশ সরকার কিংবা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তার পরিবর্তন করতে পারবে, ভারত সম্পর্কে গোলটেবিল সম্মেলনের সময়ে যা হয়েছিল।

যথেষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে এই দাবি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে মেনে নেওয়ার সম্ভাবনা আছে। কেন মেনে নেবে না? তাতে তাদের লাভ বই লোকসান নেই। গ্রেট ব্রিটেন থেকে যেসকল দূত সম্প্রতি ভারতে এসেছেন, তাঁরা নেতৃবর্গের কাছে আবেদন করেছেন সংগ্রাম স্থগিত রাখতে। তাঁরা এ আশাও দিয়েছেন যে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ভারতের সমস্যা নিয়ে ব্রিটিশ সরকার কোনও একটি মীমাংসায় আসতে সক্ষম হবে। সাধারণ অবস্থায় এই ধরনের প্রলোভনে জাতীয়তাবাদী নেতাদের ক্ষেত্রে কোনও কাজ না হওয়ারই কথা কিন্তু বর্তমান ওয়ার্কিং কমিটির বেলায় তা হল না, যাঁরা অনির্দিষ্টকাল ব্যাপী সংগ্রাম মুলতুবি রাখবার জন্যে যে কোনও একটা অজুহাত খুঁজে পেতে আগ্রহী। ভবিষ্যতে খুব সম্ভবত আমরা নিয়মিতভাবে গ্রেট ব্রিটেন থেকে আরও ঘন ঘন দূতদের আগমনের কথা শুনব।

আরও একটি কার্যকর বিষয় বিবেচনার আছে, যাতে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে আমাদের আরও সচেতন করে দেবে। সংগ্রামে সফল কোনও জাতির নেতারা সর্বদা প্রভূত মর্যাদা এবং প্রভাব নিয়ে বেরিয়ে আসেন এবং সেই কারণে তাঁরা জনসাধারণকে নেতৃত্ব প্রদান করতে পারেন, জনমত সৃষ্টি করতে পারেন। জনসাধারণেরও তাদের নেতাদের ওপর এত আস্থা জন্মায় যে তাকে প্রায় অন্ধ বিশ্বাস বলা যায়। সেই অবস্থায় নেতারাই সংবিধান পরিষদের কাজকর্ম প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হন এবং তখন সেই পরিষদের উদ্দেশ্য বিফল করা দুরভিসন্ধিপরায়ণ ব্যক্তিদের এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। আজ কংগ্রেস যে সংবিধান পরিষদ দাবি করছে, অবশ্যই সেটা ষড়যন্ত্রকারী এবং অপকৌশলকারীদের কার্যক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াবে, এমন কোনও ব্যক্তি অথবা সংগঠন থাকবে কিনা সন্দেহ, যার প্রভাব এবং মর্যাদা এত হবে যে তারা পরিষদের কাজকর্ম সঠিক পথে নিয়ে যেতে পারবে, তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে। কংগ্রেসিদের মধ্যে, আজ যাঁরা কংগ্রেস সংগঠনের কর্তৃত্বে আছেন, তাঁরাই বামপন্থীদের চেয়ে বেশি সংখ্যায় নির্বাচিত হয়ে আসবেন। যদি সৌভাগ্যক্রমে, কোনও মীমাংসা করা যায়, সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক মতে সহমত যা পেতে হবে, সেটা সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল মতবাদ সম্পর্কে নয়, সর্বাপেক্ষা নরমপন্থী মতবাদ সম্পর্কে। অতএব সবদিক বিবেচনা করলে, একটি মেকী সংবিধান পরিষদের দাবি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বর্জন করা উচিত।

এ প্রসঙ্গে ১৯১৭-এর রুশ বিপ্লবের পর, যখন সংবিধান-পরিষদের অধিবেশন চলছিল তখনকার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। সমস্যাটি বৃহৎ ছিল, জারের শাসনের বিরোধীদের মধ্যে সবরকমের মতবাদের লোকরাই সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রগতিশীল যাঁরা, সেই বলশেভিকরা সংখ্যায় দিলেন নিতান্তই অল্প। বহুমত বিশিষ্ট সেই সমাবেশকে কেরেনসকি পন্থী বক্তা ও পুঁথিগত বিদ্যায় পণ্ডিত বিপ্লবীরা বক্তৃতায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বলশেভিকরা শুধু দেখে যাচ্ছিলেন, অপেক্ষা করছিলেন। যখন তাঁরা বুঝতে পারলেন এতে কোনও কাজ হবে না, তখন তাঁরা সভা পরিত্যাগ করে গেলেন, এবং অধিবেশন ভেঙে দেওয়ার আদেশ দিলেন। তারপর যা হল সে তো ইতিহাস। সংবিধান পরিষদের মৃত্যু হল, বিপ্লব বেঁচে থাকল। বলশেভিকরা যদি সংবিধান পরিষদ চালিয়ে যেতেন, তার ফল কী হত, আজ আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

রুশ সংবিধান পরিষদে কোনও বিদেশি শক্তির দিক থেকে কোনও বিপদের সম্ভাবনা

ছিল না বললেই চলে। বলশেভিকদের একমাত্র ভয় ছিল, মেনশেভিক, নরমপন্থী এবং প্রতিক্রিয়াশীলেরা পরিষদে আধিপত্য করবেন এবং নিজেদের স্বার্থে পরিষদের বিচার-বিবেচনা এদিক-ওদিক করবেন। সেই কারণেই তাঁরা মনে করেছিলেন পরিষদ ভেঙে দেওয়া দরকার।

রুশদের চেয়ে আইরিশদের উপমা টানা এক্ষেত্রে বেশি শিক্ষণীয়। বিশ্বযুদ্ধের পর, যখন আইরিশ জাতি, বিশেষত শিন-ফিন দল, লড়াইয়ের মনোভাব দেখাচ্ছিল, ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মি. লয়েড জর্জ, একই ধরনের পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি আইরিশ জাতিকে একটি আইরিশ সম্মেলনের মাধ্যমে নিজেদের সংবিধান রচনা করতে বললেন, যে আইরিশ কনভেনশন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যার দাবি করেছে, তারই আইরিশ সংস্করণ ছিল, শিন ফিন নেতারা আমাদের নেতাদের চেয়ে বেশি বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, কনভেনশনের ধারে-কাছেও গেলেন না এবং বাইরে বসে নিজেদের বিচার-বিবেচনা চালিয়ে গেলেন। কনভেনশন বসল এবং কিছুদিন আলাপ-আলোচনা চলল কিন্তু শিন ফিন দলের অনুপস্থিতির কারণে সেটা একটা প্রহসনে পরিণত হল। কনভেনশন ভেঙে গেল, শিন ফিন তাদের যুদ্ধ চালিয়ে গেল এবং আইরিশরা যেটুকু স্বাধীনতা পেল সে তারই ফল।

আমাদের অবিলম্বে কংগ্রেস কমিটির বিপজ্জনক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে হবে এবং আগে থেকেই প্রস্তাবিত সংবিধান পরিষদকে অস্বীকার করতে হবে। এ কাজ করতে হবে সংবিধান পরিষদের কাজ আরম্ভ যাতে না হয়, তার সময় অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে আমরা পরিষ্কার করে জানিয়ে দেব, তাঁরা যদি সংগ্রামের পথে ঠিকমতো দেশকে চালিয়ে নিয়ে যেতে না পারেন, অন্তত ওরকম ক্ষতিকর এবং বিপজ্জনক কৌশল থেকে বিরত থাকুন।

২০

রামগড়

‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ পত্রিকা, ১৩ জানুয়ারি ১৯৪০ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

ফরওয়ার্ড ব্লকের সামনে এখন ঘোর দুঃসময়। সূচনা থেকেই সে দুটি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় প্রতিবিপ্লব। যে পথ সে নিজের জন্যে বেছে নিয়েছে সেটা সহজ হয়নি, কিন্তু ভারতীয় প্রতিবিপ্লব যে এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নির্মম এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হবে তা কেউ ভেবেছিল কিনা সন্দেহ। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা সবাই জানি, প্রায়শই বহিরাগত সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে দেশি প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে লড়াই করা বেশি কঠিন হয়। সাম্প্রতিক কয়েক মাসে আমরা দেখেছি, কত জন কমরেড, যাঁরা বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে অকুতোভয়ে যুদ্ধ করতে পারতেন, দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণের বলি হয়েছেন।

পরিস্থিতির দিকে আবেগবর্জিতভাবে একবার যদি একটু তাকাই, ইতিহাসের একজন ছাত্র

যেমনভাবে দেখে থাকেন, অবাক না হয়ে পারি না যে দক্ষিণপন্থী যাঁরা মুখে অহিংসা এবং নরমপন্থার স্তুতি গেয়ে থাকেন, তাঁরা কী করে একটা রাজনৈতিক খেলা অমন.নিরঙ্কুশভাবে খেলে যাচ্ছেন। এই হল, ইতিহাস কথিত বাস্তব রাজনীতি। এই খেলা দেখে সকলেরই রোমাঞ্চ হতে বাধ্য, এমনকী এখন যাঁরা নির্যাতিত হচ্ছেন, তাঁদেরও।

ফরওয়ার্ড ব্লকের সামনে এখনই যে লক্ষ্যগুলো ছিল, তার মধ্যে একটি হল কংগ্রেসের মধ্যে এবং দেশে যাঁরা বামপন্থী তাঁদের ঐক্যবদ্ধ করা। যেহেতু ব্লকের মঞ্চে তা সম্ভব হয়নি, বাম ঐক্য কমিটি গঠন করা হল। কমিটির অভিজ্ঞতা হল বিচিত্র। যে মুহূর্তে ১৯৩৯-এর জুন মাসে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে বাম ঐক্য কমিটি তার শক্তি প্রদর্শন করল, দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণ শুরু হল। সেটা প্রথম হল ৯ জুলাইয়ের প্রদর্শনে। তারপর থেকে বাম ঐক্য কমিটি থেকে বামপন্থীরা সমানে বেরিয়ে যাচ্ছেন। সুচতুর দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের কাবু করবার জন্য দ্বিবিধ কৌশল অবলম্বন করেছেন। যাঁরা আপোসপন্থী এবং 'বোঝালে বোঝেন' তাঁদেরকে ক্রমাগত বোঝান চলছে, কিন্তু যেখানে শক্ত ঠাঁই, সেখানে কোনও মায়ামমতা নেই। তার ফল হয়েছে, বামপন্থীদের দল ক্রমশ পাতলা হয়ে যাচ্ছে। তাঁদের অবস্থা আরও কঠিন করে তুলবার জন্যে কয়েকটি প্রদেশে সরকারি উৎপীড়ন সমানে চলেছে এবং তা প্রথম শুরু করা হয়েছে কংগ্রেস শাসনের অধীনে। আজ সন্দেহ ব্যক্ত করা হচ্ছে, এখন আর বাম ঐক্য কি আদৌ সম্ভব?

দুটি পন্থার একটিতে বাম ঐক্য সম্ভব হতে পারে। প্রথম পন্থাটি, আমরা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছি, একটি মঞ্চে একটি সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে বামপন্থীদের একত্রিত করা। এই পন্থা ব্যর্থ হলে আমরা আরেকটি পন্থা গ্রহণ করতে পারি। গত কয়েক মাসের ঘটনাবলী বামপন্থীদের এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছে— তাঁদেরকে এক অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। কয়েকজন তাতে বিফল হয়েছেন, সকলে নয়। যাঁরা সাহসের সঙ্গে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, প্রমাণ হয়েছে তাঁরা প্রকৃত বামপন্থী এবং বামপন্থী সংহতি এখন হবে তাঁদেরই সংহতি। প্রকৃতির খেলায় বন্যার আগে প্রায়ই নদীগুলির জল শুকিয়ে যায়। দলের মধ্যে সংখ্যা হ্রাস পেয়ে তারপরেই আসে দ্রুত সম্প্রসারণ, এদেশে বামপন্থী আন্দোলন তাই হবে। বিগত সংগ্রামে যাঁরা বিশ্বাস হারাননি তাঁরা এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে একমত হবেন যে, সামনের দুঃসময়ের শেষে সুসময় আসবে।

ভারতের ইতিহাসে ফরওয়ার্ড ব্লকের ভূমিকা হিজ ম্যাজেস্টিস বৈরোধিত্য নয়। আমরা এই মর্মে মত ব্যক্ত হতে শুনেছি যে, ফরওয়ার্ড ব্লকের উদ্দেশ্য কংগ্রেসের নীতি এবং কর্মসূচিকে একটু ঝাঁঝালো করে তোলা ছাড়া আর কিছু নয়। এর চেয়ে বড় ভুল আর কিছু হতে পারে না। ফরওয়ার্ড ব্লক এমন কিছুর পক্ষপাতী যা গতিশীল, সুনিশ্চিত। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতায় বিরোধের নঞর্থক নয়, সমর্থক, গতিশীল, যার কাজ আমাদেরকে দ্রুত প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলা।

অসম্ভব নয়, আমরা যত গভীরতম দুঃসময়ের দিকে এগিয়ে যাব, ফরওয়ার্ড ব্লকের কেউ কেউ সেই পরীক্ষার সামনে মনোবল হারাবেন। কিন্তু আমাদের জন্য কোনও পশ্চাদপসরণ নেই, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকাও নেই। ফরওয়ার্ড ব্লককে এগিয়ে যেতে হবে নিরন্তর, অবিরত। সেইটাই তার ঐতিহাসিক ভূমিকা। দৃঢ়প্রতিজ্ঞকে প্রতিরোধ করতে হবে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা দিয়ে, অনত্যাচারের প্রতিরোধ করতে হবে অকুতোভয় বীরত্ব সহকারে। একমাত্র তা হলেই আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারব। একমাত্র তা হলেই যুগ্ম রণক্ষেত্রে আমরা জয়ী

হতে পারব। আমরা যার জন্য সংগ্রাম করছি তা ন্যায়সংগত, আমাদের ভূমিকা ঐতিহাসিক। অতএব কিছুকালের জন্য যদি নিশ্ছিদ্র অন্ধকার আমাদের গ্রাস করে আমরা যেন বিশ্বাস ও সাহস না হারাই।

এক একটা সময় আসে যখন শুধু যুক্তি দিয়ে ভবিষ্যতের যবনিকা ভেদ করা যায় না। সেরকম সময়ে যাদের বিশ্বাস দুর্বল তারা কখনও কখনও সাহস ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যুক্তি যখন ব্যর্থ হয়, সহজাত প্রবৃত্তি এগিয়ে আসে। সহজাত অন্তর্দৃষ্টি ভবিষ্যতের দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করতে পারে, আগামীকালের একটা ঝলক দেখিয়ে দিতে পারে। আজ সহজাত প্রবৃত্তি আমাদের বলে দিচ্ছে, পৃথিবীর কোনও শক্তি আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শকে পরাস্ত করতে পারবে না। আমরা যেখানেই যাই, জনগণের যে প্রচণ্ড সাড়া পাই তার একটাই তাৎপর্য হতে পারে। দু'দিক থেকে নির্যাতন সত্ত্বেও জনসাধারণ বুঝতে পারছে আমরা যা ভাবছি তা তাদেরই চিন্তা এবং যা করছি তা তাদের সঙ্গে মিল রেখেই করছি।

হাওয়ায় জোর গুজব ভেসে বেড়াচ্ছে, সরকারের সঙ্গে আপোসের। কেউ কেউ মনে করছেন আগামী মার্চে রামগড়ে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের আগে একটা মীমাংসার চেষ্টা করা হবে। অন্যদের মতে রামগড় কংগ্রেস হয়তো কংগ্রেস কার্যকরী কমিটিকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দান করবে এবং বোঝাপড়ার জন্য শেষ চেষ্টা করা হবে আগামী মার্চ মাসে। ভারতের তথাকথিত ইংরেজ বন্ধুরা দক্ষিণপন্থীদের পরামর্শ দিচ্ছেন আগামী মার্চ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে, যখন একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছোন সম্ভব হবে। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, দক্ষিণপন্থীদের পরিকল্পনায় রামগড়ের গুরুত্ব যথেষ্ট। তা না হলে রামগড় কংগ্রেস থেকে বঙ্গদেশ, প্রকৃত বঙ্গদেশকে বাদ দেওয়ার জন্য যে নির্মম প্রচেষ্টা চলছে তার কী ব্যাখ্যা হতে পারে? দক্ষিণপন্থীদের মতলব রামগড়েই হাসিল করতে হবে এবং বঙ্গদেশ তার ৫৪৪ জন প্রতিনিধি নিয়ে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের অসুবিধার কারণ হতে পারে। সেই কারণে যেমন করেই হোক বাংলাকে বাদ দিতেই হবে।

কিন্তু সেটা সহজ নয়। রামগড় কংগ্রেস থেকে তোমরা বঙ্গদেশকে বাদ দিতে পারো, ভারতের রাজনীতি থেকে পারবে না।

বামপন্থীদের কাছে রামগড়ের বেশি গুরুত্ব থাকতে পারে, কিন্তু ভারতের ইতিহাসে মার্চ মাস হবে গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে বামপন্থীদের ওই মাসে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং দক্ষিণপন্থীদের প্রতিবিপ্লবী ও আপোসমূলক কৌশলের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সেই সূত্রে মোটামুটি রামগড় কংগ্রেসের সময়ে বিহারে একটি সারা ভারত সম্মেলনের প্রয়োজন হতে পারে। অন্যদের সঙ্গে যেসব বামপন্থী কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল কিংবা তাঁদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের জন্য যাঁদের ওপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁদের এই সম্মেলনে যোগ দিতে হবে এবং তাকে সফল করতে হবে। সেরকম একটি সম্মেলনের প্রভাব কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব এবং ব্রিটিশ সরকার, উভয়ের ওপরেই অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে এবং দেশের সংগ্রামী বামপন্থীদের উৎসাহ ও উদ্যম বৃদ্ধি পাবে। রামগড় কংগ্রেসে যাবার জন্য ফরওয়ার্ড ব্লক সদস্যদের অত ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। অতজন বামপন্থী নেতার ওপর যখন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং প্রভূত বঙ্গদেশ যখন রামগড় কংগ্রেসের বাইরে, কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলোর ওপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারার সম্ভাবনা খুবই কম।

তার চেয়ে বরং ফরওয়ার্ড ব্লক সদস্যরা তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করুন যত শীঘ্র সম্ভব পূর্ণ স্বরাজ জয়ের লক্ষ্যে।

২১

আমাদের সমস্যা

'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকা, ২০ জানুয়ারি ১৯৪০ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

ফরওয়ার্ড ব্লকের সারা ভারত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বোম্বাইয়ে ২২ জুন ১৯৩৯ এবং তখন ব্লকের গঠনতন্ত্র এবং কার্যসূচি গৃহীত হয়। অতএব সারা দেশে নিজেদের সংগঠিত করবার জন্য আমাদের হাতে ছ' মাসের একটু বেশি সময় ছিল। সেই সময়ের মধ্যে আমরা কতটা কী করতে পেরেছি?

প্রথমেই বলা দরকার গত জুলাই থেকে কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটি আমাদের ওপর প্রবল আক্রমণ চালিয়ে আসছে। গত ছ-সাত মাস তারা আমাদের নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত দেয়নি। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দুটো রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে হয়েছে।

কখনও কখনও ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের চেয়ে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এটা বোধহয় সেইরকম একটা সময়।

তবু আমরা যথার্থই দাবি করতে পারি যে আজ "ফরওয়ার্ড ব্লক জিন্দাবাদ" একটি গণ স্লোগানে পরিণত হয়েছে। তার বাণী সুদূর গ্রামে পৌঁছে গেছে এবং সর্বত্র জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন জাগিয়ে তুলেছে। উপরন্তু ফরওয়ার্ড ব্লকের পিছনে আজ আছে একটি সর্বভারতীয় সংগঠন।

একদম প্রথম থেকে ফরওয়ার্ড ব্লক যে গণসহানুভূতি লাভ করেছে, সেটা চমকপ্রদ এবং আমাদের প্রত্যাশার অতীত। ভাবলে অবাক হতে হয়, এ কী করে সম্ভব হল, বিশেষত যখন মনে রাখি, স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনও কোনও মহল থেকে নিরন্তর বিরোধিতা চলে এসেছে। এর একমাত্র ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, ফরওয়ার্ড ব্লক বলতে লোক বোঝে এমন কিছু যা নির্ভীক ও গতিশীল, যা প্রগতিশীল।

সাংবিধানিক পন্থার দিকে, আপোসের দিকে কংগ্রেসের যে প্রবণতা ব্লক তা রোধ করেছে এবং সেইভাবে পচন রোধ করেছে। তার ফলে ফরওয়ার্ড ব্লক না থাকলে যা হত, কংগ্রেস আজ তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। তার ওপরে, ফরওয়ার্ড ব্লক আজ ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, যদি এই সংকটে প্রবীণ নেতারা ব্যর্থ হন, শেষ উপায় হিসাবে ফরওয়ার্ড ব্লক সংগ্রাম শুরু করার জন্য তৈরি।

কিন্তু আজ আমাদের সামনে যে প্রকৃত সমস্যা সেটা হল সংগঠন-সংক্রান্ত। আমাদের সংগঠন আমাদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি।

একটি সংগঠনকে ঠিক যেমনটি চাই তেমনিভাবে গড়ে তোলা এবং একটি কর্মী বাহিনী গড়ে তোলা, তার জন্য সময় এবং অর্থের প্রয়োজন, সম্ভবত অর্থের চেয়ে বেশি সময় প্রয়োজন। আমাদের হাতে সময় খুব কম ছিল। এবং আমাদের যাত্রার শুরুতেই আন্তর্জাতিক সংকট আমাদের ওপর এসে পড়ল। কিন্তু যতক্ষণ না আমাদের সংগঠন নিখুঁতভাবে গড়ে তুলছি ততক্ষণ সেই সংকটের মোকাবিলা করা আমরা মুলতুবি রাখতে পারি না। আমাদের হাতে এখনই যা সহায়সম্বল আছে তাই দিয়েই সংকটের মোকাবিলা করতে হবে। জাতীয় সংগ্রাম এবং সংগঠন গড়ে তোলা একসঙ্গেই চালাতে হবে। অন্য কোনও পথ আমাদের নেই।

ইতিমধ্যে আমরা যেন সর্বদা মনে রাখি, আজ আমাদের সর্বপ্রধান সমস্যা সাংগঠনিক। আসন্ন সংগ্রামের সম্মুখীন আমাদের হতে হবে অকুতোভয়ে এবং একই সঙ্গে সংগঠন গড়ে তোলার কাজও আমাদের চালিয়ে যেতে হবে যতটা ভাল করে পারি, হয়তো ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে এই সংগ্রামের শেষে দেখা যাবে আমাদের সংগঠন সম্পূর্ণতা লাভ করেছে।

২২

অবক্ষয় বন্ধ করো

'ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রিকা,' ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

বাতাসে জোর গুজব কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার খুব চেষ্টা চলছে। আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রীদের ঘনিষ্ঠ মহল এ-বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী এবং কংগ্রেস মন্ত্রীসভা বিভিন্ন প্রদেশে যে আবার সরকারে ফিরে আসবেন সে-বিষয় আশাবাদী। বর্তমানে দুটি জল্পনা শোনা যাচ্ছে। অনেকে মনে করছেন রামগড় কংগ্রেসের উপস্থাপনা এমন হবে, যাতে বলা যায় কাজটি হয়ে গেছে। অন্যদের ধারণা রামগড় কংগ্রেস কার্যকরী কমিটি অথবা মহাত্মা গান্ধীকে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে দেবে এবং বোঝাপড়া হবে কংগ্রেস অধিবেশনের আগে নয়, পরে। প্রথম ধারণাটি আমাদের মনে হয় সঠিক নয়। দ্বিতীয়টি যথার্থ কি না দেখা যাবে। যা নিঃসন্দেহে বলা যায় তা হল মহাত্মা গান্ধী এবং ব্রিটিশ সরকার একটা বোঝাপড়ায় আসতে আগ্রহী। গান্ধীজি বিনা সংগ্রামে স্বরাজ নিয়ে নিতে চান, সরকার চায় পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগেই একটা আপোস-মীমাংসা। এই মুহূর্তে মনে হয় না, আপোসের জন্য গান্ধীজির ন্যূনতম দাবিতে ব্রিটিশ সরকার সম্মত হবে। আমরা গান্ধীজির কথাই বলছি, কারণ কার্যনিবাহী কমিটি তাকেই একনায়কত্ব প্রদান করেছে।

ব্রিটিশ সরকার যে কারণে ভারতীয়দের দাবি পূরণের দিকে এগোতে চাইছে না, যে চিন্তা তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করছে, তা হল, শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস লড়াই করার মনোভাব দেখাবে না। ইউরোপের যুদ্ধের ফলে যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার তাদের দীর্ঘকালের যে-অভ্যাস— যতটা দেওয়া দরকার ততটা দেব না, এবং যা দেব তাও অত্যন্ত দেরি করে দেব, এই অভ্যাস ত্যাগ করেনি। অভিজ্ঞতা থেকে আমরাও জানি, কিছু যদি দেওয়াও হয়, তা খোলা মনে দেওয়া হবে না এবং তার ফলে তার পিছনে কোনও মানসিক উদারতা থাকবে না, কোনও সহৃদয়তা থাকবে না। সেই কারণে যত দূর সম্ভব দু-পক্ষেরই আগ্রহ সত্ত্বেও প্রস্তাবিত বোঝাপড়া হয়তো হয়ে উঠবে না।

বোঝাপড়ার পথে আরেকটি কাঁটা ভারতীয় সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব। তারা এখনও সংখ্যালঘুদের নিয়ে খেলা করা, কিংবা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অস্ত্ররূপে তাদেরকে ব্যবহার করা বন্ধ করতে প্রস্তুত নয়। তবে সর্বশেষ যে-সব খবর পাওয়া যাচ্ছে

তাতে দেখা যায়, কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ার ব্যবস্থা যদি করা যেত, সরকার মুসলিম লীগের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করতে প্রস্তুত ছিল। ''লণ্ডন টাইমস''-এ এবং অন্যান্য ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্য আমাদের এই ধারণাকে সমর্থন করে। ব্রিটিশ সরকার যদি মুসলিম লীগের অগোচরে গান্ধীজির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে, আমাদের মনে হয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয় দলেই বিভেদ ঘটে যাবে। কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধীজি এবং তাঁর অনুগামীরা সকলই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন। অপর পক্ষে মুসলিম লীগের যাঁরা রাজভক্ত, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বশ্যতার কারণে তাঁরা জিন্না এবং লীগ কাউন্সিলের প্রগতিশীল অংশ, যাঁরা এখন কাউন্সিলে প্রভাবশালী, তাঁদের থেকে আলাদা হয়ে যাবেন।

আর দেরি না করে আমাদের এখনই ভাবতে হবে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব যদি সরকারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে তা হলে কী হবে। এটাই তো স্বাভাবিক, ঐক্য এবং শৃঙ্খলার নামে দক্ষিণপন্থীরা ভিন্নমতের সদস্যদের দিয়ে সেই আপোস জোর করে স্বীকার করিয়ে নেবে। দক্ষিণপন্থীরা আশা করবে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সিদ্ধান্ত তাঁদের চুপ করিয়ে দেবে, ঠিক যেমন বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন, অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেই বানচাল করে দেওয়া হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে ভিন্নমতাবলম্বী বামপন্থীরা কী করবেন?

বামপন্থীরা সামগ্রিকভাবে কী করবেন সে বিষয় ভবিষ্যৎবাণী করা মুশকিল। এখন আমরা একমাত্র ফরওয়ার্ড ব্লক হয়েই কথা বলতে পারি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বোঝাপড়া ব্লক মানতে পারে না। আমাদের যে লক্ষ্য পূর্ণ স্বরাজ, তার সঙ্গে সেটা আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ হবে না। অতএব আমরা ঘোষণা করতে বাধ্য হব যে কোনও বোঝাপড়ার দায় আমরা স্বীকার করব না, এবং আমরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাব। আমাদের মতে বোঝাপড়া-ওয়ালারা দুটো অপরাধে অপরাধী হবেন, প্রথমত স্বাধীনতার লক্ষ্য পরিত্যাগ এবং দ্বিতীয়ত অসহযোগ এবং সত্যাগ্রহের পথ পরিহার। অতএব এ-ঘোষণা করা আমাদের পক্ষে সঙ্গত হবে যে আপোসপন্থীরা যেহেতু কংগ্রেসের মৈতালিক নীতি ত্যাগ করেছেন অতএব তার ফলেই তাদের কংগ্রেসের সদস্যপদের অবসান হয়েছে। এই নির্বুদ্ধিতা তাঁরা যদি ত্যাগ না করেন এবং কংগ্রেসে থেকেই যান আমরা তাঁদেরকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করলেও অন্যায় হবে না।

কারণ কংগ্রেস মূলত এর প্রকৃত অর্থে এমন একটি সংগঠন যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির ওপর দাঁড়িয়ে এবং তার জন্য যে পথ সে অবলম্বন করেছে সেটা অসহযোগ এবং অহিংসার পথ। যদি কোন কংগ্রেসি এই মূল লক্ষ্য ও মৌলিক নীতি পরিত্যাগ করে তা হলে এমনিতেই সে আর কংগ্রেসি থাকে না। এবং যদি কংগ্রেস আগামীকাল তার মূল লক্ষ্য ও মৌলিক পন্থা ত্যাগ করে তা হলে যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে আমরা ১৯২০ সাল থেকে জানি, এই কংগ্রেস আর সে-কংগ্রেস থাকবে না। আপোসপন্থীরা স্বেচ্ছায় কংগ্রেস থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেন, কিংবা বহিষ্কৃত হন, কংগ্রেস আবার তার আগেকার মর্যাদা ফিরে পাবে, আবার সে তার উদ্দীপ্ত বৈপ্লবিক চরিত্র ফিরে পাবে। আমরা কেন কংগ্রেস ছেড়ে যাব, যাঁরা পিছিয়ে পড়ছেন তাঁদের হাতে সংগঠনের নাম এবং ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার সঁপে দিয়ে? তাঁদেরকেই বহিষ্কার করা উচিত এবং তাঁরা যদি চান একটি সমান্তরাল সংগঠন তাঁদেরকেই গড়ে তুলতে হবে। কংগ্রেস একমাত্র তাঁদেরই হওয়া উচিত যাঁরা স্বাধীনতার এবং তার জন্য যে-সংগ্রাম, তারই সমর্থক।

আমরা বুঝতে পারছি, আপোসপন্থীরা সম্ভবত স্বেচ্ছায় কংগ্রেস ছাড়বেন না, সংগঠনে নিজেদের গোষ্ঠীর লোক ঢুকিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সৃষ্টি করে কংগ্রেসের নাম ভাঙিয়ে যাবেন। সে ক্ষেত্রে কী হবে আমরা কল্পনা করতে পারি, দুটি কংগ্রেস হবে। তখন সাধারণ মানুষকে, জনগণকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, ঘোষণা করতে হবে, কোনটি তাদের কংগ্রেস। তাদের উত্তর কী হবে তা নিয়ে আমাদের মনে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ জনগণ আমাদের সঙ্গে আছেন। ঐক্যবদ্ধ বামপন্থীদের অনুগামীরা সংখ্যায় ঐক্যবদ্ধ দক্ষিণপন্থীদের চেয়ে অনেক বেশি, মহাত্মা গান্ধীর নামের মর্যাদা সত্ত্বেও যত যাই হোক বর্তমান কংগ্রেস কমিটির অনুগামীরা এখন সংখ্যায় কত হবেন, বামপন্থীদের সমর্থন বাদ দিলে? তাদের পিছনে সঙ্ঘবদ্ধ কৃষকরা নেই, সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকরা নেই, সঙ্ঘবদ্ধ যুবশক্তি নেই, সঙ্ঘবব্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা নেই, সঙ্ঘবদ্ধ সংখ্যালঘুরা নেই। অতএব অত অল্পসংখ্যক অনুগামী নিয়ে তাঁরা কি ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব করে কৃতকার্য হতে পারবেন? উত্তর অতি স্পষ্ট।

কাজেই, দক্ষিণপন্থীরা কতদিনে আপোস-মীমাংসায় পৌঁছতে পারবেন তার জন্য বসে না থেকে আমাদের উচিত এখন থেকে প্রাণপণ সে-জন্য তাদের সব প্রচেষ্টা বিফল করবার চেষ্টা করা। সেই উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে রামগড়ে একটি আপোষ-বিরোধী সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে। দেশের সব বামপন্থীরা এবং বামপন্থী সংগঠনগুলোকে ১৮ এবং ১৯ মার্চ সদলবলে একত্র হতে হবে। আপোস-বিরোধী সম্মেলন সফল করবার জন্য। আমাদের এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই এই সম্মেলন যদি সফল হয় তাতেই আপোসের সমস্ত প্রচেষ্টার অবসান ঘটাবে এবং তার ফলে কংগ্রেস এবং দেশ একটি জাতীয় বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে।

বিহার প্রাদেশিক কিষাণ সভা রামগড়ে একটি কৃষক সমাবেশের আয়োজন করছে, যাতে দু লক্ষ কিষাণ সমবেত হবেন। ফরওয়ার্ড ব্লকেরও একটি সারা ভারত অধিবেশন কংগ্রেসের সম্মেলনের সময়েই রামগড়ে আহ্বানের প্রস্তাব হয়েছে। সারা ভারত আপোস-বিরোধী সম্মেলন করার সেটা একটা ভাল উপলক্ষ হতে পারে, আমরা আশা করি সে-সম্মেলন হবে এবং সারা ভারতের বামপন্থীরা ও বামপন্থী সংগঠন সমূহ বিপুল সংখ্যায় সমবেত হবেন, যাতে এই আপোস-বিরোধী সম্মেলন সম্পূর্ণ সফল হয়। এই সম্মেলন আপোসের সমস্ত কথাবার্তার অবসান করবে এবং যে পচন বিবাদ তা বন্ধ করবে।

ইতিমধ্যে আমরা কি মহাত্মা গান্ধীর কাছে আবেদন করতে পারি না, ভাইসরয়ের প্রাসাদের অভিমুখে এই দীর্ঘ, ক্লান্তিকর যাত্রাগুলো বন্ধ করে ১৯২০ সালের মতো আবার দেশবাসীকে নেতৃত্ব দিন।

২৩

বঙ্গদেশের জটিল পরিস্থিতি

'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

যে-সব বন্ধুদের কংগ্রেসের কাজকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই, তাঁরা কংগ্রেসের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে বিমূঢ় বোধ করবেন। বিশেষ করে দেশের দূরান্তরে যে-সব সহযোদ্ধারা থাকেন, তাঁরা। সাধারণ বুদ্ধিতে বলে কংগ্রেস স্বাধীনতার পক্ষে; কংগ্রেস কমিটি এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্যেরা সকলেই রাজনৈতিক ব্যক্তি, জনগণের সেবক, যাঁরা ব্রত নিয়েছেন দেশের স্বাধীনতার। তা হলে এই পারিবারিক কলহ কীসের জন্য?

অন্য যাঁরা, যেন কিছুই জানেন না, সেইভাবে আবেদন জানান, "দয়া করে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আপনাদের বিবাদ মিটিয়ে ফেলুন এবং শত্রুর সামনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান।" যেন, ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে বিবাদ আমরাই আরম্ভ করেছি!

সবাই জানে লোকের স্মৃতি দুর্বল। অতএব অতীত ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করা প্রয়োজন।

১৯৩৯-এর এপ্রিল মাসে আমার সভাপত্বিতে যখন কলকাতায় নবগঠিত অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয় আমাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয় গান্ধীজির অমিশ্র ক্যাবিনেটের তত্ত্ব। আমাদের কার্যত বলা হয়, ভবিষ্যতে দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করতে পারবেন না। প্রকৃতপক্ষে অসহযোগ আরম্ভ হয়েছিল ১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারিতে। সভাপতি পদে আমার নির্বাচনের পরেই, যখন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা পদত্যাগ করেন।

শুধু যে আমরা অসহযোগের সম্মুখীন হলাম তাই নয়, আর কেউ নন, স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী আমাদের বললেন, ঠিক তখনই জাতীয় সংগ্রামের প্রশ্নই ওঠে না।

সেই সঙ্কটের সময়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বললেন, সমস্ত অভ্যন্তরীণ মতভেদ সত্ত্বেও আমার পদত্যাগ করাও উচিত নয়, কংগ্রেসের মধ্যে নতুন একটি সংগঠনও স্থাপন করা উচিত নয়, কারণ দিকচক্রবালে একটা আন্তর্জাতিক সঙ্কট ঘনিয়ে আসছে। আমি এই যুক্তি দেখালাম যে অদূর ভবিষ্যতে একটা আন্তর্জাতিক সঙ্কট যেহেতু অবশ্যম্ভাবী এবং কংগ্রেস যে সেই সঙ্কটের মোকাবিলা করতে পারবে সে-রকম কোনও আশাও নেই, আমাদের আর কালবিলম্ব না করে নিজেদের একটা সংগঠন স্থাপন করা উচিত। ওয়ার্কিং কমিটি যদি ব্যর্থ হয় সেই সংগঠনই আন্তর্জাতিক সঙ্কটের মোকাবিলা করবার শক্তি আমাদের দেবে।

এইভাবে ফরওয়ার্ড ব্লক এবং বামপন্থী সংহতি সমিতির জন্ম হল।

এবারে জুলাই ১৯৩৯-এর সভা শোভাযাত্রা ইত্যাদির কথা বলি। বামপন্থী ঐক্য সমিতির সমর্থনে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে গৃহীত দুটি কুৎসিত প্রস্তাবের প্রতিবাদে সারা ভারতে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই দুটি প্রস্তাবের একটিতে কংগ্রেসিদের ব্যক্তিগত অহিংস আইন অমান্য নিষিদ্ধ করা হয়। অন্য প্রস্তাবটিতে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলিকে সংশ্লিষ্ট কংগ্রেস কমিটির চেয়ে বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়। আমার নেতৃত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ৯ জুলাইয়ে সভা, শোভাযাত্রা ইত্যাদিতে যোগ দিয়েছিল।

এইটাকেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ওপর আক্রমণের ইশারা বলে ধরে নেওয়া

হল। ওয়ার্কিং কমিটির আদেশ বলে বিপিসিসি-র সভাপতি পদ থেকে আমি অপসৃত হলাম। এই আদেশ বিপিসিসি সহজে মেনে নিল না। এবং এক দীর্ঘ বাদানুবাদ আরম্ভ হল। এই বাদানুবাদের সময়ে পরিষ্কার বোঝা গেল বিপিসিসি-র এক সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ পক্ষ শীর্ষ নেতৃত্বের ভ্রুকুটি সত্ত্বেও আমার সঙ্গেই থাকবেন। এবং এই সংখ্যাগরিষ্ঠ পক্ষ বামপন্থী।

জুন ১৯৩৯-এর পর থেকে এই সব ঘটনা দেখিয়ে দিল যে সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে একটি প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেয় যেটি নৈতিক কারণে আপত্তি-জনক, সংখ্যালঘুরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে দ্বিধা করবেন না। অর্থাৎ প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন বিরোধীরা চুপ করে থাকার দরুণ দক্ষিণপন্থীরা যেমন বিনা বাধায় সে কাজ করতে পেরেছিলেন, এবার আর তা হবে না।

দক্ষিণপন্থীরা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন এখন থেকে সংখ্যালঘুদের জোর করে আনুগত্য এবং শৃঙ্খলা মেনে চলতে বাধ্য করতে হবে যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠেরা যখন শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোস করবেন তখন যেন সে-সব নেতা ভিন্নমত পোষণ করেন অর্থাৎ কোনও বেসুরো আর্তনাদ তুলতে না পারেন। প্রকৃতপক্ষে ওই একই কথা ভেবে সভাপতি পদে আমার পুনর্নির্বাচনের অমন প্রাণপণ বিরোধিতা করা হয়েছিল।

দক্ষিণপন্থীদের দুশ্চিন্তার আরও একটি কারণ ছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন রামগড়ের আগামী কংগ্রেস অধিবেশনে যাতে কোনও অসুবিধায় পড়তে না হয়, মার্চ ১৯৩৯-এর ত্রিপুরী কংগ্রেসের মতো অনিশ্চয়তায় সামনে যাতে না পড়তে হয়। তাঁরা ভাল করেই জানতেন বঙ্গদেশ রামগড় কংগ্রেসে একটি শক্তিশালী বামপন্থী প্রতিনিধিদল পাঠাবে, সম্ভবতঃ ৪৫০ জনের। যে কোনও মূল্যে সেটা বানচাল করতেই হবে।

অন্যান্য প্রদেশের কংগ্রেসের হাল হকিকতের সঙ্গে যাঁরা তেমন পরিচিত নন, তাঁদের ধারণা একমাত্র বঙ্গদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিই কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে লড়াই করছে। তার উল্টোটাই সত্য। ফরওয়ার্ড ব্লক যে হেতু একটি সর্বভারতীয় সংগঠন, দেশের প্রত্যেকটি কোনায় যা ঘটছে আমরা তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখি, তাই আমরা প্রামাণ্য সহকারে বলতে পারি, সাধারণভাবে বামপন্থীরা এবং বিশেষভাবে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রত্যেক প্রদেশে ওয়ার্কিং কমিটির আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। যেসব জায়গায় বামপন্থীদের এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের অবস্থা অপেক্ষাকৃত বেশি জোরালো সেখানে আক্রমণ আরও প্রবল। এবং বঙ্গদেশেই আমাদের অবস্থা সবচাইতে শক্তিশালী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি শীর্ষ নেতৃত্বের সবচেয়ে বিষ নজরে পড়েছে।

ওয়ার্কিং কমিটি একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বিপিসিসিকে খর্ব ও হতমান করবার জন্য; কোনও ফল হয়নি। তুচ্ছ অহংকারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ওপরে সংকীর্ণ দলীয় মনোভাবসম্পন্ন একটি নির্বাচন ট্রাইবুনাল চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ট্রাইবুনালের জন্য বিপিসিসি যেসব নিয়মকানুন বানিয়েছে, ওয়ার্কিং কমিটি তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে; অন্যান্য প্রদেশের ক্ষেত্রে কিন্তু তা করা হয়নি। তারপর শীর্ষ নেতৃত্ব বুঝতে পারল, নতুন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ্রাস করা যাবে না। তখন ওয়ার্কিং কমিটি মরিয়া হয়ে এক চরম ব্যবস্থা নিল, তারা বিপিসিসিকে কার্যত ডিঙিয়ে গিয়ে একটি পক্ষপাতদুষ্ট ''অ্যাড হক কমিটির'' হাতে তুলে দিল মার্চ ১৯৪০-এ অনুষ্ঠিতব্য রামগড় কংগ্রেসের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন পরিচালনা করবার সমস্ত দায়িত্ব।

তার মধ্যে আবার একটি মজার ঘটনা হিসাবে ওয়ার্কিং কমিটি একজন অডিটর পাঠাল বিপিসিসির হিসাব পরীক্ষা করবার জন্য। কিন্তু অত যে তিনি পরিশ্রম করলেন তার ফল হল অষ্টরম্ভা। ওয়ার্কিং কমিটিকে তাঁদের বঙ্গদেশের লোকেরা ভুল খবর পাঠিয়েছিলেন যে সারাভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের খরচপত্র নাকি চলছে বিপিসিসির এবং বঙ্গীয় সংসদীয় দলের টাকায়।

আমাদের মনে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে বামপন্থীদের ওপর এই অভিযোগ, এই আক্রমণ সমানে চলবে যতদিন দক্ষিণপন্থীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটা আপোসের আশা পোষণ করবেন। কিংবা আশা করবেন তাঁরা বিভিন্ন প্রদেশে আবার মন্ত্রীত্বে ফিরে আসতে পারবেন। এখন আমরা যা দেখছি তা হল ক্ষমতা দখলের রাজনীতি, এবং যেসব ঘটনা ঘটছে তাতে কারওই অবাক হওয়ার কোনও কারণ নেই। আত্মরক্ষার জন্য, কিংবা দক্ষিণপন্থীদের দিক থেকে আক্রমণের জবাবে আমরা যা কিছু করব, সবই সারা ভারত জুড়ে করা চাই। অন্য কোনও সংগঠন যদি না পারে, ফরওয়ার্ড ব্লক সর্বভারতীয় রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। সবাই যেন এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়, বামপন্থী বঙ্গকে বামপন্থী ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

অর্থাৎ বঙ্গদেশের যে সংগ্রাম সেটা সর্বভারতীয় স্তরের সংগ্রাম— প্রতিক্রিয়ার শক্তির সঙ্গে প্রগতির শক্তির সংগ্রাম, দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে বামপন্থার সংগ্রাম, আপসের নীতির সঙ্গে কোনও আপস নয়, এই নীতির সংগ্রাম। এই সংঘর্ষের অন্তিম মীমাংসা স্থানীয় অথবা প্রাদেশিক স্তরে হতে পারে না। মীমাংসা একমাত্র তখনই আসতে পারে যখন প্রতিক্রিয়া ক্ষমতাচ্যুত হবে, আপসের নীতি বাতিল হয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের নীতি গৃহীত হবে। সেদিন পর্যন্ত আমরা যেন দু'টি রণাঙ্গনে একসঙ্গে নির্ভীক সংগ্রাম চালিয়ে যাই। এই বিশ্বাসে অটল থেকে যে আমাদের জয় হবেই, অচিরেই হবে।

২৪

সাম্প্রদায়িক ঐক্যের অভিমুখে

'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন এসে পড়েছে এবং রামগড়ে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন হবে তখন সেখানে কী হয়, তার ওপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে। ওই কংগ্রেসে বামপন্থীদের সংখ্যালঘুত্ব হবে নৈরাশ্যজনক, তার কারণ বঙ্গদেশকে জোর করে উপস্থিত থাকতে না দেওয়া, এবং গত বছর সারা দেশে বামপন্থীদের ওপর কংগ্রেসে শীর্ষ নেতৃত্বের আক্রমণ। বাংলাদেশের প্রতিনিধি, যাঁরা স্বাভাবিক অবস্থায় বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিতেন, তাঁরা যে উপস্থিত থাকতে পারলেন না সেজন্য তাঁদের দুঃখ করবার কোনও কারণ নেই। তাঁরা যদি

পূর্ণশক্তিতে রামগড়ে উপস্থিত থাকতেন, তা হলেও তাঁরা কংগ্রেসের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ওপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারতেন না। বামপন্থীরা রামগড় কংগ্রেস নিয়ে মাথা না ঘামালেও আকাশ ভেঙে পড়বে না। প্রকৃতপক্ষে রামগড় কংগ্রেস যাতে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসে পরিণত হয় সেরকম কিছু তাঁরা করতে পারলে ভাল হয়।

এই বছর কংগ্রেসের মধ্যে কী হল তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে কংগ্রেসের প্যান্ডেলের বাইরে যেসব ঘটনা ঘটবে। বিহার প্রাদেশিক কিষাণ সভা এক বিশাল কিষাণ সমবেশের ডাক দিয়েছে, যাতে উপস্থিত থাকবেন পার্শ্ববর্তী সব জেলা থেকে আগত অন্তত দু'লক্ষ কৃষিজীবী। একটি সারা ভারত আপোস-বিরোধী সম্মেলনও মোটামুটি কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সময়েই রামগড়ে অনুষ্ঠিত হবে। সেই সম্মেলন যদি সফল হয় রাজনৈতিক গুরুত্বে সেটি কংগ্রেসকে ছাপিয়ে যেতে পারে। আর কিছু না হোক, কংগ্রেস হাইকমান্ড এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে একটা আপোসের যেসব প্রচেষ্টা এবং কথাবার্তা চলছে তার এতে অবসান হবে।

জাতির রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করবার জন্য কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, সেটা তাকে বন্ধ করতে বাধ্য করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। সে কাজটি করা হলে কংগ্রেসের সামনে একটি রাস্তাই খোলা থাকবে, আপোসহীন সংগ্রাম, যার ফলে আসবে পূর্ণস্বরাজ। ভারতের স্বাধীনতা যাঁদের লক্ষ্য তাঁরা তখন বাধ্য হবেন একটি জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ করতে।

জাতীয় সংগ্রামের জন্য দেশের সেই সমস্ত নরনারীকে আহ্বান করা হবে যাঁরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, যাঁরা দেশপ্রেমিক। সেই রণতূর্য একবার ধ্বনিত হলে, যাঁরা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষী স্বভাবতই সেই যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসবেন, এবং জাতি ধর্ম ভুলে স্বাধীনতার অভিমুখে যাত্রায় পা মেলাবেন।

স্বাধীনতার সংগ্রামে জনগণ যখন সহযোদ্ধা, তাঁদের মধ্যে একটা সহযোদ্ধা সুলভ ঐক্যের মনোভাব গড়ে ওঠে, এবং আত্মপ্রকাশ করে একটি নতুন দৃষ্টি, নতুন কল্পদৃশ্য। এই বিপ্লব সংঘটিত হলে ভারতীয়েরা এক নতুন জাতিতে, এক বিপ্লবী জাতিতে রূপান্তরিত হবে। তখন আজ যেসব প্রশ্নের সমাধান দুঃসাধ্য মনে হচ্ছে, সেসবের সমাধান সহজ হবে।

বর্তমান অবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার ব্যাধি নির্মল করে জনজীবনে সর্বাত্মক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়। কিন্তু সমগ্রজাতির মধ্যে একবার বৈপ্লবিক মনোভাব গড়ে তুলতে পারলে সেই কাজই কত সহজ হয়ে যাবে!

সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূর হলে তবেই সাম্প্রদায়িতা দূর হবে। অতএব যেসব ভারতীয়, মুসলিম, শিখ, হিন্দু, ক্রিশ্চান ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি কাটিয়ে উঠতে পেরেছে এবং প্রকৃত জাতীয়তাবাদী মনোভাব সম্পন্ন হয়ে উঠেছে, তাদের কর্তব্য সাম্প্রদায়িকতা ধ্বংস করা। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম করে, নিঃসন্দেহে সে প্রকৃতই জাতীয়তাবাদী।

যে কোনও যুদ্ধে বিশেষ দায়িত্ব বর্তায় সৈন্যবাহিনীর পুরোগামী অংশের ওপর। তেমনি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, তারও অগ্রবর্তী সৈনিকদের বিশেষ দায়িত্ব বহন করতে হয়, তাদেরই দায়িত্ব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা। যে সব হিন্দু এবং মুসলিম, শিখ এবং ক্রিশ্চান ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবেন, তাঁদের ওপরেই বিশেষ দায়িত্ব দিতে হবে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করবার। যখন তাঁরা সেই সমস্যার সমাধান করবেন, এবং সমগ্র জাতির কাছে সেই ঘোষণা করবেন, আবহাওয়া আপনা-আপনিই বদলে যাবে

এবং সাম্প্রদায়িকতার মৃত্যু-ঘণ্টা বেজে উঠবে। পুরোগামী সৈনিকেরা যদি পথ দেখান, শেষ পর্যন্ত জাতি তাঁদের অনুসরণ করবে।

কাজেই, কবে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করবে সেই আশায় কোলের ওপর হাত রেখে আমরা যেন বসে না থাকি। তার চেয়ে বরং আমরা দেখি প্রকৃত স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা যেন একতাবদ্ধ হয়ে এই সমস্যা সমাধান করেন। তাঁরা যদি সফল হন, প্রথম এবং সবচেয়ে দুরূহ বাধাটি পেরোন যাবে, এবং সাধারণ মানুষ সমগ্র জাতি, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। স্বাধীনতাপ্রেমী, স্বাধীনতার জন্য যারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত, অন্য কারও চেয়ে তারাই বেশি সহজে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান করতে পারবেন। অতএব, স্বাধীনতায় অগ্রগামী সৈনিক, তোমরা সকলে এগিয়ে চলো, আজকের দিনে তোমাদের যা ব্রত তাকে পূর্ণ করো।

২৫

জার্মানি সম্পর্কে দু'-একটি কথা

'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকা, ১৩ মার্চ ১৯৪০ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

মনে হচ্ছে আধুনিক যুদ্ধে গতি এবং চলমানতা নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। একটা পুরনো প্রবাদবাক্য আছে "Well begun is half-done", ঠিক ভাবে আরম্ভ করলেই অর্ধেক কাজ সমাধা হল। আজকের দিনে সেটাকে বদলে বলা উচিত, দ্রুত আরম্ভ করলেই অর্ধেক কাজ সমাধা হয়। জার্মানি এই শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে, যথাযথ ভাবে, অবিকল যেমন দরকার তেমনি ভাবে। রাইনল্যান্ডে সামরিক দখল কায়েম করতেই হোক, চেকোস্লোভাকিয়া অধিকার করে নেওয়াতেই হোক, আর স্ক্যানডিনেভিয়াতে সাম্প্রতিকতম অভিযানই হোক, প্রতিক্ষেত্রেই জার্মানি কাজ করেছে বিদ্যুৎগতিতে। শত্রুর স্নায়ুকেন্দ্রের ওপর হঠাৎ আক্রমণ করে কী হচ্ছে শত্রু বুঝবার আগেই তাকে সে অবশ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এই রকম হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ার রণকৌশলের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘকালের সযত্ন পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সযত্ন প্রস্তুতি। এই বিশদ পরিকল্পনা ও সযত্ন প্রস্তুতিতে জার্মানি সিদ্ধহস্ত।

সবিস্তার পরিকল্পনা এবং যথেষ্ট প্রস্তুতি ছাড়াও নির্ধারিত সময় অনুযায়ী কোনও পরিকল্পনা রূপায়িত করতে প্রয়োজন কর্মক্ষমতা, প্রাণশক্তি। এইসব গুণ নাৎসিদের যে আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাদের গতিশক্তি এবং চলমানতার জন্য তারা অবধারিতভাবে শত্রুকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়েছে, এবং অল্প আয়াসেই তাকে পর্যুদস্ত করেছে।

যত সহজে তারা চেকোস্লোভাকিয়াকে পর্যুদস্ত করে তাতে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। পোল্যান্ডকে তিন দিনে জিতে নেওয়া আরও বেশি বিস্ময়কর, কারণ পোল্যান্ডের খ্যাতি ছিল একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর জন্য, সেই সৈন্যবাহিনীর আধুনিক অস্ত্রসম্ভার আছে বলেও

লোকে জানত, এবং পোলরা নির্ভীক যোদ্ধা বলে খ্যাত ছিল।

রণকৌশলগত কারণে চেকোস্লোভাকিয়া অধিকার করা প্রয়োজন ছিল। পোল্যান্ডের ওপর আসন্ন আক্রমণের জন্য। পোল্যান্ড অধিকার করা, কিংবা অন্তত পোল্যান্ডের ''করিডর''টি অধিকার করা দরকার ছিল জার্মানির মূল অংশের সঙ্গে পূর্ব প্রুশিয়ার সংযোগের জন্য। অস্ট্রিয়া, ডানজিগ, মেমেল্যান্ড অধিকার অন্যান্য কারণের সঙ্গে বর্ণ এবং জাতীয়তার কারণে বুঝতে পারা যায়। কিন্তু বেচারা স্ক্যান্ডিনেভিয়ার বেলা কী বলা যাবে?

স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় দুটি ক্ষুদ্র দেশ ডেনমার্ক ও নরওয়ে কখনওই শক্তিশালী জার্মানির ভয়ের কোনও কারণ হয়নি। তা হলে কেন জার্মানি তাদের নিজেদের এলাকায় অখণ্ডতা ভঙ্গ করল? যে কারণটা দেখানো হয়েছে, সেটা হল ব্রিটেন নরওয়ের সমুদ্রে মাইন পুঁতে রেখেছে, এবং জার্মানি যা করেছে সেটা তারই প্রত্যুত্তর।

কিছু সেটা যথেষ্ট কারণ নয়। ব্রিটেন যদি নরওয়ের সমুদ্রে মাইন পুতে রেখে যাবে, জার্মানির উচিত ছিল প্রত্যুত্তরে তাকেই জোরালো আঘাত করা। তার বদলে সে ডেনমার্ক আর নরওয়েকে আক্রমণ করল কেন?

তার কারণ, জার্মানির একথা বিশ্বাস করবার কারণ ছিল, ব্রিটেন নরওয়ে ও ডেনমার্ক দখল করবার পরিকল্পনা করছিল, যেমন মহাযুদ্ধের সময়ে সে গ্রিসের স্যালোনিকা দখল করেছিল। কাজেই, তারা শত্রু কিছু করবার আগেই, নিজেরা দুই স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ দখল করে নিল। অধিকতর গতিশক্তি এবং চলমানতার জন্য তারা ব্রিটেনের আগেই সে কাজ করতে পারল। ডেনমার্ক দখল করা হল পিকনিকের মতো, নরওয়ে অধিকার করল তারা অবলীলাক্রমে। সযত্ন পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতির সাহায্যে সবই সমাধা হল বিদ্যুৎগতিতে।

ব্রিটেন যে ডেনমার্কের ফারো দ্বীপ দখল করেছে, তাতেই দেখা গেছে, ব্রিটেন ডেনমার্ক ও নরওয়ে অধিকার করবে জার্মানিদের এটা আগে থেকে ধরে নেওয়া ভুল হয়নি।

এখন ব্রিটিশ নৌবাহিনীর ওপর এবং ব্রিটিশ ভূখণ্ডের ওপর ভবিষ্যৎ আক্রমণ আরম্ভ করার জন্য ডেনমার্ক ও নরওয়ে অভিযান করা যেতে পারে।

জার্মানি ফ্যাসিস্ট হতে পারে সাম্রাজ্যবাদী হতে পারে নির্মম, নিষ্ঠুর হতে পারে, কিন্তু তাদের তিনটি গুণের প্রশংসা না করে উপায় নেই। তারা যে রকমভাবে পরিকল্পনা করে, সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নেয়। সময়সারণী অনুযায়ী কাজ করে। বিদ্যুৎগতিতে হানা দেয়, এই সমস্ত গুণ কি মহত্তর কোনও কাজ লাগানো যায় না?

২৬

রামগড় ভাষণ

১৯ মার্চ ১৯৪০। বিহারের রামগড়ে সারা ভারত আপোস বিরোধী সম্মেলনে সভাপতির ভাষণের পূর্ণ বয়ান

কমরেডগণ,

আজ রামগড়ে সারা ভারত আপোস-বিরোধী সম্মেলনে আলোচনাদিতে পৌরোহিত্য করতে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাকে আপনারা প্রভূত সম্মান দান করেছেন। সেই সঙ্গে যে দায়িত্ব আপনারা আমার স্কন্ধে স্থাপন করেছেন তাও বিশেষ গুরুভার। এই সম্মেলনে পৌরোহিত্য করা কোনওমতেই সহজ কাজ নয়। সে-কাজ আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং গুরুভার হয়ে দাঁড়ায়, যখন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হন স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর মতো একজন। স্বামীজির তূর্য নিনাদের আহ্বানেই আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি।

কমরেডগণ, আমার কর্তব্যে ত্রুটি হবে যদি বর্তমানের সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করবার আগে আমি এই সম্মেলন আয়োজনের দায়িত্ব যাঁরা পালন করছেন, তাঁদেরকে সাধুবাদ না জানাই। এই সম্মেলনের আয়োজনের জন্য তাঁদের যেসব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছে, আমি তার কিছু কিছু জানি। এবং সেই জন্যে আমি যা বলব তা সচেতনভাবেই বলব। বাধা ও বিঘ্নগুলি ছিল দু'রকমের। প্রথমত সম্মেলনের জন্য প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করবার পথে বাহ্যিক, বস্তুগত বাধা ছিল। দ্বিতীয়ত সম্মেলনের আয়োজকদের দেশব্যাপী ক্রমাগত শত্রুতাপূর্ণ প্রচারের সম্মুখীন হয়ে তাকে প্রতিহত করতে হয়েছিল। এই প্রচারের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর ও বেদনাদায়ক ছিল বামপন্থীদের (বলা উচিত তথাকথিত বামপন্থীদের) একটা অংশের খোলাখুলি এর কুৎসা করে এবং একে বানচাল করে এই সম্মেলন অসম্ভব করে তোলার দৃঢ়-সংকল্প প্রচেষ্টা। বস্তুত বিগত কয়েক মাসে ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে যে বামপন্থীদের কয়েকজন দক্ষিণপন্থীদের হয়ে সাফাই গাইতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু এইরকম ঘটনা ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। মানুষ যতদিন বাঁচে ততদিন শেখে, এবং যত দীর্ঘকাল বাঁচে ততই সে বুঝতে পারে, ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি করে, এই কথা যথার্থ।

কংগ্রেসের হয়ে যাঁরা ওকালতি করেন তাঁদের বক্তব্য, কংগ্রেস নিজেই একটা বিশাল আপোস বিরোধী সম্মেলন, এবং সেই কারণে সেরকম একটি সম্মেলন নিষ্প্রয়োজন। পাটনাতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশন হল, তাতে আমাদের সামনে তুলে ধরা হয় দেখাবার জন্য যে কংগ্রেস আপোস-বিরোধী নীতি গ্রহণ করেছে। এই যুক্তির শিশুসুলভ সরলতার তারিফ না করে পারা যায় না, কিন্তু রাজনীতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের কি অমন শিশুর সারল্য শোভা পায়?

পাটনার প্রস্তাবটি, বিশেষ করে তার শেষাংশ পড়লেই বোঝা যায়, এর মধ্যে এমন সব ফাঁক আছে যাতে প্রস্তাবটির প্রকৃত মূল্য হ্রাস পেয়েছে। প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়া মাত্র মহাত্মা গান্ধী এগিয়ে এসে বক্তব্য পেশ করলেন যে মীমাংসার জন্য ভবিষ্যতের আলাপ-আলোচনার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়নি। তারপরে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর দীর্ঘ বক্তব্যতে আমরা কোনও মতেই আশ্বস্ত হতে পারি না এই জেনে যে,

সংগ্রামের সময় আরম্ভ হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে বিগত দেড় বছর যেটা আমাদের হতবুদ্ধি করছে, বেদনা দিচ্ছে, তা হল, এক দিকে যেমন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা গরম গরম প্রস্তাব পাশ করছেন, বিবৃতি দিচ্ছেন, একই সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী কিংবা অন্য দক্ষিণপন্থী নেতারা এমন সব কথা বলছেন, বিবৃতি দিচ্ছেন, যাতে সাধারণ লোকের মনে অন্যরকম ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে। তা ছাড়া আরও একটা প্রশ্ন আছে, পাটনার প্রস্তাব কি আদৌ পাশ হত যদি না গত ছ'মাস ধরে বামপন্থীরা একটা চাপ সৃষ্টি করতেন?

সারা দেশ একটা স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থবোধহীন ঘোষণার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছে যে, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোসেরই জন্য আলাপ আলোচনার সমস্ত দরজা সজোরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে ঘোষণা কি করা হবে? হলে, কবে হবে।

কমরেডগণ, যাঁরা জোর দিয়ে বলেন কংগ্রেসই বৃহত্তর আপোস বিরোধী সম্মেলন, তাঁদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল, এবং সেই কারণে তাঁদের মস্তিষ্কে সজীবতা সঞ্চার করা প্রয়োজন। তাঁরা কি ভুলে গেলেন, যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী সিমলা চলে গিয়েছিলেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করেননি? এবং সেখানে গিয়ে মহামান্য বড়লাটকে তিনি জানালেন তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ায় গ্রেট ব্রিটেনকে নিঃশর্ত সাহায্য দানের পক্ষপাতী, তাও বিস্মৃত হয়েছেন? তাঁরা কি বোঝান না, মহাত্মা গান্ধী যেহেতু কংগ্রেসের একমাত্র সর্বাধিনায়ক, তাঁর ব্যক্তিগত মতামতের তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী? তাঁরা কি ভুলে গেছেন, যুদ্ধ বাধার পর থেকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি— আসল যে প্রশ্ন, আমাদের পূর্ণ স্বরাজ, ত্যাগ করে পাশ কাটিয়ে গিয়েছে, একটি মেকি সংবিধান পরিষদের দাবি তুলে? তাঁরা ভুলে গেছেন, কয়েকজন বড় বড় দক্ষিণপন্থী নেতা, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সমেত, ক্রমাগত সংবিধান পরিষদের গুরুত্বকে লাঘব করে যাচ্ছেন, এবং তাঁরা এমনকী, স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী এবং বর্তমান ভোটাধিকারের ভিত্তিকেও তাঁদের স্বপ্নের সংবিধান পরিষদের জন্যে স্বীকার করে নিয়েছেন? তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন, কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির পদত্যাগের পর, কয়েকজন কংগ্রেস মন্ত্রী মন্ত্রিত্ব আবার ফিরে পাওয়ার জন্য মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করছেন? তাঁরা কি ভুলে গেছেন, মহাত্মা গান্ধী গত ছ'মাস একভাবে কী মনোভাব প্রকাশ করে চলেছেন ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপসের ব্যাপারে? এবং তাঁরা কি জানেন না, গরম গরম কথার ধূম্রজালের আড়ালে আপসের জন্য আলাপ-আলোচনা চলেছে জোর কদমে?

আমাদের দুর্ভাগ্য ব্রিটিশ সরকার এখন আর কংগ্রেসকে কোনও গুরুত্ব দেয় না, এবং তাদের ধারণা জন্মেছে মূলে যতই গরম গরম কথা বলুন, কংগ্রেসিরা শেষ পর্যন্ত লড়াই করবার জন্য এগিয়ে আসবেন না। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর থেকে প্রস্তাব আর বিবৃতির কোনও অভাব হয়নি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কোনও কোনও সদস্যের মতে বিশ্ববাসী ওই প্রস্তাবে খুব বাহবা দিচ্ছে। কিন্তু বিশ্ববাসী যতই বাহবা দিক, ব্রিটিশরা তার দ্বারা আদৌ বিচলিত হচ্ছে না। তারা আসলে বাস্তব বোধসম্পন্ন জাতি। বিগত ছ'মাস আমরা কথা ছাড়া আর কিছুই তাদের সামনে তুলে ধরিনি, এর বিনিময়ে আমরা সেই জীর্ণ পুরাতন জবাবই পেয়েছি। যতদিন হিন্দু-মুসলমান সমস্যা থাকছে, পূর্ণ স্বরাজ অকল্পনীয়।

গত সেপ্টেম্বর থেকে ভারত এক অসাধরণ সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। মানুষের মনে এখন দ্বিধা, অস্থিরমতিত্ব। এই রোগ প্রথমেই দেখা দেয় নেতাদের মধ্যে, এবং তাঁদের মনোবলের অভাব একটা সংক্রামক ব্যাধির মতো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ব্যাধি প্রশমিত করতে দৃঢ় এবং ব্যাপক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সেই প্রচেষ্টা যদি ফলপ্রসূ করতে হয়,

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোনও সহযোগিতা না করতে যাঁরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তাঁদের এক সর্বভারতীয় সম্মেলনে আমাদের সক্রিয়তাকে সংহত করে আনতে হবে।

আমাদের ওপর যে সংকট এসে পড়েছে ভারতের ইতিহাসে সেটা বিরল হতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে এ নতুন কিছু নয়। ভারতে আমরা এক অপস্রিয়মাণ যুগের যবনিকা নামিয়ে আনছি, আর সেই সঙ্গে আহ্বান করে আনছি এক নতুন প্রভাতকে। সাম্রাজ্যবাদের যুগের অবসান হচ্ছে, এবং স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের যুগ আমাদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তাই ভারত আজ ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে উপনীত। সারা পৃথিবীর জন্যে যে উত্তরাধিকার অপেক্ষা করছে আমাদেরকেও তার অংশীদার হতে হবে।

পুরনো ফৌজ যখন নিজের ভারেই ভেঙে পড়ছে, তার ভগ্নস্তূপের মধ্য থেকে নতুনের উঠে আসার অপেক্ষা, তখন মানুষের মনে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এই অনিশ্চয়তার সময়ে আমরা যেন নিজেদের ওপর, আমাদের দেশবাসীর ওপর, কিংবা মানবজাতির ওপর বিশ্বাস না হারাই। বিশ্বাস হারালে সেটা হবে এক চরম দুর্বিপাক।

এইরকম সংকটে জাতির নেতৃবর্গের চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়। দুর্ভাগ্যের কথা, নেতৃবর্গ যে পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন, একমাত্র নেতাদের সেই ব্যর্থতার কারণগুলিকে বিশ্লেষণ এবং উদঘাটিত করেই আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারব এবং আমাদের ভবিষ্যতের প্রচেষ্টার এবং সাফল্যর ভিত্তি স্থাপন করতে পারব। কিন্তু সেই বিশ্লেষণ এবং উদঘাটন সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে বেদনাদায়ক হতে বাধ্য, যদিও তাকে এড়িয়ে যাবার কোনও উপায় নেই।

এখানে প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে অন্য স্থান এবং অন্য কাল থেকে একটি অনুরূপ দৃষ্টান্ত দিতে চাই। রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে যখন অক্টোবর বিপ্লব শুরু হল, বিপ্লবকে কোন পথে নিয়ে যাওয়া উচিত সে-বিষয়ে কারও কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বলশেভিকদের অধিকাংশ বরং অন্যান্য দলের সঙ্গে জোট বাঁধা যায় কি না সেইরকম চিন্তা করছিলেন। লেনিনকেই সমস্ত রকম জোট খারিজ করতে হল এবং স্লোগান তুলতে হল, সমস্ত ক্ষমতা থাকবে সোভিয়েতের হাতে। কে বলতে পারে, সন্দেহ এবং অনিশ্চয়তার এই সময়ে লেনিন যদি তাঁর সময়োপযোগী নেতৃত্ব না দিতেন, রাশিয়ায় ইতিহাস কোন দিকে মোড় নিত? শেষ পর্যন্ত দেখা গেল লেনিনের অভ্রান্ত সহজাত বোধ তাঁকে সঠিক ভবিষ্যৎ দৃষ্টি দান করেছে এবং তার ফলেই বিপর্যয় থেকে দেশ রক্ষা পেল। অন্য এক সময়ে স্পেনের ওপর যে দুর্ভাগ্য এসে পড়েছিল তা থেকে রক্ষা পেল।

আরেকটি বিপরীত দৃষ্টান্তের দিকে তাকানো যাক। ১৯২২ সালে ইতালি সব দিক থেকে সমাজতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত ছিল। শুধু প্রয়োজন ছিল একজন ইতালির লেনিনের। কিন্তু ঠিক সময়ে ঠিক মানুষটি এলেন না, এবং সেই সুযোগ সমাজতন্ত্রবাদীদের হাত থেকে বেরিয়ে গেল। সুযোগটি সঙ্গে সঙ্গে হস্তগত করলেন ফ্যাসিস্ট নেতা বেনিটো মুসোলিনি। তিনি মার্চ করে রোমে গিয়ে ক্ষমতা দখল করে নিলেন। ইতালির ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্য দিকে মোড় নিল, এবং ইতালি সমাজতান্ত্রিক না হয়ে ফ্যাসিস্ট হল। ইতালির নেতারা অনিশ্চয়তা ও অব্যবস্থিতচিত্ততার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন, তাই তারা ব্যর্থ হলেন। মুসোলিনির একটি সর্বোচ্চ গুণ ছিল, যার ফলে তিনি যে শুধু রক্ষা পেলেন তাই নয়, জয়মাল্য ভূষিত হলেন। তিনি জানতেন তিনি কী চান, এবং যা করা দরকার তা করতে ভয় পেতেন না। সেইটেই ছিল নেতৃত্বের মূল।

আজ আমাদের নেতারা কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না এবং সেই মনোভাব গ্রাস করেছে বামপন্থীদের একাংশকেও। জাতীয় ফ্রন্ট, শৃঙ্খলা এসব এখন শস্তা মুখের বুলি হলে দাঁড়িয়েছে। যার সঙ্গে বাস্তবতার কোনও সম্পর্ক নেই। এইসব মনোহারী স্লোগানের ধূম্রজালে আচ্ছন্ন হয়ে মনে হয়, তাঁরা ভুলে গেছেন যে এই মুহূর্তের সর্বোচ্চ প্রয়োজন এক নির্ভীক আপসহীন নীতি যা আমাদের পৌঁছে দেবে একটি জাতীয় সংগ্রামে। যা-কিছু তার জন্যে আমাদের শক্তি জোগাবে তাকেই গ্রহণ করতে হবে। যা কিছু আমাদের দুর্বল করবে তাকে পরিহার করতে হবে। যে ঐক্য আমাদেরকে দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকদের আঁচল ধরা করে তা কাম্য নয়। তার চোখে বরং আমরা কংগ্রেসকে বলতে পারি আপনারা উদারনৈতিক সঙ্ঘের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করুন, যদি যে কোনও অবস্থায় ঐক্যই বাঞ্ছনীয় হয়।

বর্তমান সংকটে সবচেয়ে বেদনাদায়ক যে ঘটনা সেটা হল, এতদিন পর্যন্ত যাঁদের আমরা বামপন্থী মনে করতাম তাঁদের মধ্যে। বিভেদ অদূর ভবিষ্যতেই অপেক্ষা করছে ভারতে বামপন্থীদের কঠিন পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় যাঁরা উত্তীর্ণ হতে পারবেন না তাঁরা যে মেকি-বামপন্থী তা সঙ্গে সঙ্গে জানা যায়। ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্যদেরও তাঁদের কাজে, তাঁদের আচরণে দেখাতে হবে যে তাঁরা প্রগতিপন্থী, গতিশীল। এমন হতে পারে, আমাদের সামনে যে কঠিন পরীক্ষা তাতে প্রমাণ হবে আজ যাঁদের দক্ষিণপন্থী বলে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রমাণ করবেন তাঁরাই প্রকৃত বামপন্থী, অর্থাৎ কাজে বামপন্থী— একথাই আমি বলতে চাইছি।

বামপন্থা বলতে আমরা কী বুঝি সে বিষয়ে এখানে দু'-একটি কথা বলা প্রয়োজন। বর্তমানে চলছে আমাদের আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পর্যায়। বর্তমান সময়ে আমাদের প্রধান কর্তব্য সাম্রাজ্যবাদের অবসান করা ভারতবাসীর জাতীয় স্বাধীনতা জিতে নেওয়া। স্বাধীনতালাভ হলে জাতীয় পুনর্গঠনের কাল আরম্ভ হবে, তখন সেটা হবে আমাদের আন্দোলনের সমাজতান্ত্রিক পর্যায়। আমাদের আন্দোলনে তারাই বামপন্থী বলে গণ্য হবেন যাঁরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম করবেন। যাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত হবেন, ইতস্তত করবেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, যাঁরা তার সঙ্গে আপস করতে চাইবেন, তাঁরা কোনও ভাবেই বামপন্থী হতে পারেন না। আমাদের আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে বামপন্থা আর সমাজতন্ত্র হবে সমার্থক, কিন্তু বর্তমান পর্যায়ে বামপন্থার এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার অর্থ একই হওয়া উচিত।

এই সময়ের সমস্যা, 'ভারত কি দক্ষিণপন্থীদের অধীনে থাকবে না চিরতরে বামপন্থার দিকে যাবে', এর উত্তর একমাত্র বামপন্থীরা নিজেরাই দিতে পারেন। তাঁরা যদি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি নির্ভয়, আপসবিরোধী নীতি গ্রহণ করেন, বিপদ-বাধা যাই আসুক বামপন্থীরা তা হলে ইতিহাস রচনা করবেন, ভারত বামপন্থী হবে।

যাঁরা এখনও আপসের কথা ভাবছেন আয়ারল্যান্ডের সাম্প্রতিক ইতিহাস এবং ইঙ্গ-আইরিশ চুক্তি থেকে তাঁদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের অর্থ হবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় সংগ্রাম অবিলম্বে দেশবাসীর মধ্যে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত হওয়া। কোনওদিক থেকেই কি সেটা বাঞ্ছনীয় হবে?

দেশে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস যদি করা হয়, ভারতীয় বামপন্থীদের শুধু সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই করলেই হবে না, তাদের হালের মিত্রদের সঙ্গেও লড়তে হবে। তার ফলে, অনিবার্য ভাবে জাতীয়তাবাদের সংগ্রাম রূপান্তরিত হবে ভারতীদের নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধে।

আমরা যা করবার, ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা না করে এখনই করি, যাতে দেরি হয়ে না যায়। স্বামী সহজানন্দ যুদ্ধের শিঙা বাজিয়ে দিয়েছেন, আমাদের সমস্ত শক্তি, সমস্ত সাহস নিয়ে আমরা যেন তাতে সাড়া দিই। এই সম্মেলন থেকে আমরা একটা সাবধান বাণী প্রেরণ করি সাম্রাজ্যবাদের কাছে এবং তাদের ভারতীয় মিত্রদের কাছেও। এই সম্মেলনের সাফল্য হোক আপোস এবং সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যুঘণ্টা।

এখান থেকে বিদায় নেওয়ার আগে সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি কার্যকর করবার জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম চালাবার জন্য আমরা একটি স্থায়ী ব্যবস্থা করব। সবাই এখন বুঝতে পারছেন যদি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি জাতীয় সংগ্রামের জন্য আহ্বান না জানায়, সে-কাজ অন্যদের করতে হবে। কাজেই এই সম্মেলনের পক্ষে সঠিক কাজ হবে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য একটি সাংগঠনিক ব্যবস্থা রচনা করা। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যদি এই সংকটের সামনে আমাদের আশা পূরণ না করে, আমি আশা করি এবং বিশ্বাস করি এই সম্মেলনে যে-কাজ আমরা করলাম তাতে সূত্রপাত হল সমগ্রজাতির সংগ্রামের দেশব্যাপী এক রণাঙ্গনে রূপান্তরিত হওয়ার।

'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'

বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা

'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকা, ৩০ মার্চ ১৯৪০ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

গত বছরের শেষ দিকে কলকাতায় হিন্দু মহাসভার বার্ষিক সর্বভারতীয় সম্মেলন হয়ে গেল। সম্মেলন হিসাবে সেটি বিরাট সাফল্য পেয়েছিল এবং মহাসভার নেতা, যাঁরা আশা করেছিলেন তাঁদের সংগঠন বঙ্গদেশে অগ্রগতি সাধন করবে, তাঁরা যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করেছেন। সে-সময়ে কানা-ঘুষোয় শোনা যাচ্ছিল, সম্মেলনটি কলকাতায় আসন্ন পুর-নির্বাচনের প্রস্তুতি ছাড়া আর কিছু নয়, এবং পরবর্তী ঘটনার সে-খবর মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি।

জনকল্যাণ এবং কলকাতায় উন্নয়নের জন্য, এবং নির্বাচন নিয়ে অকারণ সংঘাত ও সংঘর্ষ যাতে না হয় সে-উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা তাদের নিজ নিজ প্রতিনিধিদের মাধ্যমে একটি বোঝাপড়ায় এসেছে। সেই বোঝাপড়ার শর্তাবলি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সেই বোঝাপড়ার ভিত্তি ছিল এই যে, নির্বাচন পরিচালিত হবে সংযুক্ত পুরসভা নির্বাচন পর্ষদের নামে, এবং যাঁরা নির্বাচিত হবেন, তাঁরা কংগ্রেস পৌর সমিতিতে যোগ দেবেন। কংগ্রেস পুরসভা নির্বাচন পর্ষদ হিন্দু মহাসভার ছ'জন মনোনীত সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে নেবে, এবং যে-সমিতি প্রার্থীদের নির্বাচন করবে, তাতে দুটি সংগঠন

থেকেই সমসংখ্যক প্রতিনিধি থাকবেন। কিন্তু হিন্দু মহাসভা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন পরিচালনা করবে না, পুরসভাতেও স্বতন্ত্র হিন্দু মহাসভা ব্লক থাকবে না। ভবিষ্যতে যদি পুরসভার সামনে কোনও সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন আসে, কংগ্রেস পৌর সমিতি সেটাকে দলীয় প্রশ্ন মনে করবে না, সদস্যদের নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী ভোট দানের স্বাধীনতা দেবে।

উপরোক্ত বোঝাপড়া বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে মতভেদ দেখা দিল, এবং বোঝাপড়া খারিজ করতে হল।

হিন্দু মহাসভার সঙ্গে উপরোক্ত চুক্তির আগে নির্বাচনে আগ্রহী সমস্ত পক্ষকে বিশেষ করে হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগকে আমি আবেদন করেছিলাম, অন্যান্য প্রশ্নে যে-মতভেদই থাক, পৌর-বিষয়ে যেন তাঁরা সহযোগিতা করেন। এই বিষয়ে আমি কতকগুলো সংগঠনকে পত্রও দিয়েছিলাম। তাতে হিন্দু মহাসভা সাড়া দেওয়াতে স্বভাবতই আমরা সন্তুষ্ট হয়েছিলাম।

আমরা যেমন বুঝেছিলাম, ওই সাময়িক বোঝাপড়া সম্ভব হয়েছিল হিন্দু মহাসভার মধ্যে জাতীয়তাবাদী যাঁরা আছেন তাঁদের জন্য, বোঝাপড়া ব্যর্থ হল কারণ, হিন্দু মহাসভার মধ্যে যাঁরা রক্ষণশীল, যাঁরা প্রথম থেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়ার বিরোধী, তাঁরাই শেষপর্যন্ত বেশি প্রবল হয়ে উঠলেন।

পৌর বিষয়ে হিন্দু মহাসভার সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়ায় সারা দেশে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার চলেছে। এই প্রচারের অধিকাংশই অসত্য এবং খানিকটা ভুল বোঝার ফলে এসেছে। আমরা নিশ্চিত জানি, এই বোঝাপড়া যে-ভিত্তির ওপর স্থাপিত সেটা যথার্থ, এবং কংগ্রেসের নীতিসমূহের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। সেই বোঝাপড়া অনুযায়ী যদি যথাসময়ে কাজ করা হত, জাতীয়তাবাদের নীতি জয়যুক্ত হত, সাম্প্রদায়িকতার নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে কোনও কোনও রাজনীতিক এবং রাজনীতিকদের হয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের আমরা চক্ষুশূল। আমাদের আক্রমণ করতে তাঁরা যে কোনও অজুহাত ব্যবহার করতে প্রস্তুত, কিন্তু এত দেরি হয়ে যাওয়ার পরেও আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই, যে ভিত্তিতে আমরা হিন্দু মহাসভার সঙ্গে একটা ক্ষণস্থায়ী বোঝাপড়ায় পৌঁছেছিলাম সেই ভিত্তির ওপর অন্য যে কোনও সংগঠনের সঙ্গে একটা অনুরূপ বোঝাপড়ায় পৌঁছনো যায়।

সাম্প্রতিক সংশোধিত খসড়া আইনের ফলে যে নতুন কলিকাতা পৌর আইন চালু হয়েছে, যে আইন অনুযায়ী সদ্য নির্বাচন হল, তা এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যার ফলে বিপদ হতে পারে। পুরসভার ভারতীয় সদস্যরা, হিন্দু মুসলমান উভয়ই যদি ঐক্যবদ্ধ না হন, পুরসভা তা হলে ব্রিটিশদের হাতে চলে যাবে। মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ পুরসভার ওপর আধিপত্য করতে আরম্ভ করবেন, বঙ্গীয় বিধানপরিষদে যেমন তাঁরা আধিপত্য করে আসছেন।

কংগ্রেসের মূলনীতিগুলির প্রতি নিষ্ঠাবান থেকেও পৌরবিষয়ে হিন্দু মহাসভার সহযোগিতা চেয়ে আমরা সেই বিপর্যয় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। আমাদের আশা পূর্ণ হয়নি, তা ছাড়া হিন্দু মহাসভার কয়েকজন নেতা, যাঁদের প্রতি আমরা প্রভূত ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা পোষণ করি, তাঁরা এবং কতিপয় হিন্দু মহাসভা কর্মী নির্বাচনের ব্যাপারে যে কৌশল অবলম্বন করেছেন, সেটা আমাদের দুঃখ ও বেদনার কারণ হয়েছে। হিন্দু মহাসভা লড়াইয়ে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখেনি।

উপরন্তু হিন্দু মহাসভার প্রার্থীদের কেউ কেউ প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন কাউন্সিলরদের ব্রিটিশ ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সঙ্গে সহযোগিতা করে পুরসভার সংযুক্ত দল ভেঙে দিতে।

তাঁদের মধ্যে কয়েকজন পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন এবং ভবিষ্যতে তাঁরা কী রকম আচরণ করবেন সহজেই অনুমান করা যায়। পুরসভাকে ব্রিটিশ আধিপত্য থেকে রক্ষা করার চেয়ে কংগ্রেসের ক্ষতি করার আগ্রহ তাঁদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

এখন দেখা বাকি আছে, পুরসভায় অন্য কোনও গোষ্ঠী কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই করার চেয়ে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিরোধ করতে অধিকতর আগ্রহ প্রদর্শন করে কি না।

হিন্দু মহাসভার উপরোক্ত কাজ সে দলের ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। রাজনীতিতে তাঁরা এগিয়ে যেতে চান এবং বঙ্গদেশে রাজনৈতিক নেতৃত্ব লাভের চেষ্টা করতে চান, কিংবা অন্তত বঙ্গদেশের হিন্দু, যাঁরা দেশে জাতীয়তাবাদের মেরুদণ্ড, তাঁদের নেতৃত্ব পেতে চান। প্রকৃত হিন্দুমহাসভার সঙ্গে আমাদের কোনও বিবাদ অথবা সংঘাত নেই। কিন্তু যে হিন্দুমহাসভা বঙ্গীয় রাজনীতির কংগ্রেসের স্থান অধিকার করতে চান, এবং সেই উদ্দেশ্য এর মধ্যেই আমাদের ওপর আক্রমণ শুরু করেছেন, তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, সে যুদ্ধ সবে আরম্ভ হল।

২৮

রামগড়ের আহ্বান

‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ পত্রিকা, ৬ এপ্রিল ১৯৪০ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

রামগড়ে ১৯ এবং ২০ মার্চ, সেখানে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে সারাভারত আপোস বিরোধী সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের পূর্ণ বয়ান আমরা গত সংখ্যায় প্রকাশ করেছি। দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসিদের বিরোধিতার মুখে দাঁড়িয়ে আমরা সম্মেলনের আয়োজন করেছিলাম। একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরা সেই সম্মেলন বানচাল করবার জন্য নীতিবিগর্হিত পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও সেই সম্মেলন সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে, শুধু যে তাতে যোগদানকারীদের সংখ্যা অবিশ্বাস্য ছিল, কংগ্রেসকেই ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তাই নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সমস্ত প্রকৃত সাম্রাজ্যবিরোধীদের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মঞ্চ সেখানে তাঁরা পেয়েছিলেন।

২০ মার্চ রামগড়ের আপোসবিরোধী সম্মেলনে গৃহীত মূল প্রস্তাবটি ছিল আমাদের জাতীয় সংগ্রামের প্রসঙ্গ সংক্রান্ত। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় বিপুল হর্ষোল্লাস ও উৎসাহের মধ্যে। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে, এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিউগল বেজে ওঠে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ আনন্দে উন্মত্ত হয়ে এক দৈব প্রেরণায় উঠে দাঁড়ান। সে এমন এক দৃশ্য মানুষ যা চিরকাল মনে রাখবে।

রামগড় আমাদের আহ্বান করেছে এবং আমরা প্রত্যেকে তাতে সাড়া দিয়েছি, আমাদের সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে গেছে। এখন সমগ্র জাতিকে সে সংগ্রামে যোগ দিতে হবে।

৬ এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহের উদ্‌যাপন আরম্ভ হবে। ভারতের ইতিহাসে সেই সপ্তাহটি লজ্জা আর অপমানের সপ্তাহ, কারণ ১৯১৯ সালে সেই সপ্তাহে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু প্রায়শই একটি পরাধীন জাতিকে তার লজ্জা ও অপমানের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়, তার আত্মমর্যাদা ও আত্মহননের বোধ জাগিয়ে তুলবার জন্য।

এই বছর জাতীয় সপ্তাহ একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করবে কারণ আপোসবিরোধী সম্মেলন আদেশ দিয়েছে। ৬ এপ্রিল সমস্ত স্থানীয় সংগ্রামকে তীব্রতর করতে হবে, সর্বভারতীয় রণাঙ্গনে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সংগ্রাম আরম্ভ করতে হবে। আজ আমরা জাতীয় সংগ্রামের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি, নবজীবন ও নতুন অনুপ্রেরণায় আমাদের ধমনীতে রক্ত দ্রুতবেগে ধাবমান।

খাদের মুখে যারা এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের জন্য ভবিষ্যতের গর্ভে কী আছে কে জানে? তারা কি স্বরাজ লাভ করবে, না করবে না? তারা কি বিদেশের শত্রু এবং দেশের নৈরাশ্যবাদীদের পরাস্ত করতে পারবে, না পারবে না?

স্বরাজ তারা জয় করতে হয়তো পারবে, হয়তো পারবে না, কিন্তু একটা বিষয় নিশ্চিত। অন্যেরা যখন পারেনি তখন তারা নিজেদের কর্তব্য করতে পেরেছিল, এই সন্তোষ তাদের থাকবে। দেশে এবং বিদেশে তারা ভারতীয় জাতির সম্মান উঁচু করে ধরে রাখবে, উপরন্তু দেশের বামপন্থী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ তারা নিশ্চিত করবে। একটি আঘাতেই স্বাধীনতা আসুক আর না আসুক, দক্ষিণপন্থার কবর রচিত হবে চিরতরে। এবং বামপন্থা দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হবে ভারতভূমিতে।

যুদ্ধের শিঙা বেজে উঠেছে। পাশায় দান ফেলা হয়ে গেছে। এমন সময় কেউ যেন দ্বিধা না করে, আমাদেরকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে ক্রমাগত, অনাগত ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে এনে দেবে যা আমরা যুগ যুগ ধরে চেয়ে এসেছি, স্বাধীনতা ও সাম্য, শান্তি ও অন্ন এবং সবার ওপরে যা পরম কাম্য সেই স্বর্গীয় আনন্দ।

২৯

আমরা এগিয়ে চলেছি

'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকা, ১৩ এপ্রিল ১৯৪০ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

রাজনৈতিক অচলাবস্থার অবসান হয়েছে। রামগড়ের আহ্বানের ফল পাওয়া যাচ্ছে। যে বিউগল সেদিন বেজে উঠেছিল, সারা দেশে তার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে, দেশের হৃদয় থেকে তার সাড়া পাওয়া গেছে। গত সপ্তাহে দিনের পর দিন সংবাদপত্র পড়ে আমরা রোমাঞ্চিত হয়েছি। এখন আর আমরা শুধু চিন্তা ভাবনা, শুধু সমালোচনা করছি না, এখন আর আমরা

স্থানীয় সংগ্রাম, না জাতীয় সংগ্রাম তাই নিয়ে অন্তহীন আলোচনা আর চুলচেরা বিশ্লেষণে রত হয়ে নেই। আমরা এগিয়ে চলেছি। অন্ধ্রের অন্নপূর্ণাইয়া, মহারাষ্ট্রের সেনাপতি বাপট, বম্বেতে প্রাক্তন অসামরিক সরকারি কর্মী কামাথ, মহারাষ্ট্রের কৃষকনেতা ভুসকুটে, মাদ্রাজের অধ্যাপক রঙ্গ, বঙ্গীয় কংগ্রেস এবং বঙ্গীয় ফরওয়ার্ড ব্লকের সচিব যথাক্রমে আশরাফুদ্দিন চৌধুরী ও সত্যরঞ্জন বক্সী এবং আরও অনেক কমরেড, যাঁরা অধিকাংশ ফরওয়ার্ড ব্লক এবং কিষাণ সভার সদস্য, এঁরা সবাই জেল খাটছেন। তাঁরাই প্রথম এগিয়ে যান। তাঁদের সম্মান জানাই।

এখন সমস্যা, আমরা কী করব? ১৯৩০ সালে যখন আমরা বিপ্লবের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছিলাম তখন কোনও কোনও নৈরাশ্যবাদী, যাঁরা ভালকিছু দেখতে পান না, যাঁদের আমরা অতি-বামপন্থী মনে করতাম, তাঁরা আন্দোলন থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে রেখেছিলেন, আন্দোলনে যোগ দেননি এই বলে, যে কংগ্রেসিরা প্রতিবিপ্লবী। যে-সব পুরুষ ও নারী বিদেশিদের আইন-শৃঙ্খলা অমান্য করছিলেন, কারাগারের জীবনের দুঃখকষ্ট অগ্রাহ্য করছিলেন, পুলিশের লাঠির সামনে দাঁড়াচ্ছিলেন, তাঁদের প্রতিবিপ্লবী বলা সরলমতি ভারতীয়দের পক্ষেও বিশ্বাস করা কঠিন হয়। আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। দেশের অগণিত মানুষ তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছিলেন, অতি-বিপ্লবী জনসাধারণ এগিয়ে চলছিল অতি-বামপন্থীদের একলা ফেলে।

আজ সেই একই অতি-বামপন্থীরা সেই একই পরিস্থিতিতে পড়েছেন যাঁরা অন্ধভাবে মতবাদকেই আঁকড়ে থাকেন, যাঁদের রাজনীতি পুঁথি-সর্বস্ব, একেবারে তাঁদের মতোই এঁরা, যে সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে তা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন। এই নীতিতে তাঁরা নিজেদেরই ক্ষতি করছেন, আর কারও নয়। একতালে পা ফেলে আমরা এগিয়ে যাব, তাঁদের উপেক্ষা ও বাধাদান সত্ত্বেও। এ হল কাজের সময়, শব্দের অর্থ নিয়ে কথার লড়াই ও চুলচেরা বিচারের সময় নয়।

দেশের বিভিন্ন ভাগ থেকে যেসব খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখছি সর্বত্র আমাদের কাজকর্ম অবিমিশ্র সাফল্য লাভ করছে। কোনও কোনও জায়গায় গান্ধীবাদীরা কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী এবং জাতীয় ফ্রন্টের সদস্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, আমাদের কাজ ব্যাহত করবার জন্য, কিন্তু তাঁরা শোচনীয়ভাবে বিফল হয়েছেন। আজ আর কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে, জনসাধারণ আমাদের সঙ্গেই আছেন।

এ কি ভাগ্যের পরিহাস নয় যে, জাতীয় ফ্রন্ট গোষ্ঠী জাতীয় সংগ্রামে যোগ দিতে এগিয়ে আসছে না? স্থানীয় সংগ্রামকে তাঁরা তীব্রতর করতে পারতেন এবং তাঁদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করতে পারতেন, অন্যদের, যেমন কিষাণসভা ও ফরওয়ার্ড ব্লককে তাঁদের ইচ্ছে মতো কাজ করতে দিয়ে। কিন্তু মনে হচ্ছে তাঁদের বর্তমান নীতি এই যে, নিজেরাও কিছু করব না অন্যকেও কিছু করতে দেব না। তাঁরা নিজেরাও সংগ্রামে যোগ দেবেন না অন্যদেরও যোগ দিতে দেবেন না। ১৯৩০ সালে যাঁরা জাতীয় সংগ্রাম যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের ধিক্কৃত করা হয়েছিল প্রতি-বিপ্লবী বলে, আজ নিন্দা করা হয় জাতীয় ঐক্য বিনষ্টকারী বলে। অতি-বামপন্থীদের এখনও শোনা বাকি আছে যে, সেই ঐক্যই প্রকৃত, এবং রক্ষা করা প্রয়োজন, যা আমাদের কাজের দিকে, সংগ্রামের দিকে নিয়ে যাবে। যে ঐক্য আমাদের কর্মক্ষমতা হরণ করে সে ঐক্য অর্থহীন অকার্যকর, তাকে বলা যায় কবর ঐক্য।

যত সময়ে এগিয়ে যাচ্ছে, উদ্দীপনা এবং প্রেরণা প্রবল হচ্ছে, যেন আমাদের ব্রত পূরণে

সহায়তা করার জন্যই সরকার প্রথম দিনেই, এবং শেষ দিনেও আমাদের ওপর আঘাত করেছে। যত তারা আঘাত হানবে, যত কঠোর আঘাত তারা হানবে, তত প্রবল হবে প্রতিক্রিয়া, তত প্রবল সাড়া জাগবে। দেশবাসীকে নিপীড়ন করে দমিয়ে দেওয়ার দিন চলে গেছে।

আমরা যখন এগিয়ে যাব, অন্য অনেকে আমাদের অনুসরণ করতে বাধ্য, যদিও একটু শ্লথ গতিতে। দক্ষিণপন্থীরা সত্যাগ্রহ সমিতি, সংগ্রাম সমিতি প্রভৃতি গঠন করছেন এবং নেতারা শার্ট ও হাফ প্যান্ট পরে প্যারেড করছেন। এসবই ভাল কথা, কিন্তু এই ভূমিকা আর কত দিন চলবে? আসল নাটক কবে আরম্ভ হবে? শুধু যদি রামগড়ে সে-নাটক আরম্ভ হত, আমরা দক্ষিণপন্থীদের পিছন পিছন যেতাম, আগে আগে নয়। কিন্তু নিয়তি আমাদেরকে সংগ্রামের পুরোভাগে স্থাপন করেছে, জাতীয় স্বাধীনতা বাহিনীর অগ্রগামী ভূমিকা দিয়েছে। এই ভূমিকা যে কোনও ব্যক্তির পক্ষে সম্মানের এবং তার জন্য কোনও ত্যাগই বেশি নয়, সে-ভূমিকা পালনের জন্য যা প্রয়োজন।

দামামা বেজে উঠুক বিউগল ধ্বনিত হোক, যুব হৃদয়ে জীবনের স্পন্দন দ্রুততর হোক, ধমনীতে রক্ত নৃত্য করে উঠুক। মুক্তির প্রহর নিকটে আগত, আমাদের শুধু আমাদের কর্তব্য করতে হবে, মূল্য দিতে হবে। যুগযুগান্তের নিদ্রা থেকে ভারত জেগে উঠেছে। মহারণে যোগদানের জন্য তার পুত্র-কন্যারা বেরিয়ে পড়েছে। সকলে সমব্যথী হয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিন, তাদের সাহায্য করুন।

এখন চূড়ান্ত পরীক্ষা চলছে, ভূষি আর শস্য দক্ষিণ এবং বামপন্থীদের ঝাড়াই করে আলাদা করা হচ্ছে। এই পরীক্ষার শেষে বামপন্থীরা জয়যুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসবেন। দক্ষিণপন্থীদের পতনের অর্থ হবে নরমপন্থার, প্রতিক্রিয়ার, আপোসপন্থার পতন। এবং বামপন্থা যখন জয়যুক্ত হবে পৃথিবীর কোনও শক্তি আর তার জন্মগত অধিকার, স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হতে পারবে না।

৩০

স্বামীজির বাণী

‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ পত্রিকা, ২০ এপ্রিল ১৯৪০ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

ব্রিটিশ সরকার অন্য যে কোনও সাম্রাজ্যবাদী সরকারের মতো, নির্মম, নিজের সংকল্পে অটল, কাউকে রেহাই দেয় না।। প্রয়োজন বোধ করলেই আঘাত করতে তারা ইতস্তত করে না, মানুষকে তারা কদাচিৎ সম্মান দিয়ে থাকে। শাসকদের ক্রোধ যদি কারও ওপর পড়ে, দেশের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তিটিকেও তার জন্য দুঃখ ভোগ করতে হয়।

আমাদের এই দেশে স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী এমন একটি নাম, যাঁর প্রভাব অপরিসীম।

তিনি ভারতে কিষান আন্দোলনের অবিসম্বাদিত নেতা, আজ সর্বসাধারণের চোখে দেবতার মতো, লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখে বীরের আসনে উপবিষ্ট। এ আমাদের সৌভাগ্য যে রামগড়ে সারা ভারত আপোস-বিরোধী সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে আমরা তাঁকে পেয়েছিলাম। ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষে এ অত্যন্ত গৌরব এবং সম্মানের বিষয়, আমরা তাঁকে বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম সর্বাগ্রগণ্য নেতা হিসাবে এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের নিজেরও একজন বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক হিসাবে পেয়েছি। বস্তুত স্বামীজির পদাঙ্ক অনুসরণ করে কিষান আন্দোলনের বহুসংখ্যক প্রথম সারির নেতা ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছেন।

অবশেষে তাঁর ওপরে অত্যাচারীর খড়্গ নেমে আসে, এবং আজ সকালে পাটনাতে ভারত প্রতিরক্ষা আইন দ্বারা তিনি গ্রেপ্তার হন। গতকাল তিনি কলকাতায় ছিলেন এবং আমরা অনেকক্ষণ ধরে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলি। তখন আমরা জানতাম না পাটনায় তাঁর জন্য গ্রেপ্তারি পরওয়ানা অপেক্ষা করছে। গত রাত্রিতে তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন এবং আজ সকালে তাঁকে আটক করা হয়।

তাঁর কলকাতা ত্যাগের আগে আমরা একটি যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করি, সারা দেশে মে-দিবস উপযুক্তভাবে পালনের জন্য আবেদন জানিয়ে, এই সংখ্যায় বিবৃতিটি দ্রষ্টব্য।

তাঁর গ্রেপ্তারের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমরা সিদ্ধান্ত নিই, তাঁর গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ২৮ এপ্রিল তারিখটি সারা-ভারত স্বামী সহজানন্দ দিবস হিসাবে পালন করা যাবে। আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি, সেই দিনটি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আমাদের জবাব হিসাবে যথোপযুক্তভাবে পালিত হবে।

আমরা স্বামীজিকে, তাঁর গ্রেপ্তার ও কারাবাসের দ্বারা তিনি যে উচ্চ সম্মান লাভ করেছেন, তার জন্য অভিনন্দিত করি। বস্তুত সরকারকে তিনি যে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য করতে পেরেছেন, তার জন্য তাঁকে ঈর্ষা করতে ইচ্ছা হয়।

স্বামীজির গ্রেপ্তারকে স্বাগত জানানো উচিত, তাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ অচলাবস্থা ভেঙে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত হবেন। আর হাত গুটিয়ে বসে থাকার সময় নেই, কাজ করবার সময় এসেছে, এখনই কাজে নামতে হবে।

স্বামীজি কারাবাসের অন্তরালে চলে গেলেন, কিন্তু একটা কর্তব্য তিনি আমাদের জন্য রেখে গেলেন। তাঁর কাছ থেকে আমাদের জীবনের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, সেবা ও ত্যাগের শিক্ষা, সঠিক রাজনৈতিক সহজাত বোধ, বিপ্লবী চেতনা, গতিশীল সমাজতন্ত্রবাদ। তিনি মূলত কাজের মানুষ এবং গ্রেপ্তারের সময় তিনি দেশবাসীর কাছে আবেদন করেন বিলম্ব না করতে, করছি-করব করে সময় নষ্ট না করতে, এখনই কাজ আরম্ভ করতে।

স্বামীজির গ্রেপ্তার নবীন ভারতের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ ছাড়া আর কিছু নয়, সেই চ্যালেঞ্জ এখন আমাদের গ্রহণ করতে হবে, ব্রিটিশ সরকার দেখুক, অবহিত হোক, দেশ ঐক্যবদ্ধ ভাবে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।

'আমাকে স্বাধীনতা দাও অথবা মৃত্যু'— এই পবিত্র প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে আমরা এগিয়ে চলব, দ্বিগুণ প্রাণশক্তি এবং সংকল্প নিয়ে। সব বাধা বিঘ্ন তখন দূর হয়ে যাবে, স্বাধীনতা উদিত হবে আমাদের এই হতভাগ্য দেশে।

৩১

নতুন শক্তি প্রদর্শন

'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকা, ২৭ এপ্রিল ১৯৪০ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

লন্ডন আবার মুখ খুলেছে। তবে সেদিন আর নেই যখন ভারত সচিব কী বলেন তার জন্য ভারতবাসী সাগ্রহে কান পেতে থাকত। সেই কারণে লর্ড জেটল্যান্ডের ঘোষণা এবং তাঁর বক্তৃতায় প্রকৃত বয়ান আমাদের দেশের লোকের মনে কোনও আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি। টেমসের তীর থেকে যেসব কল্পনাশক্তি বর্জিত আমলাতান্ত্রিক ভাষণ সচরাচর প্রচারিত হয়ে থাকে, তারই একটি বলে এটিকেও লোক অবহেলাভারে অগ্রাহ্য করেছে।

ব্রিটিশদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ভারতীয় পরিস্থিতি একটা অচলাবস্থায় পৌঁছেছে মনে হতে পারে। কিন্তু এই অচলাবস্থার পরিস্থিতি কে করতে পারে এবং কীভাবে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কি তা করতে পারবে? স্পষ্টতই তার সে এগিয়ে চলার শক্তি নেই, কারণ, এরকম একটা সংকটের মুখোমুখি হওয়া এবং ঠিকমতো তার নিরসন করার জন্য যে ন্যায়বিচার বোধ এবং বিপ্লবী চেতনার প্রয়োজন তার তা নেই।

সাবেকি সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা সব সময়ে একটা বাঁধা পথ ধরে চলে, নতুন পথের সন্ধান সে কখনওই করতে পারে না। সেই কারণেই একবার অবক্ষয় আরম্ভ হলে সাম্রাজ্যবাদের পতন রোধ করা অত কঠিন হয়ে পড়ে। পুরনো অস্ট্রোহাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের কথা মনে পড়ে, মহাযুদ্ধের পর যা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল। ১৯১৪-র পরেও মহাযুদ্ধ যখন আরম্ভ হয়, সেই সাম্রাজ্য হয়তো রক্ষা করা যেত, যদি তার শাসকেরা সাহস করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন, চেক, সার্ব, ক্রোয়াট, স্লোভিন প্রভৃতি নিপীড়িত জাতি সমূহের যুক্তিসংগত দাবিগুলি মেনে নিতেন। সাম্রাজ্যবাদ— বিশেষত সাবেকি সাম্রাজ্যবাদ চিরকালই নিজেকে বদলাতে অসমর্থ।

কিন্তু এই নিয়ে আমাদের দুঃখ করার কিছু নেই। এটা সত্য যে, প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদ তার স্থিতিস্থাপকতা হারিয়ে ফেলে, পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার এই যে অক্ষমতা, শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা যাবে তাতে উপকারই হবে, যদিও এমনিতে যা হওয়ার কথা, তার চেয়ে আমাদের এই মুহূর্তের কাজ বেশি কঠিন হয়ে পড়তে পারে।

বিগত চার বছর ধরে, বিশেষ করে বিগত আট মাস, সাবেকি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর তুলনায় জার্মানির মতো একটি নতুন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গতিশীলতা অনেক বেশি। এই গতিশীলতা ব্যতীত, সোভিয়েত-জার্মান চুক্তির মতো বৈপ্লবিক, অশ্রুতপূর্ব উদ্যোগ সম্ভব ছিল না। এবং এই চলমানতা ছাড়া, সমস্ত পৃথিবীকে বিস্মিত করে দেওয়া, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ওপর আকস্মিক আক্রমণও সম্ভব ছিল না।

গতিশীলতা জীবনের লক্ষণ, বেড়ে ওঠার লক্ষণ। তবে সেই গতিশীলতাই স্বাস্থ্যকর, বাঞ্ছিত, যার মধ্য দিয়ে প্রগতিশীল চিন্তার প্রকাশ দেখা যায়। আজকের দিনে, এই শেষোক্ত গতিশীলতা ভারতের বিশেষ প্রয়োজন।

শুধু যে ব্রিটিশ সরকারই এখন অযথা কালক্ষেপ করছে তাই নয়, সেই একই কাজ ওয়ার্ধাও করছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, অনিশ্চয়তাও নিষ্ক্রিয়তার কুয়াশা যার মধ্যে

আমরা এখন আছি, সেটা কেটে কবে বেরিয়ে আসবে জানি না। বোধহয় তাঁরাও জানেন না! গান্ধীবাদী কংগ্রেস মহাত্মার দরজায় অধৈর্যে দাঁড়িয়ে আছে। তবে 'সেই অন্তরের আলো' রাজকোটে যেমন আমাদের নিরাশ করেছিল, আবার যদি তাই করে? রাজকোটে সে-আলো যখন আমাদের নিরাশ করল, তার পরিবর্তে যে-আলো জ্বলল, অর্থাৎ নতুন রণকৌশল আত্মপ্রকাশ করল মানুষ সেটা পছন্দও করল না, গ্রহণ করল না। বর্তমান সংকটের ক্ষেত্রেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে পারে।

কংগ্রেসের সামনে ১৯ এবং ২০ মার্চ রামগড়ে সারা ভারত আপোসবিরোধী সম্মেলনের অধিবেশনের পরে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে কিছু কর্মতৎপরতা দেখা গেছে। সত্যাগ্রহের একটি শপথ রচিত হয়েছে এবং সমস্ত কর্মসমিতির সদস্যদের এবং সমস্ত কংগ্রেস সংগঠনকে সেই শপথ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। অন্যথায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই শপথ নেওয়া আমাদের পক্ষে কোনও ক্রমেই সম্ভব নয়, একাধিক কারণে। প্রথম আমাদের সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাদের সংগ্রাম আরম্ভ করবেন, যদি করেন, কবে করবেন, আমাদের জানার কোনও উপায় নেই। তৃতীয়ত, ওই শপথ গ্রহণ করলে আমরা পুরোপুরি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নিয়ন্ত্রণের অধীনে চলে যাব এবং তারপরে আর আমাদের পক্ষে অন্য কোনও সংগঠন অথবা সংস্থায় আরম্ভ করা সংগ্রামে যোগ দেওয়া অসম্ভব হবে। তা সত্ত্বেও, এই পদক্ষেপকে আমরা স্বাগত জানাই যদি তাতে শেষ পর্যন্ত জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ হয়।

আমরা কংগ্রেসের সদর দপ্তর থেকে আরেক ধরনের কাজকর্মের প্রমাণ পেয়েছি। কতকগুলো জায়গায় নেতাদের শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে, এবং নেতারা ড্রিল এবং কুচকাওয়াজ করছেন। সংবাদপত্রে এই নতুন কুচকাওয়াজের ছবি বেরিয়েছে এবং সেগুলো বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। ১৯২১ সালে, কিংবা ১৯৩০ কিংবা ১৯৩২ সালে সারা দেশে যখন স্বরাজের জন্য সংগ্রাম চলছিল, তখন এরকম কোনও কুচকাওয়াজ হয়নি। এই নতুন কুচকাওয়াজের অভিনবত্ব লোককে আকৃষ্ট করেছে। একেও স্বাগত জানাতে হয় কারণ কংগ্রেসের অযথা কালক্ষেপের কৌশলের চেয়ে এটা ভাল। কিন্তু ময়দানের এই কুচকাওয়াজ থেকে কখন গণ-সত্যাগ্রহে আমরা পৌঁছব? এখন সেইটাই আমাদের দুশ্চিন্তার বিষয়।

আজ ব্যাপকভাবে একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, যে, আপোস-বিরোধীদের চাপের ফলে অদূর ভবিষ্যতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি খুব সীমাবদ্ধ আকারে একটি সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করতে পারে। আরও একটা গুজব শোনা যাচ্ছে যে, এই সীমাবদ্ধ সত্যাগ্রহ আন্দোলন এক কিংবা একাধিক নেতার অনশন সত্যাগ্রহ কিংবা আমৃত্যু অনশনের রূপ নিতে পারে। কিন্তু আমরা যেন ওই কৌশলের দ্বারা বিভ্রান্ত না হই।

চৌরিচৌরা হোক, দিল্লি চুক্তি হোক, হরিজন আন্দোলন হোক, আমরণ অনশনই হোক, কোনও কিছুই যেন আপোসহীন সংগ্রামের পথ থেকে আমাদের মনোযোগ অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে না পারে। আমরা চাই সর্বসাধারণের জন্য স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা জনসাধারণ তাদের নিজের চেষ্টায় কষ্টভোগ ও ত্যাগে অর্জন করে। একমাত্র তা হলেই আমরা প্রকৃত স্বরাজ, চিরস্থায়ী স্বরাজ লাভ করব।

৩২

কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক সংগঠন সমূহ

‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ পত্রিকা, ৪ মে ১৯৪০ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

বেশিদিন আগেকার কথা নয়, এমন এক দিন ছিল যখন কংগ্রেস নেতারা সাম্প্রদায়িক সংগঠন, যেমন হিন্দু মহাসভা কিংবা মুসলিম লীগের সদস্য ও নেতা হতে পারতেন। তখনকার দিনে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সাম্প্রদায়িকতা অনুগ্র ছিল। সেই কারণে লালা লাজপৎ রায় হিন্দু মহাসভার নেতা হতে পেরেছিলেন, আলি ভ্রাতৃদ্বয় মুসলিম লীগের নেতা হতে পেরেছিলেন, বঙ্গদেশে মৌলানা আক্রাম খাঁ-র মতো বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের একজন ভূতপূর্ব সভাপতি মুসলিম লীগের নেতা হতে পারতেন, কিন্তু সম্প্রতি অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এইসব সাম্প্রদায়িক সংগঠন আগেকার চেয়ে বেশি সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছে। তার প্রতিক্রিয়াতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার গঠনতন্ত্রে এই মর্মে একটি বাক্যাংশ যুক্ত করেছে যে, হিন্দু মহাসভা কিংবা মুসলিম লীগের মতো একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠনের কোনও সদস্য কংগ্রেসের কোনও নির্বাচিত কমিটির সদস্য হতে পারবেন না।

কংগ্রেস এই নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর থেকে কোনও কোনও মহলে একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, সাম্প্রদায়িক দলগুলোকে অচ্ছ্যুৎ বলে গণ্য করার। আমরা সামাজিক অস্পৃশ্যতা খারিজ করে রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতাকে উৎসাহিত করছি। তার ফলে ওই সব সংগঠনকে যখন কংগ্রেসের কাছাকাছি আনার চেষ্টা করা হয় অনেকে সেটাকে খুব নিন্দার্হ মনে করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি যখন পৌর প্রশাসনের ক্ষেত্রে হিন্দু মহাসভার সঙ্গে, এবং তারপরে মুসলিম লীগের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চেয়েছিল, তখনও তাই হয়েছিল।

হিন্দু মহাসভার সঙ্গে বোঝাপড়ার দুটি প্রচেষ্টা করা হয়েছিল, প্রথমবার গত ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ, কলকাতার পৌর নির্বাচনের সময়ে, দ্বিতীয়বার এপ্রিলের মাঝামাঝি সাধারণ নির্বাচনের পর, অলডারম্যান নির্বাচনের প্রাক্কালে।

বোঝাপড়ার ভিত্তি ছিল, নির্বাচন পরিচালিত হবে একমাত্র কংগ্রেসের নামে, এবং নির্বাচনের পরে সফল প্রার্থীরা সবাই কংগ্রেস পৌর বোর্ডে যোগ দেবেন। প্রার্থীদের নির্বাচিত করবেন হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস যৌথভাবে, এবং কংগ্রেসের নির্বাচন বোর্ড হিন্দু মহাসভার একজন সদস্যকে সদস্য করে নেবে, শেষ পর্যন্ত এই বোঝাপড়া প্রার্থী নির্বাচনের প্রশ্নে ভেঙে যায়, এবং তার ফলে ভোটাভুটিতে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই বাধে।

কংগ্রেসের যেসব মূলনীতি, তার বিচারে উপরোক্ত বোঝাপড়ায় আপত্তি করবার কিছু ছিল না। তা সত্ত্বেও তার খবর প্রকাশিত হলে প্রচুর ক্ষোভ ও আপত্তি দেখা গিয়েছিল, শুধু মুসলিম লীগ নয়, রক্ষণশীল কংগ্রেস মহলে যার মধ্যে গান্ধীবাদীরাও ছিলেন। এর একমাত্র ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে ইদানীং এক ধরনের রাজনৈতিক অস্পশ্যতা আমাদের মধ্যে বেড়ে উঠছে।

হিন্দু মহাসভার সঙ্গে দ্বিতীয় বোঝাপড়াটি ভেঙে যায় ১৬ এপ্রিল রাত্রিতে দশটা নাগাদ, যখন কাউন্সিলারগণ একযোগে অল্ডারম্যান পদগুলির জন্য পাঁচজন প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে

আলোচনা করলেন। এই যে শেষবারের মতো বোঝাপড়া ভেঙে গেল, তার পরে রাত ১১টায় কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের আলাপ আলোচনা আরম্ভ হয় এবং শেষ পর্যন্ত রাত দুটোয় তাদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়। বোঝাপড়া হয় অল্ডারম্যান এবং মেয়রের বিষয়ে। সব ঠিক চললে অন্যান্য পৌর সমস্যার ক্ষেত্রেও বোঝাপড়া প্রসারিত করা হবে। আর ভাগ্য প্রসন্ন হলে ওইরকম একটি বোঝাপড়ার ক্ষেত্র একদিন এত প্রসারিত হতে পারে, যার মধ্যে আসতে পারে প্রদেশ এবং দেশ সংক্রান্ত অনেক বেশি বড় বড় প্রশ্নও।

হিন্দু মহাসভা এবং অমৃতবাজার পত্রিকাকে ধন্যবাদ যে তারা হঠাৎ একটা প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িকতায় আক্রান্ত হয়েছে, তাদের জন্যই দিনের পর দিন সাম্প্রদায়িকতার বিষ নির্গত হচ্ছে, যার উদ্দেশ্য বঙ্গদেশ ও অন্যত্র হিন্দুদের মন বিষাক্ত করে তোলা। কিন্তু হিন্দুদের বিপথে নিয়ে যাওয়ার সমস্ত প্রচেষ্টা এ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে, কলকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্ক ও দেশবন্ধু পার্কে কলকাতায় নাগরিকদের দুটি বিশাল জনসভা হয়েছে কংগ্রেস ও লীগ চুক্তি সম্পর্কে কলকাতার জনগণের রায় পাওয়ার জন্য। প্রথম সভায় কম করে বিশ হাজারের মতো মানুষ এবং দেশবন্ধু পার্কে ত্রিশ হাজার মানুষ উপস্থিত ছিল। দুটি সভাতেই আমাদের প্রতি সর্বসম্মত আস্থা জ্ঞাপন করা হয়। তবুও আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না যে কিছু সংখ্যক সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন হিন্দু উক্ত চুক্তির বিরুদ্ধে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন।

আমাদের কথা বলতে গেলে, আমরা সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলোকে অস্পৃশ্য মনে করি না। বরং আমরা মনে করি কংগ্রেসের উচিত ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, তাদেরকে আমাদের দিকে টেনে আনতে। গত তিনবছর ধরে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। একটা পর্যায়ে বর্তমান লেখক, যিনি তখন কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন, তিনি মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মি. জিন্নাহর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, এবং তাঁদের কয়েকটি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তখন সেই প্রচেষ্টা বিফল হয়, যদিও লেখক কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এবং মহাত্মা গান্ধীর সমর্থন ও শুভেচ্ছা নিয়েই অগ্রসর হয়েছিলেন। সেই প্রচেষ্টায় যাঁরা আপত্তি করেননি, যে প্রচেষ্টা বিফল হয়েছিল, তাঁরাই এখন বর্তমান উদ্যোগ সম্পর্কে তীব্র আপত্তি জানাচ্ছেন, কারণ এই প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। অন্ধ বিরোধিতা আর কতদূর যেতে পারে?

বর্তমানে মুসলিম লীগের সঙ্গে যে ঐক্যমতে পৌঁছনো গেছে তাকে আমরা একটা বড় সাফল্য বলে মনে করি, বাস্তবে যা পেয়েছি তার জন্য নয়, ভবিষ্যতে এ থেকে যা পেতে পারি তার জন্য। বিগত তিন বছর আমরা অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিলাম, কোনও সাফল্য পাইনি। প্রত্যেক বার সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা এবং আবেগের প্রাচীর আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে, আমাদের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। এবার আমরা সেই প্রাচীর ভেদ করেছি এবং সেই ফাটলের মধ্যে দিয়ে আলোর রশ্মি এসে পড়েছে। এখন একটু আশা দেখা যাচ্ছে যে, অনেকে যে সমস্যার সমাধান প্রায় অসাধ্য বলে মনে করেছেন, আমরা হয়তো শেষ পর্যন্ত তার সমাধান করতে পারব। বিরাট বিরাট সাফল্য অনেক সময়ে সামান্য ভাবে শুরু হয়।

৩৩

ভারত, জাগ্রত হও!

'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকা, ১১ মে ১৯৪০ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

ইউরোপের ঘটনাবলী দ্রুত এক সংকটের দিকে এগিয়ে চলেছে। হল্যান্ডের ওপর নাৎসি আক্রমণ, যার খবর আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তাতেই নিশ্চিত পরিচয় পাওয়া গেছে শুধু জার্মানির বর্তমান শাসকদের দৃঢ় সংকল্প ও নির্মমতায় নয়, কত দ্রুত গতিতে তাঁরা কাজ করতে পারেন, তারও। যুদ্ধের আরম্ভের পর থেকে যা ঘটেছে তাতে আমরা বিস্মিত হইনি, একমাত্র স্ক্যান্ডিনেভিয়াতে নাৎসি শোষণ ছাড়া। বস্তুত, প্রকৃত ঘটনা, আমাদের ভবিষ্যৎবাণীগুলিকেও বহুল পরিমাণে সত্য বলে প্রমাণিত করেছে।

অক্টোবর ১৯৩৮-এ আমরা ইউরোপে আসন্ন যুদ্ধজনিত সংকটের কথা প্রকাশ্যে বলতে আরম্ভ করি। ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯-এ যে-প্রস্তাব আমরা সর্বসম্মতি ক্রমে জলপাইগুড়িতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে পাশ করি তাতে আমাদের সে-চিন্তা ব্যক্ত করা হয়, এবং তাতে প্রস্তাব করা হয় ভারতের জাতীয় দাবি সম্পর্কে একটি চরমপত্র ব্রিটিশ সরকারের কাছে পেশ করা হোক। মার্চ ১৯৩৯-এর ত্রিপুরী কংগ্রেসের সামনে জলপাইগুড়ি প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়, কিন্তু বিনা ব্যাখ্যায় প্রত্যাখ্যান করা হয় সে-প্রস্তাব। সেখানে সে-প্রস্তাব গৃহীত হলে, সরকারের সামনে সেই চরমপত্র পেশ করা হত, নির্দিষ্ট সময়ের অন্তে জোর কদমে জাতীয় সংগ্রামের প্রস্তুতি আরম্ভ হত এবং জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ হত। কিন্তু সে-রকম কিছুই হল না। তার বদলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বামপন্থীদের ওপর আক্রমণ আরম্ভ করলেন, এখন পর্যন্ত সে আক্রমণ চলছে।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের ছ' মাস পরে, সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এ ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হল। যুদ্ধ বাধার পর অনেকে আশা করলেন, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করার প্রস্তুতি হিসাবে কর্মীদের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হবে। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পদত্যাগ সেই আশাকে প্রবল করে তুলল। কিন্তু সে-আশা অচিরে ধূলিসাৎ হল। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য অনেক রকম যুক্তি দেখান হল। আমাদের দিক থেকে আমরা সমানে অবিচ্ছিন্নভাবে অনুরোধ-উপরোধ করে যেতে লাগলাম যাতে অবিলম্বে সংগ্রাম আরম্ভ হয়। তার একাধিক কারণ ছিল। একটি প্রধান কারণ ছিল, ১৯৪০ সালের বসন্তকালে যুদ্ধ এক সংকটে উপনীত হবে, এবং স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আন্দোলনের সময়টা আমরা সেই অনুযায়ী স্থির করব। আমরা যদি চাইতাম ১৯৪০-এর বসন্তকালে ভারতে সংকট আসুক সংগ্রাম তার কয়েক মাস আগে আরম্ভ করা হত। কিন্তু আমাদের যুক্তিতে এবং আমাদের আবেদনে কাজ হল না। আমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখান হল, ইউরোপের সংকট যখন ১৯৪০-এর এপ্রিলের আগে আসবে না, আন্দোলন আরম্ভ করার জন্য আমাদের ব্যস্ত হওয়ার কোনও দরকার নেই।

আমাদের নেতারা কথাই বলে চললেন, যুক্তি-তর্কই চলল, মাসের পর মাস কেটে গেল। কার্যকর কিছুই করা হল না, ১৯৪০-এর বসন্তকাল এসে পড়ল, বসন্তের বাতাস বইতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানিদের সাময়িক তৎপরতা আক্রমণাত্মক আকার গ্রহণ করল। একদিন

প্রভাতে দেখা গেল ডেনমার্ক দখল হয়ে গেছে, নরওয়ে আক্রান্ত। বিদ্যুৎ গতিতে জার্মানি আক্রমণ হানল। মিত্রশক্তি হতচকিত, জার্মানদের রণকৌশলের দ্বারা পরাজিত।

এখন হল্যান্ড আক্রান্ত হয়েছে এবং দেখতে দেখতে অধিকৃত হয়ে যাবে। কোন বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে কেউ বলতে পারে না। লোকে ডাচ ইস্ট ইন্ডিজে জাপানিদের আক্রমণের কথা বলছে। ইতালিয়ান বাহিনী, মনে হচ্ছে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তাদের নেতা (মুসোলিনি) তাঁর প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে "যুদ্ধং দেহি" বলে বক্তৃতা করছেন। জনতা চিৎকার করছে, "টিউনিসিয়া টিউনিসিয়া"। নরওয়ে বিপর্যয়ের পর লন্ডনে মন্ত্রিসভা টলমল করছে।

কিন্তু ভারত কী করছে? ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কী করছে?

হিন্দু আর মুসলিমদের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা ফরওয়ার্ড ব্লককে আর কিষান সভাকে আক্রমণ করছেন। অপর পক্ষে ফরওয়ার্ড ব্লক ও কিষান সভা চেষ্টা করছে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের সাহায্য ছাড়াই নিজেদের কাজ করে যাওয়ার। কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব ঠিক করতে পারছেন না এর পরে কী করা উচিত এবং তাঁদের দ্বিধা ও অনিশ্চয়তা অন্যদের রীতিমতো সংক্রামিত করছে, তাদের মনোবল কমিয়ে দিচ্ছে, মুসলিম লীগ জাতীয় সমস্যার চেয়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়েই বেশি মাথা ঘামাচ্ছে। আর এইসব মিলে ফল দাঁড়িয়েছে এই, আজ সারা ভারত পাঁকে পড়ে গেছে। গতিশীল নেতৃত্বের অভাবে সমগ্র জাতি, মনে হয়, তার এগিয়ে যাওয়ার শক্তি হারিয়েছে।

এই রাজনৈতিক গতানুগতিকতা থেকে আমাদের দেশকে আমরা কী করে বার করে আনব, আন্তর্জাতিক সংকটকে আমাদের নিজেদের কাজে লাগাব, নিজেদের স্বাধীন করব? এই মুহূর্তের সেটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা।

একটা করে দিন যাচ্ছে, আর আমরা হতাশায়, যন্ত্রণায় আমাদের আঙুল কামড়াচ্ছি। যদিও দেরি হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও কি ভারতকে রক্ষা করবার জন্যে কিছু করা যায় না? ভারতের পরাধীন জনগণ কি তাদের আলস্য ঝেড়ে ফেলতে, তাদের তুচ্ছ ঝগড়া-বিবাদ সরিয়ে রেখে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এই মহান এবং সুপ্রাচীন জাতির জন্য স্বাধীনতা দাবি করতে পারে না?

এই সংকটের সময়ে আমরা আমাদের সামান্য ভূমিকা পালন করতে প্রস্তুত আছি, যাতে যা গেছে তাকে আবার পুনরুদ্ধার করতে পারি, এবং স্বাধীনতা জয় করতে পারি। কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব জাতিকে ডাক দিক সংগ্রাম আবার আরম্ভ করতে। আমরা তখন সেই বিশাল ও মহৎ কার্যে যোগ দেওয়ার জন্য সারি দিয়ে দাঁড়াব। কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হতে পারে জাতীয় সংগ্রামের গতিশীল কার্যক্রমের ভিত্তিতে। তখন আমরা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতে পারি স্থায়ী ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করবার।

ইউরোপ যখন টগবগ করে ফুটছে, ৩৫ কোটি ভারতীয়ের ঐক্যবদ্ধ দাবিকে কে প্রতিরোধ করতে পারবে? স্বাধীনতা প্রায় আমাদের নাগালের মধ্যে চলে এসেছে। সংহত শক্তিতে তাকে শুধু করতলগত করার অপেক্ষা। আমরা কি তা করব?

৩৪

তাড়াতাড়ি করো

‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ পত্রিকা, ১৮ মে ১৯৪০ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

আমাদের গত সংখ্যায় আমরা আমাদের সম্পাদকীয়তে বর্তমান আন্তর্জাতিক সংকটের প্রসঙ্গ তুলেছিলাম এবং দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছিলাম, এই সময় আমরা যেন জাগ্রত হই, এই সময়ের দাবি যেন আমরা পুরণ করি এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির সম্মুখীন হই। আমরা কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে আবেদন করেছি, তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছি, সমস্ত কংগ্রেস সদস্যকে জাতীয় সংগ্রামের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করতে। সেই সঙ্গে এও জানিয়েছি যে এই জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমাদের ভূমিকা পালন করতে আমরা প্রস্তুত। শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে যে মৌলিক প্রশ্নে আমাদের আলাদা হয়ে যেতে হয়েছিল সেটা হল জাতীয় সংগ্রামের প্রশ্ন এবং তাঁরা যদি সেই প্রশ্নে আমাদের সন্তুষ্ট করেন, তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাতে আমাদের কোনও বাধা থাকবে না, অতীতে আমাদের মধ্যে যতই মতভেদ ও বিতর্ক হয়ে থাক। ব্রিটেনের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যদি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাদের সমস্ত শত্রুতা ভুলে যেতে এবং একটি জাতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করতে পেরে থাকে, কংগ্রেসি, যাঁরা বলেন তাঁদের রাজনৈতিক লক্ষ্য অভিন্ন, তাঁরা এক অভূতপূর্ব সংকটের সময়ে ঐক্যবদ্ধ হতে পারবেন না! আমাদের সকলেরই যদি সম্মানবোধ থাকে, দেশপ্রেম থাকে, আমাদের সে-কাজ করতে পারা উচিত।

জাতীয় সংগ্রামের যে কর্মসূচি ফরওয়ার্ড ব্লক প্রথম থেকে চেয়ে এসেছে এতদিনে সেটার যৌক্তিকতা স্বতঃপ্রমাণিত। সেটা না থাকলে অনেক দিন আগেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধিজির পন্থা অনুসরণ করে ব্রিটিশ সরকারকে নিঃশর্ত সহযোগিতার প্রস্তাব দিত। আপোস এবং আত্মসমর্পণের সেই নীতি প্রতিরোধ করতে আমরা সক্ষম হয়েছি, উপরন্তু, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এমন একটা সংগ্রাম আমরা আরম্ভ করেছি, দিনে দিনে যার শক্তিবৃদ্ধি হতে বাধ্য।

ইউরোপের সংকট যত ঘনীভূত হবে, পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তত দুর্বল হবে। সেই অনুপাতে আমাদের কাজ সহজ থেকে সহজতর হয়ে আসবে, আর শেষ পর্যন্ত যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পরাজিত হয় তখন আর, জাতীয় সংগ্রামের যে-সমস্যা, তার কোনও গুরুত্ব থাকবে না। যদি যুদ্ধে ভাগ্য বিপর্যয়ের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আর রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি হিসাবে অস্তিত্বই না থাকে, আমরা কার সঙ্গে সংগ্রাম করব?

এ-রকম সম্ভাবনা অবশ্যই আছে যে, নতুন যে-পরিস্থিতির দ্রুত উদ্ভব হচ্ছে, তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই করার সমস্যা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত গতিতে একটি অনুপূরক সমস্যা বহন করে আনবে, অভ্যন্তরীণ ঐক্য এবং সংহতির সমস্যা, রাজনৈতিক ক্ষমতা, এত দশক ধরে আমরা যা চেয়ে এসেছি, এখন আমাদের নয়নগোচর হয়েছে, তা আমরা কী করে হস্তগত করব? এবং একবার হস্তগত করার পর তাকে রক্ষা করব কী করে?

ভবিষ্যতে আমাদের ভাগ্যে কী আছে তা এখন অনিশ্চিত, অন্ধকারাচ্ছন্ন। কিন্তু এই অনিশ্চয়তা অচিরে দূর হবে, যদি আমরা দুটি কাজ করতে পারি, কংগ্রেসিদের মধ্যে ঐক্য

স্থাপন এবং হিন্দু-মুসলিম মীমাংসা, তা হলে আমরা সহজেই স্বরাজ লাভ করতে পারব, এবং যে-স্বরাজ লাভ করেছি তাকে রক্ষাও করতে পারব।

আমাদের হাতে সময় অত্যন্ত কম এবং আমাদের যদি কিছু করতে হয়, তাড়াতাড়ি করতে হবে। ইউরোপে ঘটনা ঘটে চলেছে বিদ্যুৎগতিতে এবং ঘটনা স্রোতের সঙ্গে যদি আমাদের তাল মিলিয়ে চলতে হয়, আমাদেরও দ্রুত কাজ করতে হবে। সময় থাকতে থাকতে আমরা যেন সক্রিয় হই। বিলম্ব সব সময়েই বিপদের কারণ হতে পারে। এখন সে সম্ভাবনা আরও বেশি।

৩৫

এগিয়ে চলো, বঙ্গদেশ!

'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকা, ১ জুন ১৯৪০ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

বঙ্গদেশের বাইরে বেশি লোকের এটা জানা নেই যে, যুদ্ধ বাধবার পর এই প্রদেশে এমন সব আপৎকালীন অধ্যাদশ জারি করা হয়েছিল যার ফলে সেখানকার জনজীবনের গলায় প্রায় ফাঁস লেগে গিয়েছিল। কঠোরতা এবং নির্মমতার বিচারে যে-অর্ডিনান্স রাজ অন্যান্য কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে জারি করা হয়েছিল, বঙ্গদেশের অবস্থার সঙ্গে তার তুলনা করা চলে না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি প্রায় পাঁচ মাস অপেক্ষা করেছিল বঙ্গদেশ সরকার তার কাজকর্মের ধারা বদলায় কিনা দেখবার জন্য। সরকারকে অনেক প্রভাবশালী মহল থেকে সে-রকম পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি। গত পাঁচ মাসে অর্ডিনান্সগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করবার অনুমতির জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে তিনবার অনুরোধ করা হয়েছিল।

জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে অবস্থাটা এমন হল যে, বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ধৈর্য্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেল এবং সিদ্ধান্ত নিল যে মাস শেষ হওয়ার আগেই আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হবে। অর্ডিনান্স রাজের সবচেয়ে জঘন্য দিক ছিল, জনসভা, মিছিল ইত্যাদি সমগ্র বঙ্গদেশে নিষিদ্ধ করা, যার ফলে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ প্রায় স্তব্ধ করে দেওয়া হল। অর্ডিনান্স অগ্রাহ্য করে প্রথম জনসভা বর্তমান লেখক ডাকলেন ৩১ জানুয়ারি, শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। বঙ্গদেশের যাঁরা রাজনীতি সচেতন মানুষ তাঁরা সারাদিন উত্তেজনায় ভরপুর হয়ে ছিলেন, পাইকারি হারে মানুষ গ্রেপ্তার হবে, সরকার বলপ্রয়োগ করে আন্দোলন দমন করবে, এই প্রত্যাশায়।

সে রকম কিছুই হল না। কোনও অজ্ঞেয় কারণে সরকার আত্মসমর্পণ করল, সবকিছু শান্তিপূর্ণ ভাবে চলল। সেই দিন থেকে সারা বঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এবং তাদের সমর্থকেরা অর্ডিনান্স ভঙ্গ করতে আরম্ভ করল। তার ফল এই দাঁড়াল যে, সেপ্টেম্বরের

আগেকার অবস্থাই আবার ফিরে এল, এবং যুদ্ধের আগে এই পরাধীন দেশে যেটুকু নাগরিক স্বাধীনতা আগে ছিল সেটুকু আবার মানুষ ফিরে পেল। বিপিসিসি-র সেই সাফল্য ছিল অপ্রত্যাশিত ও অভূতপূর্ব। উপরোক্ত অর্ডিনান্সের বলে গ্রেপ্তার যা করা হল তা কিন্তু সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু বোধহয় সেই কারণেই বিপিসিসি-র সাফল্য উল্লেখযোগ্য হলেও চমকপ্রদ হল না।

গত জানুয়ারি থেকে বিপিসিসি এই রকমই করে চলেছে। কিন্তু গান্ধীবাদীরা এবং নয়া গান্ধীবাদীরা অর্থাৎ আমাদের জাতীয় ফ্রন্টওয়ালারা? খবর পাওয়া গেল, কর্তৃপক্ষ আরামবাগ মহকুমায় গান্ধীবাদীদের সম্মেলন নিষিদ্ধ করলেন এবং স্থানীয় গান্ধীবাদীদের সে-আদেশ অমান্য করার কথা মনে হল না। নদিয়া জেলায় নয়া-গান্ধীবাদীরা একটা সভা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ যখন তার অনুমতি দিল না, তাঁরা ঠিক করলেন রণে ভঙ্গ দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ এবং সে মতলব ত্যাগ করলেন। মে-দিবসে প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সরকারের অনুমতি নিয়ে কলকাতায় একটি সমাবেশ করল, কিন্তু সেই দিনই বিপিসিসি যে সভা এবং সমাবেশের ব্যবস্থা করেছিল তার জন্য সরকারের কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি।

মে মাসে বঙ্গদেশে নতুন একটা কর্মতৎপরতার প্রয়োজন হল। নাগরিক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য সংগ্রাম সফল হয়েছিল। প্রতিক্রিয়াশীলেরা, যথা, অ্যাড হক কমিটি (কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সৃষ্টি), হিন্দু মহাসভা এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এবং 'যুগান্তর'-এর বিশ্বাসঘাতকতা, যার উদ্দেশ্য ছিল বিপিসিসি-কে হেয় করা, সেটা ব্যর্থ হল। লোকে সাগ্রহে নেতাদের কাছ থেকে নতুন দিশার প্রত্যাশা করছিল।

সেই নতুন নেতৃত্বদানের উদ্দেশ্যে ঢাকায় ২৫ এবং ২৬ মে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের একটি বিশেষ অধিবেশন করা হয়েছিল। সেই সম্মেলনের আহ্বান নিঃসন্দেহে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ছিল। যতেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি তাতে যোগ দিয়েছিলেন, প্রায় ৬০০ জন। এবং তাঁরা সকলেই অতি তৎপরতার সঙ্গে এসেছিলেন। ২৫ তারিখে নির্বাচিত সভাপতিকে এবং বর্তমান লেখককে ঢাকা সোল্লাস এবং আবেগমথিত সংবর্ধনা প্রদান করে। মূল অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন বিপুল সংখ্যক মানুষ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র সম্মেলন, শ্রমিক সম্মেলন, কিষান সম্মেলন এবং নারী সম্মেলনও সফল হয়েছিল। সবাই ঢাকা থেকে ফিরে আসেন আশা, আত্মবিশ্বাস ও উদ্দীপনা নিয়ে।

ঢাকা সম্মেলনে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা অনুপ্রেরণা পেলেন কী থেকে? যে স্পষ্ট এবং অকুতোভয় নেতৃত্ব তাঁদের দেওয়া হল, সেইটাই তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করে। ঢাকার আহ্বান দিল সংগ্রাম তীব্রতর করার আহ্বান, রণক্ষেত্র প্রসারিত করার আহ্বান। কিন্তু সে আহ্বান কোনও পরাধীন জাতির উদ্দেশে ছিল না। বিগত কয়েক মাসে ভারতের অবস্থা এমন বদলে গেছে যে তাকে আর চেনাই যায় না, এবং সেই জন্য তূর্যধ্বনিতে সেই আহ্বান প্রেরিত হয়েছে এমন এক জাতির উদ্দেশে যে-জাতি তার আত্মমর্যাদা এবং আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে এবং চিন্তা করতে, অনুভব করতে, কাজ করতে আরম্ভ করেছে একটি স্বাধীন জাতির মতো।

সেই কারণে, স্বাধীন জাতি হিসাবে তার নবজাগ্রত চেতনার যা কিছু পরিপন্থী সে-রকম সমস্ত রাজনৈতিক দাসত্বের প্রতীককে ঝেড়ে ফেলে দিতে সেই সম্মেলন আহ্বান জানিয়েছে। যে হলওয়েল মনুমেন্ট শহরের কেন্দ্রস্থলে বাঙালির দাসত্বের বিজ্ঞাপন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে বিদায় করতে হবে। তেমনি নিশ্চিন্ত করতে হবে আমাদের পরাধীনতার আরেকটি

প্রতীক, কারাগারে এবং অন্তরীণ অবস্থায় যাঁরা বন্দি হয়ে আছেন, তাঁদের বন্দিদশাকে। এবং এ-সবই হবে, বিগত দু' শতাব্দীর যে-কলঙ্ক সুন্দর এবং স্বাধীন ভারতের মুখের ওপর বিরাজ করছে তাকে নিশ্চিহ্ন করার সূচনাস্বরূপ।

ঢাকা সম্মেলন ভারতীয় জাতির উদ্দেশ্যে আরও একটি অতি প্রয়োজনীয় সাবধানবাণী ধ্বনিত করেছে। রাতারাতি ধ্বসে পড়ছেন রাজারাজড়া এবং তাঁদের রাজত্ব এবং ক্ষমতা এসে পড়ছে নাগালের মধ্যে। সেই ক্ষমতা করায়ত্ত করার জন্য এবং ধরে রাখার জন্য জাতীয় ঐক্য এবং জাতীয় সংহতি অপরিহার্য, অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছিল। সেই জন্য আবেদন জানান হয়েছিল কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এবং হিন্দু-মুসলিম সমস্যায় একটা স্থায়ী সমাধানের জন্য। এক কথায়, প্রাদেশিক সম্মেলনের নির্দেশ ছিল, "সংগ্রাম করো, ঐক্যবদ্ধ হও", সংগ্রাম কোরো বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ঐক্যস্থাপন কোরো নিজেদের মধ্যে, যদি স্বাধীনতা চাও এবং স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে।

এই সমগ্র মহৎ প্রচেষ্টা চালাতে হবে, সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার এই আহ্বানের ছত্রতলে, "ভারতীয় জনগণের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই!" হয় সবটা, নয়তো কিছুই নয়, এই হবে আমাদের নীতি। আপোসের, মাঝপথে গিয়ে থেমে যাওয়ার কোনও জায়গা থাকবে না।

৩৬

এ কি ন্যায়সঙ্গত?

'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকা, ৮ জুন ১৯৪০ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

এমনকী শয়তানকেও যদি তার ন্যায্য পাওনা দিতে হয়, তাহলে ফরওয়ার্ড ব্লককে কেন নয়? আমাদের দক্ষিণপন্থী বন্ধুরা নিরন্তর আমাদের সমালোচনা করে চলেছেন, আমরা অমুক কাজ কেন করলাম, তমুক কাজ কেন করতে পারলাম না, সে-কথা বলে। কিন্তু তারা কি কখনও একটু থেমে একবার ভেবে দেখেন, কীরকম প্রচণ্ড প্রতিকূলতার সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হয়েছে? তাঁরা কি কখনও দয়া করে আমাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন? তা তো করেনইনি, বরং তার উলটোটাই করেছেন, আমাদের কাজ বানচাল করতে অনেক চেষ্টা করেছেন। আজ যদি আমরা বলি, তা হলে ভুলও বলা হবে না, বাড়িয়েও বলা হবে না, যে তাঁরা আসলে আমাদের কাজ পণ্ড করবারই চেষ্টা করেছেন। জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ করার এবং তাকে তীব্র করার কষ্টসাধ্য কাজ, গান্ধীপন্থীদের কিংবা 'র‍্যাডিক্যাল' নেতাদের, অথবা সমাজবাদী কংগ্রেসিদের কিংবা জাতীয় ফ্রন্টপন্থীদের দিক থেকে কোনও সাহায্য, কোনও সহানুভূতি আমরা পাইনি। স্বামী সহজানন্দের কিষান সভাকে এবং অধ্যাপক রঙ্গ এবং ফরওয়ার্ড ব্লককে নির্ভর করতে হয়েছে সম্পূর্ণ তাঁদের নিজস্ব সামর্থ্যের ওপর। উপরোক্ত দক্ষিণী ও বামপন্থী দলগুলি যদি নিরপেক্ষও থাকতে মনস্থ করত, আমরা আমাদের ভাগ্যকে

ধন্যবাদ দিতাম। কিন্তু অনেক মহল থেকে আমরা যা পেয়েছি তা হল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শত্রুতা। সংগ্রাম আরম্ভ করবার আগে প্রায়ই এই বলে আমাদের ওপর দোষারোপ করা হত যে, আমরা কংগ্রেসকে সমালোচনা করি। নিজেদের উদ্যোগে নিজেরা কিছু করি না। সংগ্রাম যখন আরম্ভ করা হল, সেই অভিযোগ বিদ্রূপে রূপান্তরিত হল। সংগ্রামকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হল, এবং সবাইকে বলা হল, গান্ধীপন্থীদের সক্রিয় যোগদান ছাড়া সে-সংগ্রাম কখনই ফলপ্রসূ হবে না। কিন্তু গান্ধীপন্থীরা যাতে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেন, তার জন্য কোনও চেষ্টা করা হল না।

আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের কমরেডরা যখন গ্রেফতার এবং কারারুদ্ধ হলেন, আমাদের বলা হল, কোনও গণসংগ্রাম হয়নি, বড় জোর এ হল গান্ধিপন্থী সংগ্রাম। আবার যখন অধিক সংখ্যায় তাঁদের গ্রেফতার করা হল না, যেমন বঙ্গদেশে, আমাদের বলা হল, সবকিছু শান্ত, কোনও সংগ্রাম নেই। এই বিচিত্র যুক্তির ওপর আবার ঠাট্টা-তামাসাও চলল।

কিন্তু আমরা আমাদের সাফল্যের মূল্যায়ন করব সম্পূর্ণ ঠান্ডা মাথায়, আবেগশূন্য ভাবে। প্রথমত, আমরা বোধহয় দাবি করতে পারি যে, এখন পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোস এবং যুদ্ধের কাজে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা প্রতিরোধ করতে পেরেছি। আমাদের নিরন্তর আপোস বিরোধী সংগ্রাম যদি না থাকত, শীর্ষ নেতৃত্ব কোথায় আমাদের নিয়ে যেতেন, সহজেই অনুমান করা যায়। দ্বিতীয়ত, আমরা বোধহয় দাবি করতে পারি যে আমরা দেশে, এবং বিশেষ করে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে সংগ্রামের একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পেরেছি। গত আঠারো মাস ধরে মহাত্মা গান্ধী যে একভাবে জাতীয় সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার চিন্তার বিরোধিতা করে এসেছেন, ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর মাসেই যে তিনি যুদ্ধে ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতার সমর্থন করেছিলেন এ-সব সত্ত্বেও দেখছি আজ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস দলকে আদেশ দিচ্ছে নিজেকে বিভিন্ন সত্যাগ্রহ সমিতিতে রূপান্তরিত করতে এবং বিভিন্ন প্রদেশে তার "নেতা"-দের শার্ট এবং হাফপ্যান্ট পরে কুচকাওয়াজ করতে। এই আশ্চর্য রূপান্তর কি সম্ভব হত, যদি দেশে ফরওয়ার্ড ব্লক বলে কিছু না থাকত এবং ১৯৪০-এর মার্চ মাসে যদি রামগড় আপোস বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত না হত?

সবশেষে (এটাও কম নয়) আমরা বোধহয় দাবি করতে পারি যে আমাদের সর্বশক্তি, যা-কিছু আমাদের ছিল, সব দিয়ে আমরা প্রকৃতই একটি জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ করেছি। ফরওয়ার্ড ব্লকের সারা ভারত কার্যকরী সমিতির আটজন সদস্য আজ কারাদণ্ড ভোগ করছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে কারাগারে বন্দি অসংখ্য বন্ধু ও সহযোগী। বিহার এবং যুক্তপ্রদেশে আন্দোলন চলছে জোর কদমে। বঙ্গদেশে নাগরিক স্বাধীনতা সম্পর্কে সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে দেখা গেছে বঙ্গসরকার কার্যত আত্মসমর্পণ করেছে। যুদ্ধকালীন অনেক অর্ডিনান্স বাতিল হয়ে গেছে আমাদের সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার পর, এবং তার ফলে সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এর আগেকার আবস্থা বহুলাংশে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। গত ২৫ ও ২৬ মে ঢাকাতে প্রাদেশিক সম্মেলনে যে উদ্দীপক নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল তার পথে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য এখন প্রস্তুত হচ্ছে।

ভারতের মতো বিশাল দেশে একটি অহিংস গণআন্দোলন গড়ে তোলা চিরকালই সময়সাপেক্ষ এবং তার জন্য যে প্রচেষ্টা প্রয়োজন, সেটাও কম নয়। কিন্তু সে-কাজ হাজারগুণ দুরূহ হয়ে ওঠে, যখন, শুধু দক্ষিণপন্থীরাই নন, তথাকথিত বামপন্থীরাও ইচ্ছাকৃতভাবে তার বিরুদ্ধাচরণ করেন। তা ছাড়া অ-কংগ্রেসি নানা সংগঠন আছে। তাদের বিরোধিতারও

সম্মুখীন হতে হয়, তাকে জয় করতে হয়। সর্বোপরি আছে বিপুল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং তাঁর মিত্রবর্গ, ব্রিটিশ ও ভারতীয়। তাদের সঙ্গেও লড়াই করতে হয়। যত বাধাবিঘ্ন আমাদের অতিক্রম করতে হয়, যত প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়, তার কথা বিবেচনা করলে বলতে হবে আমাদের কাজ ভালই হয়েছে। শত্রুতা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ সত্ত্বেও আমাদের আন্দোলন ক্রমশ দিনে দিনে শক্তি সঞ্চয় করবে, তার আকার বৃদ্ধি পাবে। যাঁরা সাহায্য করতে চান না, তাঁরা দয়া করে অন্তত নিরপেক্ষ থাকবেন। আমাদের সংগ্রামের প্রকৃত ফল যাই হোক, অথবা ব্যক্তি হিসাবে আমরা যতই অযোগ্য হই, এ-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই যে আমাদের লক্ষ্য সমুন্নত, আমাদের সংগ্রাম মহান। আমরা যদি জয়লাভ করি, আমাদের লক্ষ্য পূর্ণ হয়, লাভবান হবে আমাদের দেশ, ব্যক্তি হিসাবে আমরা নয়। সৈনিকগণ, যারা এগিয়ে চলেছ, পন্থা, রণকৌশল ইত্যাদির বিষয়ে আমরা যদি একমত হতে নাও পারি, ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতেই কি একমত হতে পারি না? আমরা পরস্পরের উদ্দেশ্যকে সম্মান করতে পরস্পরের সাফল্য কামনা কি করতে পারি না?

৩৭

অস্থায়ী জাতীয় সরকার

৮ জুন ১৯৪০-এ কার্শিয়াং থেকে প্রচারিত পূর্ণ বিবৃতি।

হিজ এক্সেলেন্সি ভাইসরয়ের সাম্প্রতিক বিবৃতি, কমান্ডার-ইন-চিফের বক্তব্য এবং প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ রাখেনি যে অবশেষে ব্রিটিশ সরকার ব্রিটেনের সমরোদ্যমে ভারতকে শোষণ করবার জন্য রীতিমত চেষ্টা করবে, এবং সেই প্রচেষ্টা করা হবে ভারতের স্বাধীনতার দাবি পূর্ণ না করে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি এই নীতি গ্রহণ করার সাহস ব্রিটিশ সরকারের হয়েছে যে কারণে সেটা হল, সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিবৃতিতে মহাত্মা গান্ধী স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন যে, বিপদের সময়ে ব্রিটেনকে অসুবিধায় ফেলা ভারতের অনুচিত। এই মত, শুধু গান্ধীপন্থীরাই নয়, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও সমর্থন করেছেন, কাজেই অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, ভারতে ব্রটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই নতুন নীতির জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পরোক্ষভাবে দায়ী।

আমি যতদূর বুঝতে পারছি, সহজে ব্রিটিশ সরকার সে-চেষ্টা পরিত্যাগ করবে না। তার ফলে হরিপুরা কংগ্রেসে গৃহীত যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রস্তাবের যাঁরা পক্ষে, তাঁরা এক গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন। এ-বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই যে, ভবিষ্যতে যদি গ্রেট ব্রিটেনের সৈন্যবাহিনী আবার পরাস্ত হয়, ব্রিটিশেরা আরও অধিকতর পরিমাণে ভারতের ওপর নির্ভর করবে, ভারতীয় জনমত সে-বিষয়ে যাই হোক না কেন।

কিন্তু ভারত যত দিন দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ, ইউরোপের ঘটনাবলীতে তার কী আসে যায়? আমরা আমাদের স্বাধীনতা চাই এবং চাই অবিলম্বে। সরকারের প্রতিশ্রুতি, ভবিষ্যতে যা পূরণ করা হবে, আমাদের জনগণের ওপর তার কিছুমাত্র প্রভাব পড়বে না। এখনই আমরা হাতে কী পাচ্ছি, তাই দিয়ে আমরা ব্রিটিশদের বিচার করব, রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি, যা কেবলমাত্র ভঙ্গ করবার জন্যই প্রদান করা হয়, তার অভিজ্ঞতা আমাদের যথেষ্ট হয়েছে। সরকার আবার যেন গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের বোকা বানানোর চেষ্টা না করে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্রিটেনের বৈদেশিক নীতির চরিত্রে দেখা গেছে, দূরদৃষ্টির অভাব। এইটাতেই যতটা গ্রেট ব্রিটেনের সর্বনাশ ডেকে এনেছে ততট আর কিছুতে নয়। আমার মনে হয় সেই অদূরদর্শিতা এখনও ব্রিটিশ রাজনীতিকদের পিছু ছাড়েনি। তাঁরা এখন ভাবছেন ভারতের সাহায্য নিয়ে ব্রিটেনকে বাঁচাবেন। কিন্তু দাসত্বের বন্ধনে বন্দি ভারত কী করে ব্রিটেনকে, কিংবা অন্য কাউকেই বা বাঁচাবে?

ভারতকে আগে নিজেকে বাঁচাতে হবে এবং সে নিজেকে বাঁচাতে পারে একমাত্র যদি একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার, যার হাতে এখনই সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে দিতে হবে, তার জন্য হিন্দু এবং মুসলিমরা যৌথভাবে দাবি করে। এই পন্থা অবলম্বন করা হয় পৃথিবীর প্রত্যেকটি বৈপ্লবিক সঙ্কটের সময়ে। কেন্দ্রের এই অস্থায়ী জাতীয় সরকারকে ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনের কিছু কিছু প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পরে, বর্তমান সংবিধানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু অস্থায়ী জাতীয় সরকারের হাতে সম্পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা থাকা চাই। কিছুদিন পরে, এখনকার সঙ্কট কেটে গেলে, ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণমুক্ত অস্থায়ী জাতীয় সরকার, একটি গণপরিষদ আহ্বান করবে ভারতের একটি বিস্তারিত সংবিধান রচনা করবার জন্য, যে সংবিধান ভারতের নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের উপযুক্ত হবে।

অস্থায়ী জাতীয় সরকারের প্রথম কর্তব্য হবে ভারতের অধিবাসীদের সম্পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত করা এবং বন্ধুভাবাপন্ন বিদেশি শক্তিদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করা, যাতে যে-কোনও পরিস্থিতিতে ভারতের নিরাপত্তা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে। এইসব ব্যবস্থা করা হলে আর অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা নিয়ে আমাদের কোনও ভয়ের কারণ থাকবে না। ইউরোপে নাৎসিদের সামরিক সাফল্য ভারতে কোনও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে এমন আশঙ্কাও থাকবে না। ভারত যখন স্বাধীন হবে, নিজেকে রক্ষা করবার মতো শক্তি অর্জন করবে, তখন অন্য বন্ধু দেশগুলির দিকেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারবে।

অতএব এই মূহূর্তেই ভারতীয়দের কর্তব্য "ভারতের জনগণের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই", এই স্লোগানের সমর্থনে উঠে দাঁড়ান, এবং এখনই দাবি করা একটি অস্থায়ী যার হাতে থাকবে সম্পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা, এই দাবি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে, যদি ভারতের হিন্দু ও মুসলিমদের এটি যৌথ দাবি হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কি এ-বিষয়ে একমত হতে পারবে? যদি পারে তারা ভারতকে চিরকালের জন্য রক্ষা করবে।

যদি, দুর্ভাগ্যক্রমে এ দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়, আমাদের আর কোনও বিকল্প পন্থা থাকবে না, ভারতীয় জনগণকে সংগ্রামের পথে আহ্বান করা ছাড়া।

ব্রিটিশ সরকারকে আমি শ্রদ্ধাসহকারে সাবধান করে দিয়ে বলতে চাই, ভারতের দাসত্বের অবস্থায় ভারতীয় সম্পদ শোষণ করা চলবে না। মহাত্মা গান্ধী কিংবা কোনও গান্ধিপন্থী নেতার শ্রুতিসুখকর বচন শুনে পথভ্রান্ত হবেন না। তাঁরা যখন আপোসের কথা, সহযোগিতার কথা বলেন, তখন ভারতের জনমত অথবা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন না। কেউ কেউ এখন যে

বলেন, নাৎসিদের বিভিন্ন স্থানে জয়লাভের ফলে বর্তমান যুদ্ধ আর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয়। সে কথা বালসুলভ, এ দেশের কোনও বুদ্ধিমান মানুষ তাতে প্রতারিত হবেন না।

পরিশেষে ব্রিটিশ সরকারের কাছে আমার অনুরোধ, পরাধীন ভারতের সহায়-সম্বল ব্যবহার করে তাঁরা যদি ব্রিটেনকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেন, তার পরিণাম কী হবে ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন। সে-পথ ব্রিটেনকে উদ্ধার করবে না ভারতের আরও সর্বনাশ করতে পারে। এক স্বাধীন, শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ ভারত, শুধু কারও সাহায্য ব্যতিরেকেই সমস্ত সম্ভাব্য বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করবে না, ব্রিটেন সহ অন্য বন্ধুদেশকেও দুঃসময়ে সহায়তা প্রদান করবে। ব্রিটিশ রাজনীতিকেরা যদি এখনও দেউলেপনা দেখাতেই থাকেন, আমাদের সনির্বন্ধ আবেদন সত্ত্বেও ভারত সরকারের অবলম্বিত নতুন নীতি সম্পর্কে আমাদের কোনও দায় থাকবে না। মহাত্মা গান্ধী যাই বলুন আর যাই করুন।

৩৮

দেশবন্ধু দীর্ঘজীবী হোন

‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ পত্রিকা, ১৫ জুন ১৯৪০ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আমাদের এই জগৎ ছেড়ে যাওয়ার পর দীর্ঘ পনেরো বছর অতিবাহিত হয়েছে। তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, স্বাধীন ভারত দেখে যাবেন, জীবনকালে সে-স্বপ্ন সত্য হল না, কিন্তু তাঁর কয়েকটি তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা সফল হয়েছিল। ঠিক যখন লোকে তাঁর কাছ থেকে মহৎ কিছু কিছু প্রাপ্তির আশা করছিল, মৃত্যুর নিষ্ঠুর হাত তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। দেশবাসীর অপরিমেয় আস্থা ও বিশ্বাস যখন তিনি জয় করেছিলেন, নিজেদের অন্তরে তারা তাঁকে রাজার আসনে বসিয়েছিল, তাই, তাঁর প্রয়াণে শোক যত আন্তরিক তত ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যুতে যখন আমরা শোক করব, তখন আমাদের এ-কথাও ভোলা উচিত নয় যে, সে-মৃত্যু গৌরবোজ্জ্বল। তিনি সেই হতভাগ্যদের মধ্যে একজন নন, যাঁদের জীবনের গৌরবের কথা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও যাঁদের আয়ু শেষ হয় না, যতদিন না ধীরে ধীরে ভাঁটার টানে তাঁদের জীবন শেষ হয়ে আসে, তাঁরা শেষ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীলে পরিণত হন।

আজ, তাঁর প্রয়াণ বার্ষিকীর প্রাক্কালে একটি চিন্তাই আমাদের মনে আর সব কিছুর ওপরে স্থান পেয়েছে, ‘‘হে দেশবন্ধু, আজ আমাদের এই দুঃখকষ্টের, কঠিন পরীক্ষার দিনে, ভারতের তোমাকে প্রয়োজন।’’ আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের যে দুর্লভ সম্মিলন ছিল তাঁর নেতৃত্বের মৌলিক উপাদান, তাঁর মহত্বের যা ছিল রহস্য, সেইটাই আজ আমাদের যত প্রয়োজন, আগে কখনও তা ছিল না। যে অপরিসীম ভালবাসা তাঁকে মানুষের বন্ধু করেছিল, মুসলিম এবং পশ্চাদপদ জাতিসমূহকে তাঁর কাছে টেনে এনেছিল, আমাদের তার প্রয়োজন।

আমাদের প্রয়োজন সেই উদ্যম যা তাঁকে থামতে দিত না, একটার পর একটা সংগ্রামে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যেত। সর্বোপরি আমাদের দরকার সেই সর্বগ্রাসী স্বাধীনতা-স্পৃহা। সমস্ত রকম অনুপ্রেরণার, সমস্ত কর্মতৎপরতার যা মূল উৎস।

তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য নিবেদন করি। যারা মহত্ত্বের শিখরে পৌঁছতে চায়, জীবনের প্রারম্ভেই তাঁদের মহত্ত্বকে পূজা করতে হবে, যেখানেই তাকে পাওয়া যায়। যারা বীর হতে চায় তাদের বীরপূজা শিখতে হবে। সেই কারণে ১৬ জুনের বার্ষিকী অনুষ্ঠান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-পেশা নির্বিশেষে সকলেরই সেই উপলক্ষে একত্র হওয়া উচিত।

বর্তমান লেখক দেশবন্ধুর অনুগত শিষ্য ছিল, এবং সেই মহাপ্রাণের কথা বলতে তার নিজেকে সম্বরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাঁর কাছে সে যত ঋণী তা অপরিশোধ্য। বস্তুত দেশবন্ধুর শিক্ষা তার সত্তার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

৩৯

প্যারিসের পর

‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ পত্রিকা, ১৫ জুন ১৯৪০ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

এই তো সেদিন, জার্মানির সীমানা পেরিয়ে নাৎসি বাহিনী যখন, হল্যান্ড এবং বেলজিয়ামে ‘‘চলো প্যারিস’’ এই বুলি মুখে নিয়ে ঢুকে পড়ল, তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছিল, তারা লক্ষ্যস্থলে অত শীঘ্র পৌঁছে যাবে? যুদ্ধের ইতিহাসে, যেন আমাদের চোখের সামনেই, একটা অলৌকিক ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম, যার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কিছুর জন্য আমাদের ফিরে তাকাতে হয় নেপোলিয়নীয় যুদ্ধ বা ১৮৭০ সালের ফ্রান্স- প্রুশিয়ার যুদ্ধে সেডানের বিপর্যয়ের দিকে, ফ্রান্সের সামরিক কর্তৃপক্ষ যাই বলুন, যান্ত্রিক পরিবহণ, অসংখ্য ট্যাঙ্ক এবং ডাইভ-বোম্বারের সামনে, প্যারিসের পতনের পর আর প্রকৃত কোনও প্রতিরোধই সম্ভব নয়, মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে থেকে যুদ্ধ চালনার দিনের অবসান হয়েছে।

কিন্তু অতঃ কিম? এটা পরিষ্কার যে, রেয়ঁদ সরকার গ্রেট ব্রিটেনকে ফেলে জার্মানির সঙ্গে আলাদা সন্ধি করবে না। কিন্তু তাঁর ওপরে ফ্রান্সের লোকেদের আস্থা তিনি কতদিন বজায় রাখতে পারবেন? তাঁর মন্ত্রীসভার পতন, জার্মানি ও ইতালির কাছ থেকে কোনও লোভনীয় প্রস্তাব, তাদের শর্তে শান্তি স্থাপনে প্রস্তুত নতুন কোনও মন্ত্রীসভা, এই সব ঘটনা সম্ভাব্যতার পরিধির বাইরে নয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. উইন্সটন চার্চিল, সেই রকম একটা অমঙ্গলসূচক ইঙ্গিত কয়েকদিন আগে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে দিয়েছিলেন।

আর ইংল্যান্ড? ফ্রান্স তার পক্ষে থাকলে, কিংবা না থাকলে তার কী করবার সম্ভাবনা? সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে সেই দুর্জ্ঞেয় বস্তুটি যার নাম ‘‘জনসাধারণের মনোবল’’, দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রিটিশ জনগণের মনোবল জোর ধাক্কা খেয়েছে। তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়

প্রধানমন্ত্রী এবং অন্য মন্ত্রীদের বক্তৃতায়। ব্রিটিশ জনসাধারণকে এ কথা বলার কেন প্রয়োজন হবে যে, তারা যেন মুখের এমন ভাব করে ঘুরে না বেড়ায় যেন তারা কোনও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে এসেছে। সারা পৃথিবীকে একথা বলার কেন দরকার হবে, নাৎসিরা যদি গ্রেট ব্রিটেন দখলও করে নেয়, সাম্রাজ্য যুদ্ধ চালিয়ে যাবে এবং ঈশ্বরেচ্ছায় ঠিক সময় এলে নতুন পৃথিবী (অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) পুরনো পৃথিবী (অর্থাৎ ইউরোপ)-কে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে। ব্রিটিশ জাতি তাদের নাছোড়বান্দা মনোভাবের জন্য এবং তাদের অটল স্নায়ুবলের জন্যও প্রসিদ্ধ, এখন তারা সম্ভবত তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন। এ পরীক্ষায় তারা কী রকম ফল করে দেখা যাক।

নাৎসিরা নতুন সামরিক কৌশলের সাহায্যে (যার উদ্ভাবন করেছেন তরুণতর জেনারেলরা) এবং অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক জেনারেলদের সাহায্যে এক অসাধ্য সাধন করেছে। মিত্রশক্তি নির্ভর করেছিল সামরিক খ্যাতির অধিকতর পক্ককেশ জেনারেলদের ওপরে। তাঁরা কিন্তু প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি, নাৎসি জেনারেলদের নব আবিষ্কৃত সমর কৌশলের ভাণ্ডার কি নিঃশেষ হয়ে গেছে? আরেক দিকে, মিত্রশক্তির আস্তিনের মধ্যে নতুন কোনও সামরিক কৌশল কি লুকোন আছে? অনেক কিছু নির্ভর করবে এই দুটি প্রশ্নের উত্তরের ওপর।

আমরা জার্মানি সৈন্যবাহিনীর রাসায়নিক অস্ত্র প্রস্তুতের কথা খুব শুনতাম। তারা কি রাসায়নিক যুদ্ধের নতুন কৌশল সম্পূর্ণ করে ফেলেছে? যদি করে থাকে তার পরিচয় আমরা আগামী দিনগুলোতে পাব। তখন দেখা যাবে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র সেই নতুন অবস্থায় কী রকম কাজ করে। তারা কি অক্ষম হয়ে যাবে, ইতালির বিমান বাহিনীর আক্রমণের ফলে সাহসী আবিসিনীয়দের যে-দশা হয়েছিল? নাকি মানুষের আত্মা জড়বস্তুকে পরাস্ত করবে?

বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বোঝা কঠিন গ্রেট ব্রিটেন শত্রুপক্ষের দখলে চলে গেলে যুদ্ধ কী করে চলতে পারে। মিত্রপক্ষকে সাহায্য করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটা সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে না, পাছে জাপান দূরপ্রাচ্যে বিপদের সৃষ্টি করে। এবং এরকমও কোনও আশা নেই যে, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস জার্মানি ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারবেন। এ-রকম সম্ভাবনাই খুব বেশি যে, এক দিকে সোভিয়েত রাশিয়া এবং আরেক দিকে জার্মানি এবং ইতালির মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট বোঝাপড়া হয়েছে, সেই বোঝাপড়ার শর্ত কী কী আমাকে যদি অনুমান করতে বলেন, আমি এই রকম ধরণের একটা বিবৃতি আন্দাজ করতে পারি:

(১) বলকান উপদ্বীপ বাদ দিয়ে ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে জার্মানি যা করতে চায় করতে পারবে;

(২) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইতালির সেই রকম স্বাধীনতা থাকবে;

(৩) বলকান উপদ্বীপ এবং মধ্যপ্রাচ্য হবে রাশিয়ার প্রভাবাধীন অঞ্চল;

(৪) আফ্রিকায় যাবতীয় বনসম্পদ সব বৃহৎ শক্তি ভাগ করে নেবে।

যেহেতু জার্মানি এবং ইতালি উভয়েই এবং সম্ভবত সোভিয়েত রাশিয়া, ব্রিটেনকে পয়লা নম্বর গণশত্রু মনে করে, এমনও সম্ভব যে তাদের একটা পরিকল্পনা আছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেওয়ায়। এ কাজে তারা জাপানের সাহায্য ও সহযোগিতা চাইতে পারে কারণ তারা জানে ডাচইন্ডিজ থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত সমগ্র দ্বীপপুঞ্জটির ওপর জাপান সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে থাকে।

পরিস্থিতির এই যে ছক এর মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? যাঁরা নিজেদের ভারতীয় জনগণের নেতা বলে দাবি করেন, তাঁরা এ প্রশ্নের উত্তর দিন।

৪০

নাগপুর চলুন

‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ পত্রিকা, ১৫ জুন ১৯৪০ সংখ্যায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

ফরওয়ার্ড ব্লকের সর্বভারতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হবে নাগপুরে ১৮ জুন, মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সম্মেলনের সঙ্গেই, কিংবা তার পরে। সর্বভারতীয় সম্মেলনের সময় হয়েছে, তা ছাড়া বর্তমান সঙ্কট, যা গভীর এবং কঠিন হয়ে উঠছে ঘণ্টায় ঘণ্টায়, তার জন্যও শীঘ্র অধিবেশন ডাকা অবশ্য প্রয়োজন।

এই সম্মেলনের সামনে করণীয় কী থাকবে? সন্দেহ নেই আমরা এতদিন কী করেছি না করেছি, কী পেয়েছি, না পেয়েছি, তার হিসাব নিকাশ এবং আত্মানুসন্ধান, প্রচুর করতে হবে, গত বারো মাসের ঘটনাবলীর পর্যালোচনার পর এবং আমাদের বর্তমান নীতি ও কার্ষক্রম হয় অনুমোদন করতে হবে, নয়তো প্রয়োজনে সংশোধন করতে হবে। কিন্তু তার চেয়েও যেটা জরুরি কাজ, ব্রিটিশ সরকার সংক্রান্ত আমাদের নীতি ও কার্যক্রম কী হবে তা ঠিক করতে হবে। রামগড়ে আমরা যে সংগ্রাম আরম্ভ করেছি তাকে তীব্রতর ও ব্যাপকতর করতে হবে। একই সঙ্গে আমাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্যও কাজ করে নিতে হবে। এই দুটি বিষয়েও অনেক প্রশ্ন উঠবে, তার সন্তোষজনক উত্তর দিতে হবে।

ভারত সচিব মি. আমেরি ‘হিন্দুস্তান টাইমস’ পত্রিকায় লন্ডনস্থিত সংবাদদাতার কাছে যে বিবৃতি দিয়েছেন এই প্রসঙ্গে সেটি অনুধাবনীয়। সেই বিবৃতি থেকে আমরা আবার দেখলাম, সাম্রাজ্যবাদীরা কোনওদিনই ইতিহাস থেকে কিছু শিক্ষালাভ করবে না। এই বিবৃতি যখন তিনি দিলেন, তখন জার্মানরা প্যারিসের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত!

নিজেদের দেশে তাদের যখন এই বিপদ, ব্রিটিশ সরকার তখন ভারত এবং ভারতের ধনসম্পদের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন পরাধীন ভারত, দরিদ্র শোষিত ভারত বর্তমান সঙ্কট থেকে সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যান্ডকে উদ্ধার করতে পারবে। নেতৃবর্গ যখন নৈতিক ও মানসিক পক্ষাঘাতে পঙ্গু, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে কোনও রকম অসুবিধায় ফেলতে চান না, ভারতের সামনে ভবিষ্যৎ তখন অন্ধকার।

তাই বলে আমরা কি হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ করব। আমাদের কমরেডরা কারাগারের জানলায় শিকের ভিতর দিয়ে বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁদেরকে আমরা কী বলব?

ফরওয়ার্ড ব্লকের ওপর সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ বঙ্গদেশে এবং তার বাইরে নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতর হয়ে উঠছে। সেইসঙ্গে ‘‘ওয়ার কমিটি’’ গড়া হচ্ছে সারা দেশে, যুদ্ধের জন্য পরাধীন ভারতকে শোষণের জন্য, আমাদের ইতিহাসে যা কখনও হয়নি সে রকম এই সঙ্কটের মধ্যে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে আমরা আমাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসকবর্গকে বলছি, ‘‘তোমাদের চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করছি, তোমরা আমাদের যত পারো আক্রমণ করো, স্বাধীনতার দিকে আমাদের যাত্রা তোমরা থামাতে পারবে না।’’

নাগপুর অভিভাষণ

১৮ জুন ১৯৪০, নাগপুরে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লকের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্য

কমরেডগণ,

১৯৩৯-এর মে মাসের প্রথম দিকে, অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনের পরে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ফরওয়ার্ড ব্লকের উদ্বোধন হয়েছিল। ১৯৩৯-এর জুন মাসের শেষ সপ্তাহে ফরওয়ার্ড ব্লকের সারাভারত সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে ফরওয়ার্ড ব্লকের গঠনতন্ত্র এবং কর্মসূচি গৃহীত হয়। তারপর এক বছর অতিবাহিত হয়েছে। এমন একটি বছর যা শুধু ভারতের ইতিহাসে নয়, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কাজেই আমরা মিলিত হচ্ছি অত্যন্ত উপযুক্ত সময়ে, এর চেয়ে এক দিন বেশি দেরি করলেও দেরি হয়ে যেত। আমাদের প্রচুর পরিমাণে আত্মানুসন্ধান এবং সাফল্য অসাফল্যের হিসাব-নিকাশ করতে হবে। তারপরে ভারতের ওপর ও সারা পৃথিবীর ওপর যে সঙ্কট এসে পড়েছে তার মধ্যে আমাদের কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে। সেই সঙ্কট শুধু দিনে দিনে নয়, ঘণ্টায় ঘণ্টায় গভীর হচ্ছে, কঠিন হচ্ছে।

প্রথম যে প্রশ্ন আমি আপনাদের সামনে রাখতে চাই তা হল, আমাদের নীতি ও কার্যক্রম কি ঠিক হয়েছে? ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করে আমরা কি দেশের মঙ্গলের জন্য যা সর্বোত্তম তাই করেছি? আমার উত্তর 'অবশ্যই হ্যাঁ'। আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, ফরওয়ার্ড ব্লক স্থাপন করতে আমরা বাধ্য হয়েছি চারটি কারণে। দক্ষিণপন্থীরা আমাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে তাঁরা বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন না এবং আমাদের মিশ্র মন্ত্রীসভার দাবি তাঁরা খারিজ করে দিয়েছেন; দ্বিতীয়ত, মহাত্মা গান্ধী এবং দক্ষিণপন্থীরা আমাদের জানিয়েছেন, অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় আন্দোলনের কোনও প্রশ্ন ওঠে না; তৃতীয়ত কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং আমূল পরিবর্তনকামী যাঁরা আছেন তাঁদের সংহত করার প্রচেষ্টা সমাজবাদী এবং কমিউনিস্টরা ত্যাগ করেছেন। অতএব বামপন্থীদের সংহত করার চেষ্টা পুনরায় শুধুমাত্র আমরাই করতে পারি এবং তার জন্য ফরওয়ার্ড ব্লক অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে; চতুর্থত গান্ধীপন্থী কিংবা দক্ষিণপন্থীরা ইতিমধ্যেই নিজেদের সংহত করে ফেলেছেন গান্ধী সেবা সঙ্ঘের ছত্রতলে এবং আমরা যদি আর দেরি করতাম, তার পরিণতি হত কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা দক্ষিণপন্থী তাঁদের দ্বারা বামপন্থীদের শ্বাসরোধে হত্যা।

১৯৩৯ সালে পরিষ্কার বোঝা যায়, বামপন্থী হিসাবে যাঁরা ১৯২০ এবং ১৯২১-এ কংগ্রেসে নাম লিখিয়েছিলেন এবং প্রায় দুই দশক ধরে কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে রেখেছেন, তাঁরা এখন আর বিপ্লবী নন, এমনকী আমূল পরিবর্তনকামীও নন; এই রকম পরিস্থিতিতে আরও অগ্রগতি করতে গেলে তার জন্য দেশের বিশেষ করে কংগ্রেসের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আমূল পরিবর্তনকামী ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে।

এপ্রিল ১৯৩৯-এর শেষদিকে যখন আমি গুরুত্বপূর্ণভাবে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ

করার কথা এবং ফরওয়ার্ড ব্লক স্থাপন করার কথা চিন্তা করছিলাম, কংগ্রেসের একজন বড় বামপন্থী নেতার সঙ্গে আমার একটি কৌতূহলোদ্দীপক কথাবার্তা হয়। সেই নেতা এখন গান্ধীপন্থীদের আলিঙ্গনে বন্দি। তিনি আমাকে পরামর্শ দেন, আমি যেন ও দুটি কাজের কোনওটিই না করি, এবং আরও বলেন, যেহেতু একটি আন্তর্জাতিক ঝড় উঠবার উপক্রম হয়েছে, কংগ্রেসের মধ্যে কোনও রকম বিভেদ আমাদের পরিহার করা উচিত, আমি জবাবে বললাম, অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ যখন বাধবেই, তখন বামপন্থীদের আগে থেকেই সংগঠিত হওয়া, প্রস্তুত হওয়া আরও বেশি জরুরি, যাতে দক্ষিণপন্থীরা যুদ্ধের পরিস্থিতিতে যদি ভয় পেয়ে যান, আমরা অন্তত নিজেরাই কিছু করতে পারি। দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থীদের মধ্যে বিভেদ এত গভীর হয়ে গেছে যে সাময়িক কিংবা স্থায়ী, একটা ভাঙন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এই যখন অবস্থা, এইটাই বাঞ্ছনীয় ছিল যে ভিতরকার সঙ্কটটা বাইরে বেরিয়ে আসুক, এবং সেটা আমরা অতিক্রম করে যাই বাইরের কিংবা আন্তর্জাতিক সঙ্কট আমাদের ওপর এসে পরবার আগেই। আমি আরও বললাম, বন্ধুর পরামর্শে রাজি হয়ে আমি যদি এখনকার মতো চুপচাপ থাকি, আন্তর্জাতিক সঙ্কট দেখা দিলে অবস্থাটা আমাদের পক্ষে আরও খারাপ হবে। সেই সঙ্কটে আমরা দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে কখনই একমত হতে পারব না। কিন্তু সেই সময়ে যদি আমরা নিজেরাই কিছু করতে চাই, লোকে সেই ভাঙনের জন্য আমাদেরই দোষ দেবে। উপরন্তু আমরা স্বাধীনভাবে কিছু করবার চেষ্টা করলে আমাদের পিছনে কোনও সংগঠন থাকবে না যার ওপর আমরা নির্ভর করতে পারি। অতএব আমার বন্ধুর যুক্তি আমার অবস্থানটাকেই আরও জোরাল করবে।

পিছন ফিরে বিগত বারো মাসের দিকে যদি তাকাই, আমরা কি দাবি করতে পারি না, যে-সব ঘটনা ঘটেছে তাতে আমাদের নীতি এবং কাজকর্মের ধারাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে? স্বামী সহজানন্দের (এবং অধ্যাপক রঙ্গ, কমরেড যাজ্ঞিক প্রভৃতির) কিষানসভা, এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের কথা বাদ দিলে এখন আর কী আছে যে দক্ষিণপন্থীদের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে? ১৯৩৯-এর জুন মাসে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের পরে, যে বাম সংহতি সমিতির জন্ম হয়েছিল তা এখন ভেঙে গেছে। রায়পন্থী (অথবা র‍্যাডিক্যালপন্থী) কংগ্রেস সমাজবাদী এবং কমিউনিস্ট (অথবা জাতীয় ফ্রন্টবাদীরা) একে একে বামসংহতি সমিতি ছেড়ে চলে গেছেন এবং এ দেশে বামপন্থী আন্দোলনের পুরোগামী হিসাবে কাজ করে চলেছে একমাত্র কিষাণসভা এবং ফরওয়ার্ড ব্লক। রামগড়ে মার্চ ১৯৪০-এ আমাদের সারা ভারত আপোস বিরোধী সম্মেলনের সময়েই সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। সেখানে আমরা দেখলাম, রায়পন্থী, কংগ্রেস সমাজবাদী এবং ন্যাশন্যাল ফ্রন্টবাদীরা সম্মেলন বয়কট করে গান্ধীবাদীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেন।

আজ আর এ বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ কোনও কারণ থাকতে পারে না যে, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং কিষান সভা যদি না থাকত বিগত বারো মাস গান্ধীবাদীরা যে নীতি ও যে কর্মধারা অনুসরণ করে চলেছেন, তার বিরুদ্ধে মুখ খুলবার মতো কেউ থাকত না।

আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে বিবেচনা করব। বিগত বছরে আমরা প্রকৃতপক্ষে কী করতে পেরেছি?

প্রথমত, কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে সাংবিধানিকতা এবং আপোস পন্থার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল তাকে প্রতিরোধ করতে পেরেছি। আমাদের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ব্রিটিশ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে বিভিন্ন কংগ্রেস মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ

করতে হয়। তাঁরা যদি পদত্যাগ না করতেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবাহী হিসাবে তাঁরা ভারত সরকারের যুদ্ধ সংক্রান্ত নীতি পালন করতে বাধ্য হতেন। সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোনও আপোস করা হয়নি। এবং তার জন্য ন্যায্যতই আমরা কিছু কৃতিত্ব দাবি করতে পারি।

দ্বিতীয়ত, এ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ প্রচেষ্টায়— কংগ্রেসের সহযোগিতা লাভের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করেছি। বন্ধুদের স্মরণ থাকবে, ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে যখন মহামান্য ভাইসরয় যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে সিমলায় আমন্ত্রণ করেছিলেন, মহাত্মাজি এই মত প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছিলেন যে, বর্তমান যুদ্ধে ব্রিটেনকে ভারতের নিঃশর্ত্ত সাহায্য দান করা উচিত, উপরোক্ত সাক্ষাৎকারের পর অনতিবিলম্বে মহাত্মাজি সেই মতো একটি প্রেসনোট আবার ব্যক্ত করেন। তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কংগ্রেস কমিটি, যাঁরা সাধারণত অন্ধভাবে গান্ধীজিকে অনুসরণ করে থাকেন, এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর মতামত অগ্রাহ্য করেছেন। এইরকম ঘটনা কি ঘটত, যদি কিষান সভা এবং ফরওয়ার্ড ব্লক না থাকত?

তৃতীয়ত, সম্ভবত আমরা দাবি করতে পারি যে, আমরা একটা সংগ্রামের আবহাওয়া তৈরি করতে পেরেছি। আজ আমরা দেখছি কংগ্রেস নেতারা শার্ট-হাফপ্যান্ট পরে কুচকাওয়াজ করছেন এবং কংগ্রেস কমিটিগুলিকে সত্যাগ্রহ কমিটিতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। তা ছাড়া, দক্ষিণপন্থী নেতারা অনবরত সংগ্রামের কথা বলে চলেছেন। এসব কি হত ফরওয়ার্ড ব্লক না থাকলে এবং রামগড়ে আপোস বিরোধী সম্মেলন দেখিয়ে না দিত কোন দিকে জনমত যাচ্ছে? এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, আজ সর্বত্র বাতাসে সংগ্রামের কথা এবং আমাদের লোকেরা সে কথা যত বলবে, তত তারা আপোসের দিক থেকে সরে আসবে।

পরিশেষে আমরা দাবি করতে পারি যে রামগড়ে আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি এবং সহায়-সম্পদ দিয়ে আমাদের সংগ্রাম আরম্ভ করেছি। বিগত তিন মাসে আমাদের সহকর্মীদের অনেকে, তার মধ্যে দেশের অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি আছেন, গ্রেপ্তার হয়েছেন, কারারুদ্ধ হয়েছেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের সারা ভারত ওয়ার্কিং কমিটির নয় জন সদস্য বর্তমানে কারাগারে, কিংবা অন্তরীন আছেন। তা ছাড়া সহজানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে কিষান সভার নেতারা, অধ্যাপক রঙ্গ এবং অন্যেরা এখন কারান্তরালে।

যে জাতীয় সংগ্রাম আমরা রামগড়ে আরম্ভ করেছি তার শক্তি এবং আকার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে-লড়াই বিহার এবং যুক্তপ্রদেশে যথেষ্ট অগ্রগতি করেছে। বঙ্গদেশে সংগ্রাম আরম্ভ করা হয়েছিল অনেকদিন আগে, ১৯৪০-এর সেপ্টেম্বরে নাগরিক স্বাধীনতার প্রশ্নে। সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এ সরকার যে কঠোর অর্ডিনান্সগুলি জারি করেছে তাতে নাগরিক স্বাধীনতা লঙ্ঘন করা যাচ্ছে। বঙ্গীয় কংগ্রেস যে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করে তার ফলে সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এর আগেকার অবস্থা অনেকাংশে ফিরে আসে। ঢাকাতে ২৫ এবং ২৬ মে, ১৯৪০-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনে প্রদেশের পরিস্থিতি বিচার করা হয় এবং সেই সংগ্রাম তীব্রতর এবং ব্যাপকতর করবার একটি পরিকল্পনা রচনা করা হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সে-পরিকল্পনা কার্যকর করবে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আলোচনা করবার আগে, সবসময়ে আমাদের সম্পর্কে দু-একটি যে সমালোচনা করা হয়, তার বিষয়ে বলতে চাই। যেমন, আমাদের বলা হয়, আমরা কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছি। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, বিভেদ সৃষ্টি করেছেন গান্ধীপন্থীরাই

বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে। আমরা বরাবর যৌথ আন্দোলন চেয়ে এসেছি এবং তার জন্যে চেয়েছি মিশ্র মন্ত্রীসভা, যাতে সে আন্দোলন নিশ্চিত হয়।

আমাদের আরও বলা হয়, বামপন্থীদের মধ্যে সংহতি আমরা নষ্ট করেছি। কিন্তু সংহতি আমরা নষ্ট করিনি। রায়বাদীরা, কংগ্রেস সমাজবাদীরা এবং জাতীয় ফ্রন্টবাদী (কমিউনিস্ট)-রা, একের পর এক বাম সংহতি কমিটি পরিত্যাগ করে চলে গেছেন। আমরা বারো মাস আগে যেখানে ছিলাম আজও ঠিক সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছি। এই কয়েক মাস আমরা একটা কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। কষ্টভোগ, নির্যাতন, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, পরিহাস, এইসবই জুটেছে আমাদের কপালে। কিন্তু আপোসহীন সংগ্রামের পথ ধরে চলেছি অবিচলভাবে। আমাদের বহু সংখ্যক সহকর্মীকে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব নিগ্রহ করেছে এবং বঙ্গদেশে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির স্বীকৃতি প্রত্যাহৃত হওয়ার পর, যেসব কংগ্রেসি আমাদের মতো মনোভাবসম্পন্ন তাঁদের সবাইকে কার্যত কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

এই পর্বে এসে যে-প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে সেটি হল রায়বাদী এবং অন্যান্যরা আমাদের ছেড়ে গেলেন কী কারণে? আমি যতদূর বুঝি, তাঁদের ভয় পাছে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হন এবং বোধহয় তাঁরা মনে করছেন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গেলে তাঁদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমার আমোদ বোধ হয় এই যে কমরেডরা আশা করেছিলেন দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সংগ্রাম করবেন এবং অনুমান করতে পারেননি, দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের হাতে পরাস্ত হওয়ার আগেই যতটা পারেন ক্ষতি করবেন, কংগ্রেসে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য যতটা সাধ্য চেষ্টা করবেন। যে মেরুদণ্ড, সহনশক্তি এবং চরিত্রের কাঠিন্য দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সংগ্রাম করে জয়ী হওয়ার জন্য প্রয়োজন, এই বামপন্থী কিংবা বোধহয় বলা উচিত তথাকথিত বামপন্থীদের তা নেই। আমরা আমাদের সংগ্রামের এমন একটা পর্বের মধ্যে দিয়ে এখন যাচ্ছি, যখন ইতিহাস আমাদের সবাইকেই পরীক্ষায় দাঁড় করাবে এবং সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দেবে, কারা ভারতের প্রকৃত বামপন্থী।

আমাদের আরও বলা হয়, গান্ধীপন্থীদের সহায়তা না পেলে আমাদের আন্দোলন ব্যর্থ হবে। এই অভিযোগ সম্পর্কে আমাদের উত্তর, আমাদের আন্দোলন সফল হবে কিনা এখনই বলা যায় না। সেটা নির্ভর করে জনসাধারণ সে-আন্দোলনে যোগ দেবে কিনা তার ওপরে। কোনও অহিংস আন্দোলনের পতাকার নীচে জনসাধারণকে সমবেত করতে চিরদিনই কিছু সময় লাগে। কাজেই আমাদের ধৈর্য ধরে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

তবু, তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই, সেই সংগ্রাম ব্যর্থ হল, তার অর্থ কি এই যে, সে সংগ্রাম আরম্ভ করা আমাদের উচিত ছিল না? অন্যদিকে আমরাও কি বলতে পারতাম না, ১৯২১, ১৯৩০ এবং ১৯৩২-এর সংগ্রাম আরম্ভ করা উচিত ছিল না, কারণ সেইসব সংগ্রাম স্বরাজ এনে দেয়নি? অনেক ব্যর্থতার ওপরই সাফল্যের অধিষ্ঠান হয়। অতএব আমরা যদি চতুর্থবারও বিফল হই, তাতে কী এসে যায়? চেষ্টা করে সাফল্য লাভ করতে না পারার চেয়ে আদৌ কোনও চেষ্টাই না করা বেশি অগৌরবজনক। আজ সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আমাদের দিকে। আজকে যে সুবর্ণ সুযোগ এসেছে আমরা যদি সেটাকে চলে যেতে দিই, পৃথিবীর স্বাধীনতা-প্রেমী যেসব জাতি, তারা আমাদের কী ভাববে? এমন সুযোগ একটি জাতির জীবনে দুর্লভ। কিন্তু আমরা যদি সংগ্রাম করে বিফল হই, কেউ আমাদের খারাপ ভাববে না।

আরেকটা কথাও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, ভবিষ্যৎ কাল আজ থেকে বিশ কি

পঞ্চাশ বছর পরে আমাদের কী ভাববে, আজ যদি আমরা আমাদের কাজে পৌরুষের পরিচয় না দিই? ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ সালে যাঁরা দেশের কাজে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন সেই নেতাদের আজকের লোক কী মনে করে? অতএব আমি সাহসে বুক বেঁধে বলছি, আমরা যদি সময়ের দাবি পূরণ না করি, অবিলম্বে সংগ্রামে যোগ না দিই, ইতিহাস কিংবা ভবিষ্যৎকাল আমাদের কখনওই ক্ষমা করবে না।

এক বছর আগে যখন ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করা হয়, আগামী সংগ্রাম এবং তাঁর জন্য আগে থেকে কী করে প্রস্তুত হতে হবে, সেইসব ভাবনাই আমাদের ঘাড়ের ওপর চেপে বসেছিল। সেই সময়ে আমরা জানতাম না, বহির্জগতের ঘটনাবলী এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের নানা ঘটনা পূর্ণ স্বরাজ লাভের জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে কতদূর সাহায্য করবে, আদৌ সাহায্য করবে কি না, সেই কারণে জীবনে এবং কাজে "আত্মনির্ভরতাকেই আমাদের মন্ত্র বানিয়েছিলাম। আজ পরিস্থিতির খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে যে লড়াই বেধেছে তাতে পুরনো সাম্রাজ্যবাদীদের বেশ ভালরকম হার হচ্ছে। বিগত কয়েক সপ্তাহ জার্মানরা বিদ্যুৎগতিতে তাদের যুদ্ধ চালিয়ে গেছে। কয়েকদিনের মধ্যে একের পর এক রাজা এবং রাজ্য ধরাশায়ী হচ্ছে এবং জার্মান সৈন্য প্যারিসের দরজার দিকে এগিয়ে গেছে এবং সব শহরের রানি প্যারিসকে যেভাবে দখল করেছে তা দেখে একজন অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষের মনে হয়েছে সমরবিজ্ঞানে এ এক অলৌকিক ঘটনা। ইউরোপে যে চোখধাঁধানো দ্রুত পটপরিবর্তন ঘটেছে তার ধাক্কা ভারতেও পৌঁছন অনিবার্য ছিল। ইউরোপে একটা করে চোট খাবে, আর ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারতের ওপর এবং তার অধীন অন্য দেশগুলোর ওপর ক্রমশঃ আলগা হয়ে আসবে। ইতিহাসের চাকা ঘুরেই চলবে, ভারতে আমরা যাই করি না কেন। কাজেই একটি শিশুরও বোঝা উচিত, আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পূর্ণ স্বরাজ লাভ করার জন্য বারো মাস আগে যা ছিল, তার চেয়ে অনেক কম প্রচেষ্টা এবং ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হবে। তবে, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী আমাদের হাতে যে সুযোগ এনে দিয়েছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবার জন্য নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ঐক্য এবং সংহতি আমাদের প্রয়োজন। আজ যদি ভারত সম্মিলিত কণ্ঠে কথা বলিতে পারত, আমাদের দাবি প্রায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠত। তা থেকে বুঝতে পারা যায় জাতীয় সংগ্রামকে যেমন আমরা তীব্রতর করব, তার ব্যাপকতা বৃদ্ধি করব, সেই সঙ্গে যতদূর সম্ভব, জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি আমাদের বাড়িয়ে তুলতে হবে। আর যাই হোক, একটা সংগ্রাম অবশ্যই চাই। সেটা না হলে আমাদের শাসকরা সহজে নত হবেন না। আমরা অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি যে, সাম্রাজ্যবাদীরা কখনও ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে না। তার ওপরে, আমাদের নিজেদের নেতারা হয়তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটা আপোসের পথে যেতে চাইবেন, যদি আন্দোলনের মাধ্যমে বামপন্থীদের যে চাপ সেটা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। অতএব আপনাদের ভেবে দেখতে হবে, এখনই কী কী কাজ করা দরকার। সংগ্রাম তীব্রতর ও ব্যাপকতর করবার জন্য এবং সেই সঙ্গে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি দৃঢ়তর করতে হবে। জাতীয় ঐক্য আসতে পারে না চলমান সংগ্রামের ভিত্তিতে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ঐক্য এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মতো অন্য সংগঠনগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপিত না হলে নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য এবং সংহতি সময় থাকতে যদি আমরা গড়ে তুলতে পারি, আমরা অবশ্যই আশা করতে পারি দেশ এখন যদি কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়েও যায় এবং ইউরোপে যদি ঘোর বিপর্যয়ের ঘটনাও ঘটে,

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে ভারতীয় জনগণের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হবে।

ভারতীয় বিদ্রোহ যে রক্তাক্তই হতে হবে কিংবা তাকে যে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে দিয়েই যেতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। বরং এইটাই কাম্য যে সেই বিদ্রোহ যেন যতটা সম্ভব শান্তিপূর্ণ হয় এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থা নিশ্চিত করা যাবে, যদি জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং তাঁদের স্বাধীনতা লাভ করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

আপনাদের কাছে আমার নিজের পরামর্শ, এখনই আমাদের দেশবাসীর মধ্যে যাওয়া উচিত, এই আওয়াজের পিছনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, ''সমস্ত ক্ষমতা ভারতের জনগণের হাতে দিতে হবে।'' এই আওয়াজ এক মুহূর্তে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো জাতিকে উজ্জীবিত করে তুলবে। এই দাবি যাতে কার্যকর হয়, অপ্রতিরোধ্য হয়, আমাদের উচিত সমস্তরকম প্রচেষ্টা করা জাতীয় ঐক্য স্থাপনের জন্য, তার জন্য প্রয়োজন হবে একটি ব্যবস্থা, যার দ্বারা যে-কোনও পরিস্থিতিতে জনগণের মধ্যে সঙ্গতি ও সদ্ভাব রক্ষিত হয়। সেইরকম একটি ব্যবস্থা হবে সর্বদলীয় একটি নাগরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তুললে। কিন্তু সে-বাহিনীর সম্পূর্ণ সরকার-নির্ভরতা-মুক্ত হওয়া চাই এবং সে যেন দাসত্ব শৃঙ্খল ও বন্দি যে-ভারত তার রক্ষার জন্য কাজ না করে। আমাদের নাগরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর একমাত্র লক্ষ্য হবে দেশের মধ্যে শান্তি, সংহতি এবং সদ্ভাব রক্ষা করা। দেশকে সামরিকভাবে অন্য কোনও শক্তির হাত থেকে রক্ষা করা সে কাজ সরকারেরই হওয়া উচিত, জনসাধারণের নয়। যতদিন ভারত পরাধীন থাকবে, আমাদের পরাধীনতা যাতে দীর্ঘস্থায়ী হয় সেইজন্য যুদ্ধ করায় আমাদের কী আগ্রহ থাকতে পারে? পরাধীন ভারতের রক্ষার জন্য যুদ্ধ করার অর্থ তো তাই।

এই ভাষণের উপসংহারে আজ এবং আগামীকালের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আলোচনা করবার আগে আমি ফরওয়ার্ড ব্লকের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ব্লকের জন্ম হয়েছে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে, সে কোনও ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর সৃষ্টি নয়। যতদিন ব্লক কোনও ঐতিহাসিক প্রয়োজন সাধন করবে, ততদিন তা বেঁচে থাকবে, তার বাড়-বাড়ন্ত হবে, ভিতরের এবং বাইরের সব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও। আমাদের আরও মনে রাখা উচিত, আমাদের ইতিহাসের স্বাধীনতা-উত্তর পর্বেও তার একটা ভূমিকা থাকবে। স্বাধীনতা জয় করবার পর তাকে সে-স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে এবং তাকে গড়ে তুলতে হবে একটি নতুন ভারত, সুখী ভারত যা স্থাপিত হবে স্বাধীনতা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তির ওপর। আমরা যেন এই কথা ভেবে মারাত্মক ভুল না করি যে, স্বাধীনতা জিতে নেওয়ার পর আমাদের আর কোনও কাজ থাকবে না। যে সংগঠন কিংবা দল স্বাধীনতা জয় করবে, তাকেই দায়িত্ব নিতে হবে স্বাধীনতা-উত্তর পুনর্গঠনের। একমাত্র সে-ভাবেই অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে।

এখন আমরা আলোচনা করব আজকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং আগামীকাল সে পরিস্থিতি কীরকম হতে পারে। মি. উইন্সটন চার্চিল এবং মঁসিয়ে পল রেয়ঁদের অকপট বিবৃতি পাঠ করবার পর পরিস্থিতির প্রধান বিষয়গুলি, যুদ্ধের দ্রুত গতি থেকে যার উদ্ভব হয়েছে, তাকে স্বীকার না করে উপায় নেই। প্রত্যেকদিন বেশি করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, মঁসিয়ে পল রেয়ঁদ তখনকার পরিস্থিতির সংক্ষেপে যে বিবরণ দিয়েছেন, (''মিত্র শক্তির জয় সম্ভব একমাত্র কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটলে'' সামরিক পরিস্থিতির সঠিক বর্ণনা)। চিত্রটি তখনই অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, পরে আরও অন্ধকার হয়ে এসেছে। আজকের দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ সত্যই

নৈরাশ্যজনক। এবং যদি মনে রাখি, এ যুদ্ধ একনায়কতন্ত্রের, আমরা হৃদয়ঙ্গম করব, যে-পক্ষের পরাজয় হচ্ছে, তাদের অবস্থা কত সঙ্গীন।

এবং এ-কথাও আমরা মানতে পারি, মঁসিয়ে রেয়ঁদের সেই প্রতিজ্ঞা যা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "যুদ্ধ আরও প্রবল করা, পরাজয় স্বীকার না করা", তা অত্যন্ত বীরত্বব্যঞ্জক এবং দৃঢ়তার পরিচায়ক এবং তিনি শূন্যগর্ভ আস্ফালন করছেন না। কিন্তু অতসব সত্ত্বেও, যখন তিনি বলেন, "আমরা আমাদের কোনও এক প্রদেশে প্রবেশদ্বার বন্ধ করে থাকব এবং সেখান থেকেও বিতাড়িত হয়ে উত্তর আফ্রিকায় যাব এবং প্রয়োজন হলে আমেরিকায় আমাদের উপনিবেশে যাব", তখন তাঁর কথায় আস্থা স্থাপন করতে পারি না।

এভাবে জয়লাভ করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যায় না। মিত্র শক্তির যদি ইউরোপে দাঁড়াবার জায়গা না থাকে, তারা হয়তো আফ্রিকায়, এশিয়ায়, এমনকী আমেরিকাতেও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু যুদ্ধের যা অন্তিম লক্ষ্য, জয়, তা লাভ করতে এর ফলে কোনও সুবিধা হবে না।

আজ আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে যুদ্ধের নগ্ন বাস্তবতা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে পরিষ্কার আলোয় স্পষ্ট করে পরীক্ষা করবার। ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের যাঁরা নেতা তাঁরা স্পষ্ট কথা বলেছেন, আমাদেরও নিজেদের কাছে নিজেদের যা বলবার, স্পষ্ট করে বলা উচিত।

মিত্রশক্তি যে ক্রমাগত হেরে যাচ্ছে তার কারণ সম্ভবত নিহিত আছে তাদের যে কার্যপ্রণালী তার মধ্যে। সে এমন এক প্রণালী যে, মি. ক্লেমেন্ট অ্যাটলি বলেছেন, সংকটের কালের প্রয়োজন মেটাতে তা অক্ষম। সেই প্রণালীর মৌলিক দুর্বলতা এই যে, তাতে দাসত্ব এবং স্বাধীনতা পাশাপাশি অবস্থান করেছে এবং তারই ফলে প্রচার-যুদ্ধে ব্রিটেনে সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়েছে। 'ডেলি মেল' পত্রিকার মতে তাই হয়েছে। জার্মানি থেকে রেডিওর প্রচার শুধু ব্রিটেনের জনসাধারণের ওপরই নয়, তাদের সশস্ত্র বাহিনীর ওপরও পড়েছে। 'ডেলি মেল' বলেছে "গোয়েবলস ফাঁকা মাঠে গোল করে বেরিয়ে গেছেন।"

কিন্তু আমাদের চিন্তা বিশেষ কোনও প্রণালী অথবা পদ্ধতি নিয়ে নয়, কাজের মূল নীতি নিয়ে। মূল প্রশ্নগুলি অস্বচ্ছ করে দিয়ে, "অন্তর্ঘাত" বলে চিৎকার করে, আমাদের যেসব মৌলিক অধিকার, তার জন্য আমাদের দাবি আদায় করার প্রচেষ্টা থেকে আমাদের কেউ বিরত করতে পারবে না। অত্যন্ত চতুর সাম্রাজ্যবাদী প্রচার আমাদের অত্যন্ত বেশিদিন প্রতারিত করে এসেছে।

এই যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঘটনাপ্রবাহ, তার মধ্যে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে, সে-কথা আমরা নিজেদের জিজ্ঞাসা না করে পারি না। মিত্রশক্তির যেসব শক্তিশালী পুরুষ এবং যাঁরা রণকৌশল বিশারদ তাঁদের নৈরাশ্যজনক চিন্তা-ভাবনার পরে আমাদের ভাবতেই হচ্ছে ব্রিটিশদের প্রতিরোধ যদি ভেঙে পড়ে তা হলে আমরা কী করব। এটা অসম্ভব কিছু নয়। বস্তুত, প্রধানমন্ত্রী মি. চার্চিল ব্রিটেনের পরিজয়ের কথা মাথায় রেখেই কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। এখন মঁসিয়ে রেয়ঁদ যে ধরনের কথা বলেছেন, মি. চার্চিল আগেই তা বলেছেন, সাম্রাজ্যের দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ার কথা, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য। মনে হচ্ছে আমাদের রাজনীতিজ্ঞদের কারও কারও একটা স্বপ্ন, একনায়কের বাহিনীর দলবলকে বাধা দেওয়ার জন্য ভারত গণতন্ত্রের একটা ঘাঁটি হয়ে উঠবে। কী উদ্ভট কল্পনা!

ফ্রান্সের দিকে ইংলিশ চ্যানেলের প্রায় সমগ্র উপকূল জার্মানদের দখলে, যার ফলে সাধারণ

যোগাযোগ কঠিন এবং বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে এবং সৈন্য চলাচল অসম্ভব বললেই চলে। আক্রমণকারীদের হাতে এখন ফ্রান্সের সবচাইতে ভাল ভাল শিল্পাঞ্চল। ফ্রান্সের হৃৎপিন্ড প্যারিস এখন নিথর। শ্যাম্পেন অঞ্চলে একটি শক্তিশালী জার্মান অভিযান গড়ে উঠছে, ম্যাজিনো লাইনকে অবশিষ্ট ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য। দক্ষিণ পূর্বে শক্তিশালী এবং তাজা ইতালিয়ান সৈন্যরা চাপ দিচ্ছে এবং সর্বত্র পশ্চাদপসরণরত ফরাসি বাহিনীকে জার্মান সামরিক বাহিনী (যার শ্রেষ্ঠত্ব এখন স্বীকৃত), তার বিমান বাহিনী (যার শ্রেষ্ঠত্বও স্বীকৃত) বিব্রত করে চলেছে। ইউরোপে মিত্রশক্তির এই হল নৈরাশ্যজনক চিত্র। উত্তরে সুমেরু অঞ্চল থেকে আটলান্টিক পর্যন্ত নাৎসি ঈগল প্রসারিত করে দিয়েছে তার ডানা। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, আমাদের বলা হচ্ছে, আশাবাদের কোনও কারণ নেই।

এই সেদিন নাৎসি যোদ্ধার দল জার্মান সীমান্ত পেরিয়ে হল্যান্ড এবং বেলজিয়ামে প্রবেশ করল, ''প্যারিস চলো'', ধ্বনি মুখে নিয়ে, তখন স্বপ্নেও কে ভাবতে পেরেছিল তাদের লক্ষ্যস্থলে তারা অত দ্রুত পৌঁছে যাবে? সামরিক সংঘর্ষে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল যেন আমাদের চোখের সামনে। এর তুল্য কিছুর জন্য আমাদেরকে নেপোলিয়নের নানা যুদ্ধের কিংবা ১৮৭০ সালে ফ্রান্স-প্রুশিয়া যুদ্ধে সেদানের বিপর্যয়ের কথা মনে করতে হবে। ফ্রান্সের নেতৃত্ব যাই বলুন, যন্ত্রচালিত পরিবহণ, অসংখ্য ট্যাঙ্ক ও ডাইভ বোমারু বিমানের সামনে প্যারিসের পতনের পর যাকে প্রতিরোধ বলা যায় এমন কিছুই সম্ভব নয়। পরিখা খুঁড়ে তার ভিতর থেকে যুদ্ধ চালানোর দিন অতীত হয়েছে।

কিন্তু এরপর কী হবে? স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, রেয়ঁদের সরকার ব্রিটেনকে একলা ফেলে জার্মানির সঙ্গে স্বতন্ত্র শান্তিচুক্তি সই করবে না। কিন্তু ফরাসিবাসীদের আস্থা আর কতদিন তাঁর ওপরে বজায় থাকবে? তাঁর মন্ত্রীসভার পতন, জার্মানি ও ইতালির দিক থেকে একটি লোভনীয় প্রস্তাব, ওইসব শর্তে শান্তি স্থাপনের জন্য প্রস্তুত নতুন একটি মন্ত্রীসভা, এর কিছুই অসম্ভব নয়। কয়েকদিন আগে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. উইন্সটন চার্চিল তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতায় তাঁর দুশ্চিন্তাজনক কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন।

এবং ইংল্যান্ড? ফ্রান্স সঙ্গে থাকলে এবং ফ্রান্স সঙ্গে না থাকলে তার কী করার সম্ভাবনা? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে ''জনগণের মনোবল'' নামক সেই দুর্জ্ঞেয় বস্তুটি। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রিটিশ জনগণের মনোবল প্রবলভাবে বিচলিত এবং তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় প্রধানমন্ত্রী এবং অন্য মন্ত্রীদের বক্তৃতা থেকে। পৃথিবীকে একথা জানাবার কেন প্রয়োজন হবে যে, নাৎসিরা গ্রেট ব্রিটেন অধিকার করে নিলেও, সাম্রাজ্য যুদ্ধ চালিয়ে যাবে এবং ঈশ্বরেচ্ছায় যখন সময় হবে, নতুন বিশ্ব (পশ্চিম গোলার্ধ্ব) এসে পুরনো বিশ্ব (ইউরোপ)-কে উদ্ধার করবে? ব্রিটিশ জাতি তাদের নাছোড়বান্দা জেদ আর অটল স্নায়ুবলের জন্য বিখ্যাত। এখন তারা সম্ভবত তাদের ইতিহাসের কঠোরতম পরীক্ষার সম্মুখীন। দেখা যাক এই পরীক্ষায় তারা নিজেদের সুনাম বজায় রাখতে পারে কিনা।

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক জেনারেল ও রণকৌশল বিশেষজ্ঞদের উদ্ভাবিত সামরিক কৌশলের সাহায্যে নাৎসিরা অসাধ্য সাধন করেছে। যুদ্ধে খ্যাতিলাভ করেছেন, পক্বকেশ, এমন জেনারেলদের ওপর মিত্রশক্তি ভরসা করেছিল। তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। নাৎসিদের নতুন নতুন রণকৌশলের ভাণ্ডার কি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে? মিত্রশক্তির কাছে এখন কি কোনও গোপন কৌশল লুকনো আছে? এইসব প্রশ্নের উত্তরের ওপর অনেককিছু নির্ভর করছে।

জার্মান বাহিনীর রাসায়নিক অস্ত্র প্রস্তুতির কথা আমরা অনেক শুনতাম। রাসায়নিক

যুদ্ধের একটা নতুন কৌশল কি তারা সত্যিই সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে ফেলেছে? যদি করে থাকে আগামীদিনে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। এবং তখন দেখা যাবে এই নতুন আক্রমণে মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের কী অবস্থা হয়। ইতালীয় বিমান আক্রমণে সাহসী আবিসিনীয়দের স্নায়ুতন্ত্র যেমন বিকল হয়ে গিয়েছিল, এবারও কি তাই হবে, না কি মানুষের আত্মার শক্তি জয়ী হবে?

বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বোঝা কঠিন, যুদ্ধ কী করে চলতে পারে, যদি গ্রেট ব্রিটেন শত্রুর দখলে চলে যায়। যুক্তরাষ্ট্রে একটা নির্দিষ্ট সীমার বেশি কিছু করতে পারে না, মিত্রশক্তিকে সাহায্য করতে, পাছে দূর প্রাচ্যে জাপান তাদের বিপদের সৃষ্টি করে। এবং স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস যে জার্মানি ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন তার আশাও বিশেষ নেই। যতদূর সম্ভব একদিকে সোভিয়েত রাশিয়া আর অপরদিকে জার্মানি এবং ইতালির মধ্যে একটা পরিষ্কার বোঝাপড়া আছে। সেই বোঝাপড়ার শর্ত কী কী আমাকে যদি অনুমান করতে হয়, আমি বলব—

১. বলকান ছাড়া ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ডের অন্যত্র জার্মানির নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার সম্পূর্ণ অধিকার কায়েম থাকবে।

২. ইতালির হাতে থাকবে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের অধিকার।

৩. বলকান এবং মধ্যপ্রাচ্য হবে রাশিয়ার প্রভাবাধীন অঞ্চল।

৪. আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদ সমস্ত বৃহৎ শক্তি ভাগ করে নেবে।

যেহেতু জার্মানি এবং ইতালি উভয়েই এবং সম্ভবত রাশিয়াও এখন গ্রেট ব্রিটেনকে এক নম্বর শত্রু মনে করে, এমন সম্ভব যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভাগ করে নেওয়ায় তাদের একটা পরিকল্পনা আছে। সে-কাজে তারা জার্মানিদের সাহায্য ও সহযোগিতা চাইতে পারে, কেন না তারা জানে যে, ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ থেকে একেবারে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত এই সমস্ত দ্বীপপুঞ্জের ওপর চিরদিন জাপানের দৃষ্টি আছে।

এই যখন পরিস্থিতি, ব্রিটেন যদি জার্মান-ইতালিয়ান আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে না পারে, মি. চার্চিলের মতো এমন আশা করা বৃথা যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নিজেকেও রক্ষা করবে এবং তার ওপরে ব্রিটেনকেও রক্ষা করবে। অতএব সাম্রাজ্যের সাহায্যে কিংবা ভারতের সাহায্যে ব্রিটেনকে রক্ষা করার কথা বলা যেন আমরা বন্ধ করি। এই ঘোর সংকটে ভারতকে নিজের কথাই সর্বপ্রথম ভাবতে হবে। সে যদি এখন স্বাধীনতা জয় করতে পারে এবং তার পরে নিজেকে রক্ষা করতে পারে, তাতেই মানবজাতির সবচেয়ে বড় উপকার করা হবে। ভারতবাসীকে অস্থায়ী জাতীয় সরকারের মাধ্যমে এখনই ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি করতে হবে। সে-দাবি প্রতিরোধ করবার জন্য ব্রিটিশ সরকার কোনও সাংবিধানিক অসুবিধার কথা বলতে পারবে না, কারণ সেজন্য পার্লামেন্টে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আইন পাশ করানো যায়। ভারতে এবং বিদেশে অবস্থা স্বাভাবিক হলে অস্থায়ী জাতীয় সরকার সংবিধান পরিষদ আপনি করবে এ-দেশের জন্য পুরোদস্তুর সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে।

বন্ধুগণ, আজকের জন্য এইসব আমার চিন্তা ও প্রস্তাব। আমি আশা করি, বিশ্বাস করি, এগুলি আপনারা বিবেচনা করবেন। অন্তত, আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি অবিলম্বে পূর্ণ স্বরাজ জয় করে নেওয়ার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা পকেটে না নিয়ে আপনারা নাগপুর ত্যাগ করবেন না।

আসুন, আবার আমরা ঘোষণা করি— "সমস্ত ক্ষমতা ভারতবাসীর হাতে চাই, আজই, এখনই।"

৪২

দেশের সামনে কর্তব্য

‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ পত্রিকা, ২৯ জুন ১৯৪০ সংখ্যায় প্রকাশিত বিবৃতি

বিশ্বপরিস্থিতি এখন এমন সদা পরিবর্তনশীল যে, কোনও কোনও মহলে দেখা যাচ্ছে সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার একটা প্রবণতা। কিন্তু আমাদের ভোলা উচিত নয়, যেসব ঘটনা ঘটে গেছে কিংবা এখন ঘটছে তার কিছুই আকস্মিক নয়, সবই সযত্ন পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতির ফল। আমাদের পক্ষে এরকম মনে করা মারাত্মক ভুল হবে, পরিস্থিতি যেহেতু আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করার পক্ষে অনুকূল, সেই কারণেই স্বরাজ পাকা ফলের মতো আমাদের কোলে খসে পড়বে।

দশদিন আগে কলকাতা ছেড়ে আসার পর ভারতের কয়েকজন প্রথম সারির রাজনীতিক ও নেতার সঙ্গে আমি দেখা করেছি। তা ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আমি ফরওয়ার্ড ব্লকের বিভিন্ন নীতি ও কার্যক্রম তাঁদের সামনে তুলে ধরেছি, নিজেও কিছু কিছু বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছি। যদিও আমি সর্বাত্মক কোনও ঐকমত্য খুঁজে পেয়েছি বলে দাবি করতে পারি না, অনেকগুলো বিষয়ে সহমত দেখে আমি বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছি। তার ফলে আমাদের সামনে এখন কী কর্তব্য, সে সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা নিয়ে ফিরে এসেছি।

প্রথমত কালবিলম্ব না করে আমাদের উচিত এখনই একটি অস্থায়ী সরকারের মাধ্যমে ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে তুলে দিতে হবে এই যৌথ দাবি উত্থাপন করা। এ-দাবি অপ্রতিরোধ্য হতে বাধ্য, যদি ভারতীয় জাতি এই উপলক্ষে এক সুরে কথা বলে। প্রতিশ্রুতি, এমনকী আংশিক ক্ষমতা হস্তান্তরের দ্বারা আমাদের প্রলুব্ধ হওয়া উচিত নয় কারণ আমাদের দাবি ‘‘ভারতীয়দের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই।’’

কেন্দ্রে জাতীয় মন্ত্রীসভার সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় মন্ত্রীসভা থাকতে হবে। প্রথমোক্তদের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই শেষোক্তদের আনুগত্য থাকবে। উপরন্তু পরিবর্তনের সময়ে তাঁরা অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং সংহতি নিশ্চিত করবেন এবং দীর্ঘস্থায়ী হিন্দু-মুসলিম মীমাংসার জন্য পথ প্রস্তুত করবেন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান অসম্ভব নয়। কিন্তু তার সমাধান আসবে যদি আমরা ব্যবহারিক, বাস্তব সমস্যাগুলির ওপর মনোযোগ নিবিষ্ট করি। তাত্ত্বিক, ভাবগত প্রশ্ন নিয়ে সময় ও শক্তি অপচয় না করি। যেখানেই হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতা এখনই সম্ভব, ভবিষ্যতে তা অবশ্যই প্রশস্ত হবে।

এ-প্রসঙ্গে একটি বিচার্য বিষয়, এখনই যদি আমরা কেন্দ্রে জাতীয় মন্ত্রীসভা গঠন করতে না পারি, প্রদেশে জাতীয় মন্ত্রীসভা দিয়ে পরীক্ষা করব কিনা। এই প্রশ্নে আমার উত্তর, হ্যাঁ। বর্তমান পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে প্রদেশে জাতীয় মন্ত্রীসভা বিশেষ সহায়ক হবে— কেবলমাত্র জাতীয় ঐক্য রক্ষার জন্য নয়, কেবলমাত্র হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, কেন্দ্রে ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যেও— স্বরাজ লাভের পথে যদি বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

নাগরিক সুরক্ষা বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা নিয়েও আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু জনসাধারণের কাছে আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে, সেই বাহিনী ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ

থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে। তার একমাত্র কাজ হবে অভ্যন্তরীণ শান্তি সংহতি এবং সৌহার্দ্য রক্ষা করা যাতে যখন তাদের ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের ওপর মনোনিবেশ করা উচিত, সেই সময়ে তারা যেন নিজেদের মধ্যে বিবাদ না করে।

এই প্রসঙ্গে আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, রামগড়ে যে সংগ্রামে আমরা নেমেছি, তাতে যেন আমরা শৈথিল্য না দেখাই। স্বরাজ আপনি আসবে, সংগ্রাম ছাড়াই, আমরা বিশ্বাস করি না। যে মুহূর্তে আমরা সংগ্রাম পরিত্যাগ করব, আবহাওয়া বিষিয়ে উঠবে, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোস করার একটা প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। তাই আমরা সংকল্প করেছি, সংগ্রাম তীব্রতর করব, তার ব্যাপ্তি প্রসারিত করব।

এই সংকটের মুহূর্তে, যখন আমাদের চোখের সামনে ইতিহাস সৃষ্টি হচ্ছে, সবচাইতে যা প্রয়োজন, আমাদেরকে ভাবতে হবে ভারতের কথা, শুধুমাত্র ভারতের কথা— দলের কথা নয়, গোষ্ঠীর স্বার্থের কথা নয়। কোনও দল অথবা ব্যক্তি যেন কোনও ত্যাগকেই অতিরিক্ত মনে না করে, যদি ভারতের মুক্তির জন্য তার প্রয়োজন হয়।

৪৩

হলওয়েল মনুমেন্ট

‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ পত্রিকা, ২৯ জুন ১৯৪০ সংখ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধ

এই সংখ্যা প্রকাশ অনিবার্য কারণে দেরি হল। আসলে এক সপ্তাহ আমাদের বাদ পড়ে গেছে· বঙ্গ সরকারের সুবাদে। আমাদের অফিসে তল্লাসি করা হয়, আমাদের জামিন বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশ করবার আগে আমাদের ২০০০ টাকা নতুন করে জামিন দিতে হয়।

ভালই হয়েছে। এতে আমাদের জেদ বেড়ে গেছে, ফলে আমাদের কাজের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, তাতে আরও আগ্রহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করতে হবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক অধিবেশন যে আদেশ দিয়েছে, হলওয়েল মনুমেন্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন, অবিলম্বে তা আরম্ভ করতে হবে। ৩ জুলাই ১৯৪০ বঙ্গদেশে সিরাজদৌল্লা দিবস হিসাবে পালন করতে হবে বঙ্গদেশের শেষ স্বাধীন নৃপতির সম্মানে। হলওয়েল মনুমেন্ট শুধু যে সেই নবাবের স্মৃতিতে একটা অকারণ কলঙ্ক লেপন তাই নয়, গত ১৫০ বছর সেটা কলকাতার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে দাসত্ব ও অপমানের প্রতীক হয়ে। সেই মনুমেন্টকে বিদায় করতে হবে।

আগামী ৩ জুলাই হলওয়েল মনুমেন্টের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন আরম্ভ হবে এবং এই লেখক স্থির করেছেন সেদিন স্বেচ্ছাসেবকদের প্রথম দলের পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেবেন।

ফরওয়ার্ড ব্লকের সারা ভারত সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে ১৮ এবং ১৯ জুন নাগপুরে। অধিবেশন অত্যন্ত সফল হয় এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অধিবেশনের কাজকর্ম সারাদেশের জনমতের ওপর, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ওপরেও প্রভাব ফেলেছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনও একই সঙ্গে চলছিল। ঢাকাতে যে আবেদন করা হয়েছিল নাগপুরে তারই পুনরাবৃত্তি করা হয়। নাগপুরের সিদ্ধান্তর সংক্ষিপ্ত সায় এইরকম করা যায়!

১. আন্দোলন তীব্রতর করো, তাকে ব্যাপ্ত করো। জনগণের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই।

২. একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকারের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার এখনই সম্পূর্ণ ক্ষমতা ভারতীয়দের হস্তান্তরিত করুক— এই দাবি করো।

৩. জাতীয় ঐক্য এবং বিশেষ করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য কাজ করো।

৪. পরিবর্তনের সময়ে অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্যে নাগরিক সুরক্ষা বাহিনী গঠন করো।

নাগপুরে যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল সেই অনুযায়ী তার পরবর্তীকালে একটি সাম্প্রতিক বিবৃতিতে বর্তমান লেখক চেয়েছেন বিভিন্ন প্রদেশে এবং কেন্দ্রে জাতীয় মন্ত্রীসভা গঠিত হোক।

আজকের পরিস্থিতি পরিবর্তনশীল এবং ঠিকভাবে তাকে কাজে লাগাতে গেলে একটি গতিশীল নীতির প্রয়োজন। ইতিহাস আমাদেরকে সেই পরীক্ষার সামনে এনেছে। আমরা যেন কাজে অক্ষম না প্রমাণিত হই। এখন আমাদেরই হাতে, আমাদের ভবিষ্যৎ। আমরা তাকে রচনাও করতে পারি, তাকে নষ্টও করতে পারি।

৪৪

বৃহত্তর প্রেক্ষিতে ফরওয়ার্ড ব্লক

নেতাজির স্বহস্তে লিখিত এই অসম্পূর্ণ প্রবন্ধটি পাওয়া গিয়েছিল জুলাই থেকে ডিসেম্বর ১৯৪০-এ কলকাতায় প্রেসিডেন্সি জেলে তাঁর কারাবাসের সময়কার ব্যক্তিগত কাগজপত্রের মধ্যে। এর সঙ্গে লক্ষণীয় মিল দেখা যায় তাঁর কাবুল নিবন্ধ 'ফরওয়ার্ড ব্লক কেন প্রয়োজন' ('Forward Bloc— its justification') শীর্ষক নিবন্ধের সঙ্গে, যেটি তিনি লিখেছিলেন ১৯৪১-এর মার্চে, ভারত থেকে নিষ্ক্রমণের সময় যখন তিনি আফগানিস্তানে ছিলেন। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, কারাগারেই তিনি এটি লিখবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন এবং লিখতে আরম্ভও করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নিবন্ধটি লেখেন এবং সম্পূর্ণ করেন কাবুলে। লিখতে লিখতে তিনি এর নামটি বদলে দেন এবং এর বয়ানেও কিছু কিছু পরিবর্তন করেন। সম্পূর্ণ নিবন্ধটি অন্তিমরূপে প্রকাশ পায় 'The Essential Writings of Netaji Subhas Chandra Bose', (Calcutta and Delhi, 1997) গ্রন্থে।—সম্পাদকদ্বয়

কোনও আন্দোলনের বৃদ্ধিকে গাছের বেড়ে ওঠার সঙ্গে তুলনা করা যায়। কোনওটিরই বৃদ্ধি সমানে, একভাবে সরলরেখা ধরে হয় না। তার অভ্যন্তরে বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান ঘটে, পারস্পরিক বিভেদ দেখা দেয় এবং সেই অনুযায়ী ভাঙন ও বিভাজন হয়। কিন্তু বৃদ্ধির একটি আবশ্যিক শর্ত হল ধারাবাহিকতা। সেই ধারাবাহিকতার কারণে প্রাণের নিজস্ব ধর্মে যে বৃদ্ধি ও বিকাশ সেটা পরভোজীর বিকাশের থেকে আলাদা। একটি জীবন্ত বৃক্ষের প্রত্যেকটি অংশ জৈবিকভাবে শিকড়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, যে শিকড় মাটির গভীর পর্যন্ত প্রসারিত। পরভোজীর সম্পর্কে সে-কথা বলা যায় না।

জৈব বিবর্তনের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করা দরকার।

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ অথবা অভ্যুত্থান তখনই সাধারণত দেখা দেয় যখন চলমানতা রুদ্ধ হয়ে যায় কিংবা আন্দোলনকে দমন করবার চেষ্টা করা হয়। আমি ১৯২১ সালে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পরে বিদ্রোহের প্রথম লক্ষণ কংগ্রেসের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে ১৯২২ সালে, মহাত্মা গান্ধী বরদৌলির পর আইন অমান্য আন্দোলন মুলতুবি করে দেওয়ার পর। শেষপর্যন্ত সেই বিদ্রোহ নির্দিষ্ট আকৃতি গ্রহণ করে এক বৎসর পর, স্বরাজ পার্টির নামে।

স্বরাজ পার্টি গঠিত হয়েছিল নানা প্রকৃতির উপাদানের সমবায়ে, যার সবগুলিই চরিত্রে কিংবা দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈপ্লবিক ছিল না। কিন্তু সর্বপ্রধান যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য তা যে সকলকে এক সূত্রে বেঁধেছিল সেটা হল যুক্তিনির্ভর মনোভাব ও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা। সেই কারণে মান্যতাপ্রাপ্ত কংগ্রেস পার্টি, যা ছিল বিশুদ্ধ গান্ধীবাদের প্রতি অনুগত, তার নাম হয়েছিল "No-Change Party"। হয়তো মনে থাকতে পারে, সেই অতদিন আগেও মতভেদ ছিল আইনসভায় প্রবেশ নিয়ে, যে-বিষয়ে "No-Changers" অর্থাৎ রক্ষণশীল গান্ধীবাদীদের ঘোর আপত্তি ছিল।

কিছুদিন বিদ্রোহ চলবার পর একটা মিটমাট হয়ে গেল, দুই পক্ষের মধ্যে মিল হয়ে গেল। তার সূত্রপাত হয়েছিল ১৯২৪ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনকালে। তখন গান্ধী-দাশ-নেহরু চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে কংগ্রেস ও স্বরাজ পার্টি কার্যত মিশে গেল। ১৯২৫-এ কানপুর অধিবেশনে কংগ্রেস স্বরাজীদের কর্মসূচি গ্রহণ করল এবং স্বরাজীরা কংগ্রেসের ওপরে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পেলেন। এই অবস্থা চলল ডিসেম্বর ১৯২৯-এ কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশন পর্যন্ত। ১৯২৯-এ মহাত্মা গান্ধীর নির্বাচিত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি হলেন। সেই পরিস্থিতিতে তৎকালীন স্বরাজবাদী সর্বাধিনায়ক পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তাঁর মত প্রত্যাহার করলেন এবং স্বরাজীদের কর্মসূচি বাতিল হল, যার ফলে দীর্ঘ ছ' বছর পরে আবার ''নো-চেঞ্জারদের'' দিন ফিরে এল। কিন্তু ১৯৩০ সালে আইনসভা বর্জন করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ছিল। আমাদের আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবার জন্য সেটাকে একটা শর্ত করার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

স্বাভাবিক অবস্থায় আশা করা যেতে পারে যে, পরের বিদ্রোহটি স্বরাজ পার্টির ভিতর থেকেই আসবে অর্থাৎ সে দলের যাঁরা প্রগতিশীল তাঁদের মধ্যে থেকে। এখন দেখা যাক প্রকৃতপক্ষে কী ঘটল।

কংগ্রেসকে পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে সম্মত করাতে লক্ষ্ণৌতে ১৯২৮-এ Independence League বা স্বাধীনতা মোর্চা স্থাপিত হল, তাতে নেতৃত্ব প্রদান করলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, বর্তমান লেখক এবং আরও কয়েকজন। সেই বছরই ডিসেম্বরে, যখন কলকাতায় পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর

পৌরোহিত্যে কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল, একটা সংঘর্ষ বাধল মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কংগ্রেস এবং স্বাধীনতা মোর্চা পন্থীদের মধ্যে। মূল প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন মহাত্মাজি এবং তার ওপর একটি সংশোধনী আনলেন বর্তমান লেখক এই মর্মে যে, কংগ্রেসের ঘোষিত লক্ষ্য হওয়া উচিত পূর্ণ স্বাধীনতা। সে-সংশোধনী প্রত্যাহার হয়, কিন্তু ভোট থেকে দেখা গেল সংখ্যালঘুরা শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী।

সম্ভবত গান্ধীজি এই ঘটনা থেকে একটা ইঙ্গিত পেলেন, কারণ এক বছর পরে কংগ্রেস যখন লাহোরে বার্ষিক অধিবেশনে জওহরলাল নেহরুর পৌরোহিত্যে আবার মিলিত হল, গান্ধীজি কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে যে-প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন এবং যাকে পরাস্ত করেছিলেন, সেই স্বাধীনতার প্রস্তাব তিনি নিজে উত্থাপন করলেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে লাহোর কংগ্রেসিদের মধ্যে কোনও সংঘাত হয়নি। ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসে সর্বপ্রথম একটি বামপন্থী গোষ্ঠী লক্ষণীয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করল এবং সেখানে আদর্শ অথবা লক্ষ্যের প্রশ্নে একটা বিরোধ বাধল। লাহোর কংগ্রেসে বিরোধ বেধেছিল স্বাধীনতা অর্জনের পদ্ধতি ও কর্মসূচির প্রশ্নে। মহাত্মা গান্ধীর প্রবল ইচ্ছায় ওয়ার্কিং কমিটি যে 'গৃহীত ও স্বীকৃত' পরিকল্পনাটি দাখিল করেছিল বিষয়-নির্বাচনী সমিতি সেটি খারিজ করল। বামপন্থীদের পক্ষে যে বিকল্প প্রস্তাব বর্তমান লেখক উত্থাপন করেছিলেন, সমিতি সেটিও খারিজ করে দিল। ফল এই দাঁড়াল যে, কংগ্রেস যদিও সর্বসম্মতিক্রমে স্বাধীনতাকে তার লক্ষ্য বলে ঘোষণা করল, কোনও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ না করেই কংগ্রেস অধিবেশন সমাপ্ত করে দিল। সভার মনোভাব থেকে অবশ্য এটা বোঝা গেল যে, সাধারণভাবে কংগ্রেসিরা একটি সংগ্রামী কর্মসূচি চাইছিলেন।

নিঃসন্দেহে গান্ধীজি লাহোরে কূটনীতির চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করেছিলেন। কলকাতা দেখিয়ে দিয়েছিল, কংগ্রেস রাজনীতিতে বামপন্থী গোষ্ঠীকে অবহেলা করা যায় না। কিন্তু এক বছর পরে, অনেকের মতে মহাত্মা যে চালটি চাললেন তাতে প্রতিপক্ষ কুপোকাৎ হল। কংগ্রেসের অধিবেশনের আগে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে নিজের দিকে টেনে নেওয়া গেল এবং সেই কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাবটি উত্থাপন করে তিনি প্রতিপক্ষের পালের হাওয়া প্রায় কেড়ে নিলেন। তা হলেও সংখ্যার শক্তিতে কলকাতার চেয়ে দুর্বল হয়ে পড়লেও বামপন্থীরা তখন লাহোরের চেয়ে অধিকতর পরিণত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেটা গান্ধীজির নজর এড়াল না, যদিও লাহোরে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর মাথা ছিল একদম ফাঁকা, কয়েক মাসের মধ্যে এপ্রিল ১৯৩০-এ তিনি আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করলেন। রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তার প্রভাব ও জনপ্রিয়তার সেইটাই সর্বোচ্চ মাত্রা, কিন্তু এ বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে, অন্তত বর্তমান লেখকের, বামপন্থীরা দু' বছর ধরে বিশেষত লাহোর কংগ্রেসের সময়ে যদি ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে না যেত, সেই আন্দোলন আদৌ হত কিনা।

যদিও পরিচালক কংগ্রেসের সঙ্গে বাম-গোষ্ঠীর সংঘাত ছিল ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা নিয়ে, ছোটখাটো সংঘর্ষও চলছিল, যা থেকে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল লাহোরে কংগ্রেসের উচ্চতর মহলে কর্তৃত্ব পরায়ণতা দেখা গিয়েছে। সেইরকম একটি সংঘর্ষের সামনে বর্তমান লেখক এবং তাঁর সঙ্গী প্রতিনিধিরা বক্তৃতা মঞ্চের কর্তৃত্বপরায়ণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ সভা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশ থেকে বামপন্থীরা শ্রীযুত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার (প্রাক্তন সভাপতি) ড. আলম, স্বামী গোবিন্দানন্দ প্রমুখের নেতৃত্বে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, নির্দিষ্ট অবয়ব বিহীন বাম গোষ্ঠীকে

একটি দল হিসাবে সুনির্দিষ্ট আকৃতি দেওয়া হবে, কেননা একমাত্র সেই উপায়েই মঞ্চাধিষ্ঠের কর্তৃত্বকে সংযত করা সম্ভব হবে। সেই দলের নাম দেওয়া হল, কংগ্রেস ডেমোক্রাটিক পার্টি এবং লাহোরে নবপ্রতিষ্ঠিত দলের কর্মকর্তাদের যথানিয়ম নির্বাচিত করা হল।

এখানে একটু থেমে পিছনের দিকে তাকানো দরকার। এতক্ষণে এটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত যে দেশবন্ধু দাশের মৃত্যুর পরে স্বরাজ পার্টির উচ্চতর মহলে গতিশীলতার অভাব দেখা দেয়। ১৯২৮ সালে এবং তার পরে গান্ধীবাদীরা যখন তাদের কাছাকাছি আসার মনোভাব প্রকাশ করলেন, স্বরাজপন্থীদের সঙ্গে তাদের বিভেদ সম্পূর্ণ দূর হয়। তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও মজবুত হয় যখন মহাত্মা গান্ধী লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য জওহরলাল নেহরুকে সমর্থন করেন। আপোস-বিরোধী বিপ্লবী যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই তখন নতুন গান্ধীবাদী-স্বরাজবাদী জওহরবাদী নেতৃত্বের পন্থায় যোগ দেন। এমনকী কয়েকজন বামপন্থীও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ব্যক্তিগত প্রভাবের আকর্ষণে সেই পথই অনুসরণ করেন, যিনি সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর নিজের স্থাপিত স্বাধীনতা মোর্চাকে কার্যত পরিত্যাগ করে নতুন কংগ্রেস নেতৃত্বের অনুগামী হন।

এইভাবে স্বরাজ পার্টিকে তার নিজের সর্বাধিনায়কই ভেঙে দিলেন। একইরকমভাবে Independence Legue-এর পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করলেন তার প্রধান প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। গান্ধীবাদী, জওহরবাদী এবং প্রচুর সংখ্যক স্বরাজবাদী জবরদস্ত বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেসের বৈপ্লবিক এবং প্রগতিশীল অংশ, যাঁদের অধিকাংশ স্বরাজ দলের মধ্যে ছিলেন, তাঁরা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। তা সত্ত্বেও বামপন্থীরা এগিয়ে যেতেন, যদি দুটি গুরুতর প্রতিবন্ধক না থাকত। প্রথমত, কংগ্রেস ডেমোক্রেটিক পার্টি, যার হওয়ার কথা ছিল সমস্ত বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটি মঞ্চ, অকালে মারা পড়ল। দ্বিতীয়ত নতুন কংগ্রেস নেতৃত্ব বামপন্থী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। তাঁরা ১৯৩০-এর এপ্রিল মাসে আইন অমান্যের একটি বড় আন্দোলনে নেমে পড়লেন।

লাহোর কংগ্রেসের ঠিক পরেই লেখককে রাজদ্রোহের অভিযোগে জেলে পাঠান হয়। গান্ধীজির সঙ্গে মতান্তরের কারণে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার কংগ্রেস পুরোপুরি ত্যাগ করেন। ডা. আলম ধীরে ধীরে আনুষ্ঠানিক কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের কাছাকাছি চলে আসেন। এবং তারপরে ১৯৩০-এর এপ্রিলে, যখন গণ আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়, বামপন্থীরা সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেই আন্দোলন যত দিন চলছিল, একটি নতুন দল গঠন করার কথা কেউ ভাবতে পারেনি। সেই পরিস্থিতিতে, কংগ্রেস ডেমোক্রেটিক পার্টির পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব ছিল না।

১৯৩০-এর আন্দোলনের সমাপ্তি হয় ১৯৩১-এর মার্চ মাসের গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে। সেই চুক্তি দেখিয়ে দিল, কংগ্রেসের নেতৃবর্গ— প্রকৃত বামপন্থী ভূমিকা পালন করবেন না। তার ফলে এক হিসাবে দেখলে বামপন্থী তৎপরতা শুরু করার সেটাই ছিল উপযুক্ত সময়। কিন্তু আরেক দিকে, চুক্তির পরে জনসাধারণের ওপর গান্ধীজির প্রভাব তুঙ্গে পৌঁছল। উপরন্তু দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক যখন সমাপ্ত হল সকলেই আশা করলেন আইন অমান্য আন্দোলন আবার আরম্ভ হবে। মার্চ ১৯৩১ এবং জানুয়ারি ১৯৩২-এর মধ্যবর্তী সময়টাকে সেই কারণে বামপন্থীদের সংগঠিত করবার কাজে লাগানো গেল না। এই অন্তবর্তী কালে বামপন্থী ব্যক্তিরা তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেন আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় শুরু করার কাজে।

১৯৩২-এর আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে ছিল ১৯৩০-এর আন্দোলনটাকেই চালিয়ে যাওয়া কিন্তু সীমান্ত প্রদেশে যুক্ত প্রদেশে এবং বঙ্গদেশে বামপন্থীদের তৎপরতা ব্যতিত সেই আন্দোলন হত কিনা সন্দেহ। নতুন একটি দল সংগঠিত করা সে তৎপরতার উদ্দেশ্য ছিল না। তার উদ্দেশ্য ছিল দেশকে আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য মানুষকে মানসিক ভাবে তৈরি করে তোলা।

কংগ্রেসের জীবনমরণ সংগ্রাম যতদিন চলছিল এবং নেতারা মোটের ওপর গতিশীল ছিলেন অভ্যন্তরীণ মতভেদ ততদিন চাপা পড়েছিল, এবং তার অভ্যন্তরে একটি বামপন্থী শাখা সংগঠিত করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু সেই সংগ্রাম থেকে কংগ্রেসের পিছিয়ে পড়ার লক্ষণ প্রথম যখন দেখা গেল, দলের ভিতরে একটা বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিতে আরম্ভ করল। ১৯৩২-এর শেষ দিকে গান্ধীজি কারাবাসের মধ্যেই হরিজন আন্দোলন আরম্ভ করলেন। সে-আন্দোলন নতুন কোনও ঘটনা নয়, আসলে হিন্দুদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা দূর করার আন্দোলনটিকেই আরও শক্তিশালী করা, কিংবা আবার আরম্ভ করা। কিন্তু একটা রাজনৈতিক সংগ্রাম যখন চলছে, তার মধ্যে সেই আন্দোলন আবার শুরু করে, গান্ধীজি প্রধান রাজনৈতিক বিষয়টিকেই পাশ কাটিয়ে যেতে সাহায্য করলেন। হরিজন আন্দোলন ছিল মহাত্মাজির অনশনের পরবর্তী পদক্ষেপ। মূল সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, অনুন্নত সম্প্রদায়গুলিকে অথবা তপশিলি সম্প্রদায়গুলিকে হিন্দুদের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সেই অনশনও সাধারণের মনোযোগ আইন অমান্য আন্দোলনের দিক থেকে ঘুরিয়ে দেওয়ার কাজ করেছিল এবং স্বতঃই সেই আন্দোলনকে দুর্বল করে দিয়েছিল। অনশন এবং তারপরে হরিজন আন্দোলন থেকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা সন্দেহ করেন যে, গান্ধীজি নিজের মনে মনে নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করতে আরম্ভ করেছিলেন। এবং নতুন একটা রাস্তা বের করার চেষ্টা করছিলেন, যাতে হরিজন আন্দোলনের মতন নতুন কোনও একটা পার্শ্ব নাটক মঞ্চস্থ করে জনমনের ওপর নিজের আধিপত্য ধরে রাখতে পারেন।

তাঁদের ধারণাই ঠিক। ১৯৩৩-এর মে মাসে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত বলে ঘোষণা করলেন। এ থেকে বোঝা গেল দক্ষিণপন্থার দিকে কংগ্রেস ঝুঁকবে, বামপন্থীরা বিদ্রোহ করবেন। আন্দোলন মুলতুবি হওয়ার ফলে বিষয়গুলি পরিষ্কার হয়ে গেল এবং তার ফলে তৎক্ষণাৎ দুই পক্ষের মধ্যে সংঘাত তীব্র হয়ে উঠল। দক্ষিণপন্থীদের মুখপাত্র হলেন দু'জন নব্য সংসদপন্থী শ্রী ভুলাভাই দেশাই এবং ড. আনসারি এবং দু'জন পুরনো স্বরাজপন্থী ডা. বি. সি. রায় এবং মি. আসফ আলি। আইন অমান্য স্থগিত হওয়ার পর কিছু দিন কংগ্রেস হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকল। সংসদপন্থীদের মতে অচল অবস্থা অবসানের শ্রেষ্ঠ উপায় ছিল সংসদীয় পন্থায় প্রত্যাবর্তন, আইন অমান্য আরম্ভের আগে জানুয়ারি ১৯৩০-এ যেটা খারিজ করা হয়েছিল। গান্ধীজির যেহেতু আর দ্বিতীয় কোনও পরিকল্পনা ছিল না, সংসদপন্থীদের চাপের কাছে তিনি নত হলেন, এবং সেই পরিস্থিতিতে মনে হল কংগ্রেস যেন একটা বিশুদ্ধ সাংবিধানিক দল হয়ে দাঁড়াবে।

কংগ্রেসের আত্মাকে রক্ষা করতে একটি বামপন্থী বিদ্রোহ অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। ঠিক সেই উপযুক্ত সময়ে ১৯৩৪ সালে সেই বিদ্রোহ দেখা দিল কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি নাম নিয়ে। সেই দলে কারা ছিলেন? ১৯২৮-এর স্বাধীনতা মোর্চা এবং ১৯২৯-এর কংগ্রেস ডেমোক্রাটরাই কি একে স্ফীতকায় করে তুললেন?

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি যখন প্রথম আবির্ভূত হয়, তখন তার আবেদন ছিল ব্যাপক,

সমস্ত বামপন্থী এবং সম্ভাব্য বামপন্থীর সহানুভূতি ও সমর্থন তার দিকে গিয়েছিল। যে সব ইন্ডিপেনডেন্স লীগ পন্থী এবং কংগ্রেস ডেমোক্রাট, যাঁরা ততদিনে অবসর গ্রহণ করেননি কিংবা দূরে চলে যাননি, তাঁরা স্বভাবতই তাতে যোগ দিলেন। উপরন্তু আগেকার প্রভাবশালী গান্ধীপন্থীদেরও অনেককে তার সদস্যদের মধ্যে দেখা গেল। গান্ধীবাদের সর্বশেষ পর্যায়টি অনেকেরই মোহভঙ্গ করেছিল তত্ত্ব হিসাবেই হোক আর পন্থা হিসাবেই হোক। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী আদর্শ ছিল, গান্ধীবাদ, যা তার উদ্দেশ্য সফল করতে ব্যর্থ হয়েছে, তার জায়গায় তাঁরা দেশকে একটি নতুন তত্ত্ব এবং নতুন পন্থার সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন।

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল দুটি প্রশ্নের তাঁরা কী জবাব দেন, তার ওপরে। প্রথমত দেশকে তাঁরা কি একটি নতুন পন্থা ছাড়াও একটি নতুন তত্ত্ব দিতে পারবেন এবং তাঁরা কি তাঁদের এই মুহূর্তের এবং ভবিষ্যতের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন? দ্বিতীয়ত, অনেক দিন আগে থেকে যাঁরা বামপন্থী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে এতদিনকার গান্ধীবাদী বা নতুন গঠিত দল এসে, মানিয়ে নিয়ে চলতে পারবেন?

শেষ পর্যন্ত তাঁদের ভবিষ্যৎ যাই হোক কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি— শুরুটা ভালভাবেই করল। সে-দলটি কংগ্রেসের পরগাছা ছিল না, বাইরে থেকে তুলে নিয়ে এসেও তাকে রোপন করা হয়নি। নিঃসন্দেহে দলটির জন্ম দেশের মধ্যে থেকেই, এবং তার সদস্যেরা কংগ্রেস আন্দোলনের আগেকার পর্যায়গুলি পেরিয়ে এসেছেন, যাতে তাদেরও অবদান ছিল। কিন্তু তাঁদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে যে বাধাটি সবচেয়ে বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সেটা হল, গান্ধীবাদের এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মতো কয়েকজন বড় বড় প্রভাবশালী নেতার সম্ভাব্য প্রভাব। এ-কথা গোপন নেই যে, যদিও পণ্ডিত নেহরু সে-দলে যোগ দেননি, দলের কয়েকজন প্রধান নেতার ওপর তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবের মাধ্যমে তিনি তাকে প্রচুর অনুপ্রেরণা, শক্তি ও উৎসাহ দান করেছিলেন। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি যদি সেই বিপদ অতিক্রম না করে সে তার অব্যবহিত এবং ভবিষ্যৎ ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে না এবং একটি নতুন তত্ত্ব ও নতুন পন্থার প্রবক্তা হিসাবে ভারতের রাজনীতিতে তাঁর উদ্ভব সঙ্গত হয়েছিল বলেও সে প্রমাণ করতে পারবে না।

১৯৩৪ সালে দলটির জন্মলগ্নে লেখক ইউরোপে ছিলেন। তাঁর বই "ভারতের সংগ্রাম ১৯২০-৩৪" (The Indian Struggle 1920-34) যেটির লেখা সম্পূর্ণ হয় নভেম্বর ১৯৩৪ সালে এবং লন্ডনে যেটি প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে দলটিকে তিনি সাগ্রহে সমর্থন করেছিলেন। সেই সমর্থন আরও প্রবল হয় ১৯৩৮-এর হরিপুরা কংগ্রেসে তাঁর সভাপতির ভাষণে।

বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ নতুন কিছু দেয়নি। তার সমাজতন্ত্রবাদ বামপন্থীরা, যেমন পণ্ডিত নেহরু বর্তমান লেখক এবং অন্যেরা, প্রচার করে আসছেন ১৯২৮ থেকে। তার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী— বামপন্থী মতবাদ এর আগেই অন্যান্য ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মাধ্যমে ভারতের রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। তা হলেও কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি একটি অতিশয় প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করেছে, সমস্ত বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য দলটি ডাক দিয়েছে। ভারতের রাজনীতির এক অত্যন্ত উপযোগী মুহূর্তে তার আবির্ভাব হয়েছে। আগে অন্যেরা যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানে সেই দল যে সফল হবে সে সম্ভাবনা তখন খুব উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছিল। অনেক দিন আগে, ১৯২৮ সালেই বর্তমান লেখক বুঝতে পেরেছিলেন দক্ষিণপন্থীরা অর্থাৎ

কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী, ক্রমশ কত বিপজ্জনক হয়ে উঠছেন এবং একটি বামপন্থী দল গঠন করা কত জরুরি হয়ে পড়েছে। কতকটা সজ্ঞানে কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারে আরও অনেকের সঙ্গে তিনিও সেই লক্ষ্যের অভিমুখেই কাজ করেছেন। কিন্তু সফল হতে পারেননি। ১৯৩৪ সালে যখন কংগ্রেস সোশ্যালিস্টরা বেশি আশাজনক উদ্যোগ গ্রহণ করলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাকে সাগ্রহে সাধুবাদ জানাতে হল।

বর্তমান লেখক জানুয়ারি ১৯৩২ থেকে মার্চ ১৯৩৭ পর্যন্ত কারাগারে ছিলেন, কিংবা কার্যত নির্বাসনে ছিলেন। ১৯৩৭ সালে যখন তিনি আবার রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করবার স্বাধীনতা লাভ করলেন, ততদিনে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দল খানিকটা পরিণত হয়ে উঠেছে। ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮-এ নিজের পর্যবেক্ষণ থেকে যা বুঝেছিলাম, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দল আর কোনও অগ্রগতি করতে পারছিল না। সেটা একটা ভয়ের কারণ, কারণ এগিয়ে চলবার তাগিদ যখন থাকে না, অবক্ষয় আরম্ভ হয়। ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮-এ হরিপুরা কংগ্রেসের ঠিক পড়েই লেখকের গুরুতর কথাবার্তা হল কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলের বড় বড় নেতাদের সঙ্গে। তাঁর মধ্যে ছিলেন জাতীয় ফ্রন্ট গোষ্ঠীর সদস্যেরা, যাঁরা সি এস পি দলের সদস্য ছিলেন। বলা হয়েছিল এবং অনেক ভাবনা চিন্তার পর এ বিষয়ে সবাই একমত হয়েছিলেন যে, দলের কাজকর্মের মধ্যে ত্রুটি ছিল। এখনই করবার জন্য তাঁরা যে পরিকল্পনা করেছিলেন, তাতে একটা কিছুর অভাব ছিল। অবিলম্বে সে ত্রুটির সংশোধন করা দরকার। কংগ্রেসের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক যাঁরা ছিলেন, যারা কংগ্রেসের ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে ছিলেন না, তাঁদের সদস্য করে নেওয়া হয়নি, যদিও সে কাজ করা অতি আবশ্যক ছিল।

তখন পর্যন্ত সি এস পি প্রচুর সমাজতান্ত্রিক প্রচার কার্য করেছে। ভালই করেছে। কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনগুলিতে সে নিজের অস্তিত্বের জানানও দিয়েছে এবং সে দলের সদস্যেরা যখনই যেখানেই সম্ভব উগ্রপন্থী প্রস্তাব ও সংশোধনী উত্থাপন করেছেন। তাতেও উপকার হয়েছে। কেননা কংগ্রেসীদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কিছু কিছু চোখে পড়বার মতো ত্রুটি-বিচ্যুতিও ছিল। প্রথমত, সি এস পির প্রচুর সংখ্যক সাধারণ সদস্য ছিল না। দলটি বরং নির্বাচিত সদস্যদের দল ছিল, কতকটা ব্রিটেনের সোশ্যালিস্ট লীগ এবং ওই জাতীয় সংগঠনের মতো। দ্বিতীয়ত, সর্বসাধারণের মধ্যে, যেমন, কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে, সাংগঠনিক কর্মের ওপর যথেষ্ট জোর— সে দল কখনও দেয়নি। সম্ভবত তার জন্মের সময় অন্য ধরণের চিন্তা-ভাবনা কাজ করছিল, পরে যা পরিত্যক্ত হয়। সে যাই হোক ১৯৩৭ ও ১৯৩৮-এ দলটি সুনির্দিষ্ট ভাবে, তার ক্রমবিকাশ কোন পথে হবে সেটা ঠিক করে ফেলে। স্পষ্টতই তার মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল এবং পরে প্রমাণিত হল পথটি ভুল। ওইসব ভুল ত্রুটির কারণ সম্ভবত দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে স্পষ্টতা ও পরিচ্ছন্নতার অভাব, এবং দলের ভূমিকা কী হবে, এখনই এবং ভবিষ্যতে, সে বিষয়ে ভুল ধারণা।

সি এস পি যতদিন একটি নতুন তত্ত্ব এবং একটি নতুন পন্থার পক্ষে ছিল তার জন্ম এবং অস্তিত্বের একটা যুক্তি ছিল। গান্ধীবাদ, তার নানা ব্যর্থতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বে ও, একটি তত্ত্ব এবং একটি পন্থা উপস্থাপিত করেছিল। পরবর্তীকালে যদি দেখা গিয়ে থাকে, সে তত্ত্ব এবং সে পন্থা কার্যোপযোগী নয়, অথবা অসফল, তখন যার প্রয়োজন হল সেটা একটি নতুন তত্ত্ব ও নতুন কর্মপদ্ধতির কম কিছু নয়। বর্তমান লেখকের বিশ্বাস করবার কারণ আছে, প্রথম যখন সি এস পি সংগঠিত হয় অনেক লোকের মনে সেই ধারণাই ছিল। কিন্তু যাঁদের ওপর দলটি গড়ে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হল, তাঁরা এটিকে ভুল পথে নিয়ে গেলেন। আজ সাধারণ

লোকের মনে হচ্ছে, সি এস পি গান্ধীবাদীদের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে, এবং সম্ভবত সে-দলের আর কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, কংগ্রেসের কলকবজাকে একটু ক্রিয়াশীল করে তোলা ছাড়া। কিন্তু কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলের সৃষ্টি হয়েছিল শুধুমাত্র কংগ্রেসকে চনমনে করে তোলার চেয়ে অনেক বেশি কিছু করার জন্য। সেই বৃহত্তর কাজটি যদি তাঁরা না করেন, সে কাজ অন্য কোনও সংগঠনকে করতে হবে। অগ্রগতির রথের চাকা কোনও ক্রমেই বেশি দিনের জন্য বন্ধ থাকতে পারে না।

কংগ্রেসকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায়, একটি দল অবশ্যই আছে, তার একজন নেতা আছেন, নিজস্ব একটি সংগঠন আছে। সে দলকে বলা যায় বিধিসম্মত দল, গান্ধীদল বা দক্ষিণপন্থীদের দল। তার প্রশংসনীয় শৃঙ্খলা আছে তার সদস্য-সাধারণের মধ্যে, পিছনে জনসমর্থন আছে, তাকে যথেষ্ট পরিমাণে সযত্নে দেখাশোনা করা হচ্ছে। তার বহুসংখ্যক তহবিল আছে, কংগ্রেস সংগঠন ছাড়াও তাদের অধীনস্থ নানা সংগঠন আছে। সে সবের সাহায্যে তাঁরা কাজ করেন। অনেক বছর ধরে দলটিকে সংহত করে তোলা হয়েছে এবং ১৯৩৭-এ প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলি গঠন হওয়ার পর আরও জোর দেওয়া হয়েছে তার ওপর। ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে দলটি আরও কর্তৃত্বপরায়ণ এবং ক্ষমতাপ্রিয়ও হয়ে উঠেছে।

এখন আমরা কি বিশ্বাস করি নতুন ভারত গড়ে তোলবার কাজ এই দল করতে পারবে? যদি তাই মনে করি, তার প্রতি আমাদের পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদান করা উচিত এবং যেটুকু বিরোধ আমাদের দিক থেকে তার প্রতি করা উচিত, তা হল বন্ধুত্বপূর্ণ সমালোচনা। কিন্তু যদি তা মনে না করি? সে ক্ষেত্রে একটি নতুন দলের প্রয়োজন হবে, এমন একটি দলের যারা একটি বিকল্প তত্ত্ব এবং একটি নতুন পন্থা নিয়ে আসবে। সেরকম একটি দলের দুটি ভূমিকা থাকবে, একটি এই মুহূর্তের জন্য, আরেকটি সুদূর ভবিষ্যতের জন্য। এই দুটি দায়িত্ব পালনের জন্য নতুন দলটির ব্যাপক জনসমর্থন চাই, গান্ধীবাদীরা যত জনসমর্থন তাঁদের আছে বলে দাবি করেন, তার চেয়ে বেশি। বৃহৎ জনসমর্থন আসতে পারে একমাত্র যদি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কার্য করে এবং বহু সংখ্যক সদস্য সংগ্রহ করে। গ্রেট ব্রিটেনের সোশ্যালিস্ট কিংবা ভারতের এখনকার কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির মতো সংগঠন একটি গণ-আন্দোলনের মুখপাত্র অথবা ধারক ও বাহক হতে পারে না। সে দল বায়ুভূত হয়ে থাকবে, মাটিতে তার কোনও শিকড় থাকবে না।

সেইরকম একটি দল কী ভূমিকা পালন করবে তা নিয়ে যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝি আছে। আসলে দলটিকে দুটি ভূমিকা পালন করতে হবে। একটি এখনই, একটি শেষ পর্যন্ত। তার এখনকার ভূমিকা হবে, আপোসহীন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম। শেষপর্যন্ত তার ভূমিকা হবে সংগ্রামোত্তর পর্বের। জাতীয় পুনর্গঠনের কালে। তার ভূমিকা হবে সমাজতান্ত্রিকের। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে সমাজ তান্ত্রিক প্রচার চালানো যায়। চালাতে হবে। কিন্তু দলটির ভূমিকা হবে, সমাজতান্ত্রিক নয়, আপোসহীন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধের। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতাদের অনেকে এই ভুল ধারণা পোষণ করেছেন যে, দলে বর্তমান কর্তব্য শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক প্রচার কার্য চালানো এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেসের মেশিনারিকে চাঙ্গা করে তোলা। দলটির যে ভরাডুবি হয়েছে, এটি তার একটি প্রধান কারণ।

গান্ধীবাদে যাঁরা একান্ত বিশ্বাসী নন, তাঁদের কর্তব্য খুব পরিষ্কার। সে-কর্তব্য হল একটি প্রকৃত বামপন্থী দল গড়ে তোলা, একটি আধুনিক দলের যা কিছু আনুষঙ্গিক বস্তু ইত্যাদি থাকে, সে সব সহ। এ-বিষয়ে কারও কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, সেই প্রচেষ্টা হওয়া মাত্র

তার ওপরে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের রোষ বর্ষিত হবে। শুধু তাই নয়, উদীয়মান দলটিকে পিষে দেওয়ার জন্য ন্যায়-অন্যায়ের পরোয়া না করে প্রতিহিংসাপরায়ণ পথ অবলম্বন করা হবে। তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু থাকবে না। কারণ রাজনীতির খেলা ওই রকমই। বিগত আঠারো মাস আমরা দেখেছি যে, অনেক বড় বড় বামপন্থী এই ধরনের দক্ষিণপন্থী আক্রমণ প্রত্যাশা করেননি। ভবিষ্যতে আমরা যেন সে ভুল আবার না করি। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সবাই যেন আজ বিচক্ষণ হয়ে ওঠেন।

পাঠকদের মনে থাকবে সি এস পির সদস্যদের এবং কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের (গান্ধীবাদী নেতৃত্বের) মধ্যে প্রথম দিক থেকেই সংঘাত আরম্ভ হয়েছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকেও কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দলকে তাঁর সমর্থন দান করে ঝঞ্ঝাটে পড়েছিলেন। যখন তিনি ১৯৩৬, ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন, সে সময়ে তিনি আদৌ সুখী ছিলেন না, সি এস পিকে তাঁর সমর্থন খাটো করে তাঁকে গান্ধীবাদীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হয়েছিল। আবার কংগ্রেস সোশ্যালিস্টরাও শীর্ষ নেতৃত্বের কোপে পড়ে, সাহস করে রুখে দাঁড়ালেন না। জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তাঁরা এমন একটা অবস্থানের দিকে সরে যেতে থাকলেন, গান্ধীবাদীদের শিবিরে যাঁরা বড় বড় নেতা ছিলেন, তাঁরা যেটা কম অপছন্দ করবেন। শেষোক্তরা সেটা লক্ষ করলেন এবং সেই অনুযায়ী তাঁরা বামপন্থীদের বিরুদ্ধে তাঁদের আক্রমণ আরও প্রবলভাবে চালিয়ে যেতে থাকলেন।

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির তরফ থেকে এমন কোনও বিবৃতি দেওয়া হল না। কোনও বাক্য উচ্চারিত হল না, যাতে মনে হতে পারে সেই দলটি ভবিষ্যতে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের কোনও বিপদের কারণ হতে পারে। শেষোক্তেরা যথেষ্ট পরিমাণে আশ্বস্ত বোধ করলেন এবং তারপর থেকে দেখা গেল এক একজন গান্ধীবাদী এক একজন কংগ্রেস সোশ্যালিস্টের প্রশংসা করছেন। এই প্রশংসা, যা কখনও কখনও উচ্চতম মহল থেকে এসেছিল, কংগ্রেস সোশ্যালিস্টদের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের সর্বনাশের রাস্তা আরও মসৃণ করে দিল। এই যে তাঁদের অবস্থানের পরিবর্তন, তার একটা যুক্তি সম্মত সাফাই খাড়া করবার উদ্দেশ্যে সমাজবাদী কংগ্রেসিরা ঐক্যের স্লোগান আবিষ্কার করে প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা নিজেদের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করবার একটা কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। "ঐক্য"র এই নতুন ব্যাখ্যা শেষপর্যন্ত সমাজবাদী কংগ্রেস পার্টিকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে এল, যেখান থেকে, সংসদীয় বিরোধী পক্ষের যে নরমপন্থী ভূমিকা, সেটাও তাঁরা আর সাহস করে গ্রহণ করতে পারলেন না, কেননা এমনকী সংসদীয় বিরোধী পক্ষকেও বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে সরকারকে সরিয়ে তার জায়গায় গিয়ে বসতে হয়। শেষ পর্যায়ে এসে সি এস পি এমন খোলাখুলি শীর্ষ নেতৃত্বের সুনজরে পড়বার চেষ্টা করতে লাগল যে, সমালোচনায় একটি শব্দ যদি তাদের মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ত একশোটি শব্দ তারা তাদের প্রশংসা করে বলতেন, এবং মহাত্মা গান্ধীর ওপর তাঁদের আস্থা ও বিশ্বাস ব্যক্ত করায় কোনও সীমাপরিসীমা থাকত না।

এখানে একটি জিনিস লক্ষ করা দরকার। সি এস পি-র ওপর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রভাব সব সময়েই বেশ শক্তিশালী ছিল। ১৯৩৪ সালে সে দলের যে প্রতিষ্ঠা হয়, তাতে তাঁর যথেষ্ট হাত ছিল এবং তদ্বধি বহুলাংশে তিনি সে দলের ভবিষ্যৎ কী হবে সে বিষয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৩৭ সালে ধীরে ধীরে তাঁর গান্ধীবাদীদের মধ্যে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সি এস পিও তাঁকে অনুসরণ করেছে। ফলত আমরা দেখছি যে, সি এস পি-র ওপরে

পণ্ডিত নেহরু এবং প্রাক্তন গান্ধীবাদীদের প্রভাব এত বেশি যে, আজ বলতে চেষ্টা করে। সি এস পি গান্ধীবাদীদের অধীনস্থ একটি সংগঠন।

নিকৃষ্ট নেতৃত্ব কেমন করে একটি অসামান্য দলের ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করতে পারে, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী পার্টি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাজনৈতিক ব্যাপারে তত্ত্ব কিংবা মতবাদকে খাটো করে দেখা উচিত নয়, কিন্তু মানবিক উৎকর্ষের দিকের গুরুত্বটাও অগ্রাহ্য করা ঠিক নয়। ইউরোপের আধুনিক যে সব রাজনৈতিক দল, সেগুলোর যাঁরা বড় বড় নেতা, তাঁদের ব্যক্তিত্ব যদি না থাকত, তা হলে সেগুলোর কী দশা হত?

ভবিষ্যতে যেন কেউ বামপন্থী ভূমিকা পালন করা, কিংবা বামপন্থী দল সংগঠন করার চিন্তা না করেন, যদি তিনি কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের জঘন্যতম আক্রমণের জন্য প্রস্তুত না হন। তাঁরা, ভবিষ্যতে তাঁদের জীবন নিরাপত্তার পক্ষে বিপদজনক হতে পারে, এমন সমস্ত বিরোধিতা চূর্ণ করবার জন্য যত দূর যেতে হয় যাবেন। এবং তাঁরা ঐক্যের স্লোগান ব্যবহার করবেন, ঠিক যেমন সি এস পি নিজেদের সংকল্প সিদ্ধির জন্য ঐক্যের স্লোগানের আড়াল নিয়েছিল।

কমরেড এম. এন. রায় এবং তাঁর লীগ ৯ জুলাই ১৯৩৯ থেকে যা করছেন তার পিছনেও সেই একই মনোভাব কাজ করছে, নিরাপত্তার সেই একই তাগিদ।

আমার নিজস্ব ঘোষণাপত্র

[এই দার্শনিক রচনাটি ১৯৪০ সালের নেতাজির কারাবাসকালীন কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল এবং এই প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে। এটি প্রেরিত হয়নি বলে চিহ্নিত ছিল এবং স্পষ্টত তার অর্থ সরকার এটিকে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পাঠায়নি। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এটি তিনি ২৯ নভেম্বর ১৯৪০ তারিখে লিখেছিলেন, যেদিন প্রেসিডেন্সি জেলে, বিনা বিচারে তাঁকে আটক করার প্রতিবাদে আমরণ অনশন আরম্ভ করেন।— সম্পাদকদ্বয়]

পাশার দান ফেলা হয়ে গেছে। ফেরার আর পথ নেই, আজ সকালে আবার অনশন আরম্ভ হয়েছে। বঙ্গ সরকারকে আগেই আমি একটি চিঠি দিয়েছি, যার মধ্যে আমার নিজের রাজনৈতিক বিষয়ে যা জানাবার জানিয়ে দিয়েছি। এখানে আমি যা করতে চাই, তাকে বলা যায় আমার ব্যক্তিগত ঘোষণা। আমি চাই, যখন আমি আর থাকব না, তখন যেন জীবনের গভীরতর সমস্যাগুলো যাঁদের আগ্রহের বিষয় তাঁদের কাছে এটি পৌঁছে দেওয়া হয়, বিশেষত আমার সেই প্রিয় ছেলেটির কাছে, আমার দার্শনিক চিন্তাভাবনা ও ধারণাগুলির কিছু যার জানা আছে।

আমার বিশ্বাস, প্রকৃতি আমাকে শুরুতে, প্রথমত এবং প্রধানত মননশীল, ভাবুক মানুষ করে তৈরি করেছিল। কিন্তু অবস্থার গতিকে আমাকে বাধ্য হয়ে ব্যস্ত রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করতে হয়েছে, যার ফলে ভারতের এবং পৃথিবীর চিন্তায় জীবনে আমি আমার যা দান করার ছিল তা করতে পারিনি। কিন্তু দার্শনিক সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধে আমার কিছু কিছু সুনির্দিষ্ট চিন্তা-ভাবনা আছে এবং আমি চাই আমাদের পরে যে সব প্রজন্ম আসবে তারা সেইসব চিন্তা ভাবনাকে সম্প্রসারণ করে তার ওপরে কাজ করুক। নিজের সম্পর্কে আমি এটুকু দাবি করতে পারি যে আমার চিন্তা-ভাবনা বাতাসে ভেসে বেড়ায় না। বাস্তবের সঙ্গে, বাস্তবকে আমরা যেমন জানি তার সঙ্গে সেগুলো ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পৃক্ত এবং সেগুলো জন্ম নিয়েছে বিরামহীন কর্মজীবন থেকে, এমন একটি জীবন যেটি পৃথিবীকে ভুলে যায়নি।

বিশ্ববিপ্লবের পরবর্তী পর্যায় একটি নতুন দর্শন দাবি করবে, একটি নতুন নৈতিক ধারণা, একটি নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা। সে বিষয়ে আমাদের অবদান কী হবে?

নতুন দর্শন— বিগত কয়েক দশকে দার্শনিক চিন্তায় ইংল্যান্ড এমন বিশেষ কিছু যোগায়নি, যাকে বলা যায় মৌলিক।

আমেরিকা দিয়েছে বাস্তবধর্মী প্রয়োগবাদ, ফ্রান্স হেনরি বার্গসঁর জন্ম দিয়েছে, জার্মানির কাছ থেকে পেয়েছি হেগেলকে। আধুনিক দর্শনের সারাৎসার হেগেলবাদ, কমিউনিজম হেগেলীয় মতবাদেরই একটা দিক, অর্থাৎ দ্বন্দ্ববাদ, কিন্তু বাস্তবতা সম্পর্কে হেগেলীয় ধারণাকে তা খারিজ করেছে। নাৎসিবাদের কোনও দর্শন নেই, আমি যতদূর জানি, গান্ধীবাদ ভ্রান্ত নীতিবিদ্যার ওপর স্থাপিত এবং তার দর্শন অস্পষ্ট, অতীন্দ্রিয়বাদী। আমরা যদি একটি নতুন ভারত চাই, আমাদের একটি নতুন দর্শন পেতেই হবে।

দুটি মূল দার্শনিক সমস্যা, (১) অনপেক্ষ প্রকৃত বাস্তবতা কী? (২) আমরা যে বাস্তবতাকে জানি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনা ও ব্যাপারের জগতে, তা প্রকৃতপক্ষে কী এবং কীভাবে তার বিবর্তন হয়? বিবর্তন সম্পর্কে সঠিক ধারণা নীতিবিদ্যা, অর্থবিদ্যা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে সঠিক চিন্তার পক্ষে অপরিহার্য।

বেদান্ত যে বলেছে, অনাপেক্ষিক বাস্তবতা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। অতিশয় যথার্থ। কিন্তু সেই কারণে আমরা আমাদের মন, চেতনাসমূহ ইত্যাদি দ্বারা যা অনপেক্ষ তার যত আলোকচিত্র গ্রহণ করতে চেষ্টা করব না, তা নয়। স্মরণাতীত কাল থেকে সেই প্রচেষ্টা চলে আসছে এবং তার ফলে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হয়েছে, সে সমস্ত মতবাদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধেছে। কোনও একটি আলোকচিত্রকে ভ্রান্ত বলে বাতিল করা ভুল হবে, যদিও একটি আলোকচিত্র অন্যটির চেয়ে অধিকতর যথার্থ হতে পারে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কোনও মতবাদকে বাতিল করেননি, তাঁরা বলেছেন মানুষের যাত্রা ভ্রান্তি থেকে সত্যের দিকে নয়, সত্য থেকে উচ্চতর সত্যের দিকে। পরমকে (the Absolute) বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হেগেল তাকে বলেছেন 'thought' অথবা 'idea', ভন হার্টমান বলেছেন 'will', বার্গসঁ বলেছেন 'elan vital' অথবা 'vital impulse', বেদান্ত বলেছে চিৎ অথবা চেতনা, অথবা 'আনন্দ', তন্ত্র বলেছে 'শক্তি' এবং কতিপয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে তাকে বলা হয়েছে 'প্রেম'। এইসব ধারণার প্রত্যেকটিই সত্য, যদিও প্রত্যেকটিরই আংশিক সত্য। কিন্তু আমার মতে 'চিৎ', Elan এবং প্রেম পরম সত্যের অন্য ধারণাগুলির যে কোনওটির চেয়ে, অধিকতর যথার্থ চিত্র দেয়। মানুষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, তা সত্ত্বেও

'পরম'-এর সঠিক যথার্থ ধারণা লাভের চেষ্টা না করে আমরা পারি না। অংশত তার কারণ আমাদের দার্শনিক প্রবৃত্তি অদম্য, অংশত এইজন্য যে নীতিবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোনও প্রণালী কোনও সুসম্বন্ধ তত্ত্ব দাবি করে পরম বাস্তব সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা। আমাদের চিন্তার পশ্চাতে সে রকম কোনও চূড়ান্ত ধারণা যদি না থাকে আমরা ভ্রান্তিতে পড়তে পারি। আমরা যে সামাজিক ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, পরম বাস্তবতা সম্পর্কে আমাদের ধারণার সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া চাই।

দ্বিতীয় দার্শনিক সমস্যাটি হল, বিশ্ব এবং বিবর্তনের পদ্ধতিটির প্রকৃতি কী? এই সমস্যাটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনা ও ব্যাপারের যে জগৎ, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তার অন্তঃশায়ী পরম বাস্তবের সঙ্গে নয়। সমস্যার এই দুটি দিক পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তা সত্ত্বেও প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টির কার্যকরী গুরুত্ব বেশি।

সমস্যাটির সমাধানের প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা করে সম্ভবত সাংখ্য দর্শন, সেই দর্শনে বিবর্তনবাদের একটি ধারণা দেখি যা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক, যদিও আজকের দিনে অনেকের সেটা স্থূল মনে হতে পারে। প্রাচ্যদেশের চিন্তকগণ ছাড়াও প্রাচীন গ্রিসের দার্শনিকেরা প্রশ্ন উত্তর খুঁজেছেন। এবং সে প্রচেষ্টা চলেছে যুগে যুগে।

বিশ্বপ্রকৃতির প্রকৃতপক্ষে কী? সে কি বস্তু, না শক্তি, না মন? এবং বস্তু কী? বোধের সমষ্টি ? পরমাণুর সন্নিবেশ? না কি স্থির শক্তি? বস্তুকে বিশ্লেষণ করলে তার বস্তুসত্তা কি বজায় থাকে, না কি তা আবার শক্তিতে পরিণত হয়? এ সব প্রশ্ন কৌতূহলোদ্দীপক এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণাও এসব প্রশ্নের ওপর প্রতিদিন আলোকপাত করছে। এ বিষয়ে আগামীর উত্তরাধিকারীগণ আমাদের চেয়ে অধিকতর জ্ঞানবান হবে। তবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনা সমূহের যে বিশ্ব তার সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরের তাত্ত্বিক মূল্য বেশি নেই, কারণ তার মান্যতা আপেক্ষিক এবং পরম বাস্তব চিরদিনই থেকে যাবে অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। তা সত্ত্বেও, তার কিছু কার্যকরী উপযোগিতা আছে।

তার চেয়ে কার্যকরী উপযোগিতা আছে, বিবর্তন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা, তার। প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত আমরা বিবর্তনের সম্পর্কে কয়েকটি ধারণা দেখেছি— সাংখ্য দর্শনের ধারণা, স্পেনসারের ধারণা, বার্গসঁ-র ধারণা, হেগেলের ধারণা ইত্যাদি। এখানেও প্রত্যেকটি ধারণাতেই কিছু সত্য আছে, যদিও আমার মতে অন্য সবগুলি ধারণার চেয়ে হেগেলীয় ধারণা সত্যের অনেক বেশি কাছাকাছি পৌঁছেছে।

হেগেলের মতে বিবর্তনের প্রক্রিয়ার চরিত্র দ্বান্দ্বিক (তত্ত্ব, বিপরীত তত্ত্ব, বিশ্লেষণ), এবং চিন্তা ও বাস্তব একই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় চলে। এখন, আমরা যা দেখি তার অনেক কিছুই দ্বন্দ্ববাদ প্রশ্নাতীতভাবে ব্যাখ্যা করে না। প্রকৃতপক্ষে বিবর্তনের প্রক্রিয়া, দ্বন্দ্ববাদ যেসব বলে, ততটা একঘেয়ে ততটা বৈচিত্র্যহীন, তা নয়। যেমন প্রকৃত বিবর্তনে এমন কিছু থাকে যা বিস্ফোরণের মতো, আকস্মিক, যার ব্যাখ্যা নেই, যার ফলে আমাদের বিশ্বাস করতে হয় বার্গসঁর ধারণায় যে সৃজনশীল বিবর্তনের কথা পাই তাতে। তার মধ্যে কিছু সত্য আছে। তা ছাড়া, জীববিজ্ঞান প্রসঙ্গে বলা যায়, সরল থেকে জটিলের দিকে বিবর্তনের স্পেনসরীয় ধারণা সারবত্তাহীন নয়, এবং জীববিজ্ঞানে বিবর্তনকে শুধুমাত্র তত্ত্ব, বিপরীত তত্ত্ব ও বিশ্লেষণের কথা বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। কাজেই এরকম ভাবাই ভাল যে, অন্যান্য ধারণাতে যদিও কিছু কিছু সত্য থাকতে পারে হেগেলীয় ধারণাই অন্যান্য ধারণাগুলির চেয়ে সত্যের বেশি কাছাকাছি গেছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্নাবলীর বিষয়ে আমাদের মন খোলা রাখাই ভাল। সেইসঙ্গে, বিজ্ঞান এ পর্যন্ত যা কিছু আবিষ্কার করেছে সে-সবও জেনে রাখতে হবে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও আলোকপাত হবে। ইতিমধ্যে, মনে রাখতে হবে, বস্তুবাদের প্রাচীন ধারণা সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। বিজ্ঞানের গবেষণা এবং দার্শনিকের ধারণার পারস্পরিক যুদ্ধের মধ্যে পড়ে গেছে এই মতবাদ।

৪৬

আমার বিবেক আমার নিজস্ব

৯ ডিসেম্বর ১৯৪০-এর একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ

একটি অনশন ধর্মঘটের পরে স্বাস্থ্যোদ্ধারের সময়ে, বঙ্গদেশের কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে বসু ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধে গৃহীত শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে শাস্তি প্রত্যাহারের প্রশ্নে মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে একজন বন্ধু যে টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে নেতাজিকে মন্তব্য করতে বলা হয়েছিল। গান্ধীজির টেলিগ্রামটি ছিল নিম্নরূপ:

ওয়ার্ধাগঞ্জ,
২৮. ১১. ৪০

বসু ভ্রাতৃগণের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব সত্ত্বেও হস্তক্ষেপে আমার অপারগতা, এমনকী অনিচ্ছার জন্য আমি দুঃখিত। আমার মনে হয় তাঁরা শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য ক্ষমা না চাইলে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সম্ভব নয়।

নেতাজির মন্তব্য এইরূপ: আমার রাজনৈতিক 'গুরু' দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, যিনি আর ইহজগতে নেই, তাঁর কাছ থেকে আমি আমার শিক্ষাগ্রহণ করেছি যে, ব্যক্তিগত সম্পর্ককে মানুষের পক্ষে যতদূর সম্ভব রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে রাখা উচিত। সেই কারণে মহাত্মা গান্ধীর জন্য গভীর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা আমি সযত্নে রক্ষা করেছি, গান্ধীবাদীদের কাছ থেকে দুঃখ যন্ত্রণা যত পেয়েছি এবং পাচ্ছি সে সব সত্ত্বেও।

স্কুলে আমি একদা সুইজারল্যান্ডের সবচেয়ে বড় বীর, উইলিয়াম টেল সম্পর্কে একটি কবিতা পড়েছিলাম— My knee shall bend, he calmly said,
To God and God alone,
My life is in the Austrians' hands.
My conscience is my own

("আমি নতজানু হব," সে শান্তভাবে বলল, "ঈশ্বরের কাছে, একমাত্র ঈশ্বরের কাছে। আমার জীবন অস্ট্রীয়দের হাতে, আমার বিবেক আমার নিজস্ব।")

আমার রাজনৈতিক জীবনে কোনও অন্যায় করেছি বলে আমি জানি না। অতএব মহাত্মার কাছে আমার উত্তর, উল্লিখিত ছত্রগুলিতেই নিহিত, কয়েকটি ছোটখাটো পরিবর্তন সহ।

৪৭

বঙ্গীয় কংগ্রেসের জোট বিষয়ে

১০ ও ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৪০-এ নেতাজি বঙ্গীয় কংগ্রেসের ব্যাপার নিয়ে কয়েকটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। বঙ্গীয় কংগ্রেসের সংসদীয় দলের নেতা শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঘোষণার ফলে কংগ্রেসের আইনসভা ক্ষেত্রে নতুন একটি সঙ্কট সদ্য সৃষ্ট হয়েছিল। ঘোষণাটি করেছিলেন কংগ্রেসের সারাভারত সংসদীয় উপসমিতির পক্ষে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। নিম্নে বিবৃতিগুলি একত্র করা হয়েছে এবং বিতর্কের কয়েকটি খুঁটিনাটি বাদ দেওয়া হয়েছে, নেতাজির দৃষ্টিকোণটি প্রতিফলিত করার জন্য।

বিগত কয়েক দিন আমি মানসিক অশান্তি ভোগ করেছি। তার কারণ কয়েকটি চিন্তা অনবরত আমার মনের মধ্যে ঠেলে উঠেছে। আমার বিশ্বাস নিজেকে সেইসব চিন্তার ভারমুক্ত করতে পারলে আমি এখনকার চেয়ে বেশি মানসিক শান্তি পাব, এবং তাতে আমার স্বাস্থ্যের উন্নতির এবং আরোগ্যলাভের সহায়তা হবে। সেই কারণে আমি অবসর মতো কয়েকটি বিবৃতি জারি করবার অনুমতি আমার চিকিৎসকের কাছে চেয়েছিলাম। তার কয়েকটি এখনই আমার কাছে আছে। জেলে থাকার সময়ে আমার লেখা অসম্পূর্ণ চিঠি হিসাবে।

প্রথমে আমি বলব সেই বিষয়টি নিয়ে বঙ্গদেশের কংগ্রেসি মহল যা নিয়ে এখন আলোড়িত, অর্থাৎ শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু সম্পর্কে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের হুকুমনামা। আমি বুঝতে পারছি না, এসময়, যখন দেশ এ রকম একটা সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, যখন কংগ্রেস নেতারা নিজেরাই বারে বারে ঐক্যের জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন, তখনও মৌলানা এ রকম একটা পদক্ষেপ কী করে গ্রহণ করতে পারলেন। আমার এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমাদের দিক থেকে আমরা সর্বান্তঃকরণে ঐক্যের আকাঙ্ক্ষী এবং যে সব সমস্যা— এবং মতভেদ এখনও মেটেনি, তার সম্মানজনক সমাধান আমরা সবাই চাই। তবে, কংগ্রেস নেতারা যে অবস্থান গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ বামপন্থীদের যাঁরা বন্ধু এবং সহযোগী তাঁদের কাছে কোনও সম্মানজনক মিটমাটের প্রস্তাব করা যাবে না, সেটা আমরা মানতে পারি না। অতএব সর্বসাধারণের চোখে আমাদের অসম্মান করার ও হেয় করার সুনামের হানি করার কোনও রকম চেষ্টা হলে, আমরা দুঃখের সঙ্গে তা প্রতিরোধ করতে শুধু নয়, যেখানেই সম্ভব,

তার বিরুদ্ধে প্রতিআক্রমণ করতেও বাধ্য হব। আমরা যেহেতু বড় বড় বিষয় নিয়ে এখন ব্যাপৃত আছি, অতএব আমরা নিজেদের দলের মধ্যে থেকে আক্রমণ এলে তাকে অগ্রাহ্য করব, এমন কথা মৌলানা যেন মনে না করেন।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর ওপর যে আক্রমণ হয়েছে, সেটা জুলাই ১৯৩৯ থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ওপর যে আক্রমণ চলছে তারই একটা পর্যায়। সেই কারণে এ বিষয়ে গুরুতর ভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়ে বি পি সি সির উপায় নেই। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সংসদীয় দলের মধ্যে মৌলানা যখন জোর করে একটা বিভেদ সৃষ্টি করেছেন, বিপিসিসি জানতে চায় কারা তার পক্ষে আর কারা তার বিপক্ষে। সেই দলের মধ্যে আমরা সংখ্যাগুরু কিনা তাতে কিছু আসে যায় না। সংখ্যাগুরু কিংবা সংখ্যালঘু, আমরা যাই হই, বঙ্গীয় আইনসভায় আমাদের বন্ধু ও সমর্থকেরা 'কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টি', এই নাম ও আখ্যাতেই কাজ করে যাবেন। যাঁরা বিশেষ একটি কাজ করার জন্য আইনসভার সদস্য হয়েছেন সেই 'অ্যাড হক'* সদস্যেরা নিজেদের কংগ্রেস সংসদীয় দল বলে দাবি করতে পারেন না। কারণ তাঁরা, যেটি একমাত্র বিধিসম্মত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, তার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন না।

বলা বাহুল্য, যাঁরা এই সময়ে বিপিসিসি-র সঙ্গে নেই, আগামী সাধারণ নির্বাচনে পুনরায় মনোনীত হওয়ার অধিকার তাঁরা সম্পূর্ণ হারিয়েছেন। বঙ্গদেশে সাধারণ নির্বাচনে মৌলানার টিকিটে যাঁরা দাঁড়াবেন তাঁরা কত ভোট পাবেন আর বিপিসিসির টিকিট নিয়ে যাঁরা দাঁড়াবেন, তাঁরাই বা কত ভোট পাবেন, তা অনুমান করতে বেশি বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

এবং এখনই এই মুহূর্তেই, আমি জানিয়ে দিতে চাই, কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব যদি তাঁদের বর্তমান নীতি আঁকড়ে থাকেনি, আগামী সাধারণ নির্বাচনে, শুধু বঙ্গদেশেই নয়, সারা ভারতে সমান্তরাল স্বতন্ত্র নির্বাচন হবে। এ বারে আর, গতবারের মতো, বামপন্থীদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে গিয়ে দক্ষিণপন্থীদের সরকার দখল করতে দেওয়া হবে না।

জনগণ-সংগ্রান্ত যে কোনও বিষয়ের শেষ মীমাংসা হবে, যেটা শেষ আপিলের আদালত সেই জনগণের কোর্টে। অতএব আমি বঙ্গদেশের বর্তমান সংসদীয় জোটের একটি সমাধানের প্রস্তাব দিতে চাই। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে নিন্দা করে তাঁকে বহিষ্কার করতে চেয়েছেন। অন্যেরা তাঁর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেছেন। কিন্তু বঙ্গদেশের জনসাধারণ কী বলেন? আইনসভার সমস্ত কংগ্রেস সদস্য পদত্যাগ করুন এবং এই প্রশ্নের ওপর পুনর্নির্বাচনের জন্য দাঁড়ান। ক্ষুদ্রতর মানুষদের সঙ্গে লড়াই করে লাভ হবে না, কাজেই স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী, তাঁর সমর্থন অনুমোদন দিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির প্রার্থীদের দাঁড় করান। তাঁদের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে আমরা প্রার্থীদের মনোনীত করব। তারপর আমরা শান্ত হয়ে আত্মবিশ্বাস সহকারে নির্বাচকদের রায়ের জন্য অপেক্ষা করব। মহাত্মাজি রাজি হবেন?

দলের আদেশ পালন করবার জন্য মৌলানা দল থেকে এবং আইনসভা থেকে নেতাকে বহিষ্কার করতে চেয়েছেন। মৌলানা তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন অতি গোপনে, সংসদীয় দলের অজ্ঞাতে, ঘটনার প্রায় ছ'মাস পরে।

---

* নির্বাচিত কংগ্রেস কমিটির অধিকাংশ সদস্য, নির্ধারিত নীতিসমূহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব অ্যাড হক কমিটি গঠন করে।

এ আক্রমণ প্রকৃতপক্ষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং তার আইনসভা অংশের উপর। কে না জানে বঙ্গীয় আইনসভায় আমাদের একটি শক্তিশালী— ঘাঁটি আছে? সেই ঘাঁটিকে মৌলানা ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছেন, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে মৌলানাকে আমি একটি পরামর্শ দেব। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং সংসদীয় দলকে ডিঙিয়ে এরকম একটি আদেশ জারি করে তিনি তাদেরকে পুরোপুরি নস্যাৎ করেছেন। কিন্তু এই প্রদেশে তাঁর এমন কোনও প্রতিষ্ঠা কিংবা এমন সংখ্যক অনুগামী নেই যার কারণে তাঁর কর্তৃত্বপরায়ণতা মানুষ সহ্য করবে। অতএব ভবিষ্যতে একনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করতে গিয়ে তিনি যেন নিজে ভুলে না যান তিনি কে।

...আশা করি আমি প্রমাণ করতে পেরেছি, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ তার কোনও ভিত্তি নেই। মৌলানা নিজেও তাঁর বক্তব্যের দুর্বলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত নন। সেই কারণেই ব্যক্তিগত কথাবার্তায় এবং প্রকাশ্যে তাঁকে তাঁর একটি মাত্র যুক্তিই সামনে আনতে হয়, শৃঙ্খলাভঙ্গ। এখন দেখা যাক শৃঙ্খলা বলতে প্রকৃতপক্ষে কী বোঝায়। কোনও স্বেচ্ছাতান্ত্রিক সংগঠনে শৃঙ্খলার অর্থ— ঊর্ধ্বতন অফিসারদের আদেশ পালন, গণতান্ত্রিক সংগঠনে শৃঙ্খলা সংখ্যাগুরুর অভিযোগ অনুযায়ী কাজ করা। মৌলানা এবং তাঁর অনুবর্তী কংগ্রেসিরা দায়ী করেন, যেহেতু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁরা সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু বামপন্থীদের উচিত, বিনাপ্রশ্নে ইচ্ছা পালন করা, এবং যদি তাঁরা তা না করেন তাঁদের শাস্তি হওয়া উচিত। সংখ্যাগুরুর শাসনের একই নীতি স্বাভাবিকভাবেই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ক্ষেত্রেও প্রযোয্য হওয়া উচিত। কিন্তু তা করা হয় না। এখানে বঙ্গদেশে সংখ্যালঘু দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের অগ্রাহ্য করতে চান, তার জন্য কোনও শাস্তিভোগ না করে, এবং সে কাজে তাঁরা সর্বদা কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী শীর্ষ নেতৃত্বের সমর্থন লাভ করেন। গাছেরও খাব, তলারও কুড়াব, তা তো হয় না। সারা ভারত কংগ্রেস কমিটিতে সংখ্যাগুরুর শাসন, আর বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে সংখ্যালঘু শাসন, এ চলতে পারে না। অতএব মৌলানা আজাদ যে অহোরাত্র, যে কোনও মূল্যে শৃঙ্খলার যুক্তি দেখান তা যুক্তিসহ নয়।

বলা হতে পারে, শীর্ষ নেতৃত্ব যেহেতু কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কার্যকারণী তায় অনুজ্ঞা সকল কংগ্রেসি এবং কংগ্রেস সংগঠনের পালন করা উচিত। কিন্তু এ ধরনের শৃঙ্খলা সম্ভব কেবলমাত্র স্বৈরতান্ত্রিক সংগঠনে। আমি আগেই যা বলেছি, গণতান্ত্রিক সংগঠনে শৃঙ্খলার একমাত্র অর্থ হতে পারে, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। তার অর্থ কখনওই হতে পারে না। যে কোনও পরিস্থিতিতে উচ্চতর আধিকারিকের প্রতি বাধ্যতা।

বর্তমান ক্ষেত্রে মৌলানা বঙ্গীয় কংগ্রেস পরিষদীয় দলকে খোলাখুলি অগ্রাহ্য করেছেন এবং দলকে না জানিয়ে তিনি নেতাকে শাস্তি দিতে চান, এই অপরাধে যে নেতা দলের প্রস্তাবকে কার্যকর করেছেন, যে প্রস্তাবে আছে নেতা উচ্চতর কক্ষের অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনের জন্য হুইপ জারি করবেন।

যদি যুক্তি দেখানো হয়, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের নীতি কেবলমাত্র অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির বেলাতেই প্রযোজ্য এবং কংগ্রেসের অন্য কোনও সংগঠনের কোনও স্বাধীন সত্তা নেই এবং তাঁদের উচিত শীর্ষ নেতৃত্বের অর্থাৎ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির, আজ্ঞা অনুসারে তা পালন করা, তা হলে আমি কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের কথা বলব।

সেই গঠনতন্ত্রে, ধারা ২-এ স্পষ্ট বলা হয়েছে, স্থানীয় সংগঠন, যেমন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিও অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির কংগ্রেসের অচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং শেষোক্ত সংগঠনটি

সেগুলির সৃষ্টি করেনি। অতএব অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি যে নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয়, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিও সেই একই নীতিতে পরিচালিত হওয়া উচিত।

তা ছাড়া একজন একনায়কের কিংবা একটি গোষ্ঠীর একতান্ত্রিক শাসন সহ্য করা যায় যদি তার মধ্যে কারও অথবা কোনওটির পিছনে বিশেষ এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যকের সমর্থন থাকে। বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থা মৌলানা কিংবা মহাত্মা গান্ধী, কারওই অজানা থাকার কথা নয়।

শেষ বিচারে আমরা সকলেই যা দাবি করি, কংগ্রেস যদি জাতীয় সংগঠন হয় সেই দাবির যৌক্তিকতা নির্ভর করে সেই সংগঠন জনসাধারণের আস্থা কতখানি ভোগ করে, তার ওপর। যেহেতু অ্যাড হক কমিটি বঙ্গদেশে জনসাধারণের আস্থা ভোগ করে না। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড থেকে কিংবা ওয়ার্ধা থেকে কোনও আদেশ অ্যাড হক কমিটিতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না, এবং তাকে একটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতেও পরিণত করতে পারবে না। পক্ষান্তরে, দুটি জায়গার কোনটি থেকে একটি হুকুমনামা আইনসঙ্গত বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটিকেও হত্যা করতে পারবে না। সেই কারণেই তথাকথিত নিলম্বনের পরেও আমরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধীনে কাজ করে যাচ্ছি এবং ভবিষ্যতেও কাজ চালিয়ে যাব।

তা থেকে এটা সিদ্ধান্ত করা যায় যে বঙ্গীয় বিধানসভার একমাত্র যে সব সদস্য আইনসঙ্গত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রতি অনুগত একমাত্র তাঁরাই বঙ্গীয় কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নামে কাজ করার অধিকার পাবেন। যাঁরা অ্যাড হক কমিটির সঙ্গে আছেন। ইচ্ছা করলে আইনভার একটি অ্যাড হক কমিটি গঠন করতে পারেন, কিন্তু কংগ্রেস সংসদীয় দলের নাম তাঁরা বে-আইনীভাবে গ্রহণ করতে পারেন না।

শৃঙ্খলার যুক্তির সঙ্গে আরেকটি সেই সম্পর্কিত যুক্তি, যা প্রায়ই হাজির করা হয়, সেটি হল, সাধারণ নির্বাচনের সময়ে সদস্যরা একটি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই অঙ্গীকারের প্রতি তাদের দায়বদ্ধ থাকা উচিত। এই যুক্তিটি এতই অসার যে বিশ্লেষণ করলেই তার অযাথার্থ্য স্পষ্ট হয়ে যাবে।

সেই অঙ্গীকার গ্রহণ করার পর, সময়, অবস্থা ইত্যাদি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সেই ওয়ার্কিং কমিটি যার ওপরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির আস্থা ছিল, এবং যেটি নিজেও শেষোক্তকে সম্মান করত, সেই ওয়ার্কিং কমিটি আর নেই। আজ বঙ্গীয় কংগ্রেসিদের অধিকাংশের ওয়ার্কিং কমিটির ওপরে আস্থা নেই। এই ওয়ার্কিং কমিটি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির আস্থা ভাজন অবশ্যই নয় এবং তেমনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকেও তাঁরা সম্মান করেন না। কাজেই সেই পুরনো অঙ্গীকারটি আপনা থেকেই বাতিল হয়ে গেছে। আগেকার সেই ওয়ার্কিং কমিটি এবং আপনার অবস্থা ও পরিস্থিতি আমাদের ফিরিয়ে দিন, তখন দেখবেন, আগেকার অঙ্গীকার বজায় আছে। তা না হলে নয়।

আমি জানি, বলা হবে, প্রত্যেক সংগঠনে এবং সংগঠন পরিচালনায় নীতির ধারাবাহিকতা বলে একটা জিনিস থাকে। কিন্তু বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সময়ে নীতির ধারাবাহিকতা সম্ভব নয়।

শীর্ষ নেতৃত্বের হাতে দুর্গতি একমাত্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিরই হয়নি। দিল্লি, কেরালা প্রভৃতির অন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিরও তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস

একনায়কদের জাদুদণ্ড একবার নাড়িয়ে দিয়েই তাদের খতম করা যায় না। কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের কৃপায় তাদের জন্ম হয়নি এবং কলমের এক খোঁচায় তাদের শেষ করে দেওয়া যাবে না, জনসাধারণের আস্থা যতদিন তাদের ওপর থাকবে ততদিন তারা কংগ্রেস কমিটি হিসাবে কাজ করে যাবে। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই, কেননা আমরা কংগ্রেসি এবং আমাদের সংগঠন কংগ্রেস সংগঠন। ভবিষ্যতে যদি সারা দেশে নির্বাচনে আমাদের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে লড়াই করতে হয়, সংসদ-বহির্ভূত ক্ষেত্রে যেমন লড়াই করেছি, আমরা কংগ্রেসের নামেই লড়াই করব। কংগ্রেসের বাইরে গিয়ে নয়। কংগ্রেস যতখানি অন্যদের ততখানি আমাদের।

আমি শুনেছি মৌলানা অনেককে বলেছেন, তিনি বাঙালিরও বেশি। তাই যদি হয়, তিনি বাংলার ঐতিহ্যের অনুসরণ করুন, মহান নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলুন। তিনি প্রতিহিংসার নীতি পরিত্যাগ করুন এবং সুসম্পর্ক স্থাপন করে, ভালবেসে এই প্রদেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করুন। সহনশীলতা ও ভালবাসার দ্বারা দেশবন্ধু শত্রুকে বন্ধু করতে পেরেছিলেন, ঐক্যবদ্ধ বঙ্গদেশ সৃষ্টি করেছিলেন। এই প্রদেশে অন্য কোনও বাণী মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে না।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং তাঁর অনুচরেরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণ পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বঙ্গীয় সংসদীয় কংগ্রেস পার্টির অধিবেশন শেষ মুহূর্তে স্থগিত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু গঠনতান্ত্রিক বিষয়ে মৌলানার যদি কোনও জ্ঞান থাকত, তিনি বুঝতে পারতেন যে, তাঁর কিংবা বঙ্গীয় সংসদীয় পার্টির জেনারেল সেক্রেটারির অধিবেশনে যথাবিধি আহূত হওয়ার পর, তা স্থগিত করবার কোনও ক্ষমতা নেই।

উপরোক্ত অধিবেশনে যথেচ্ছভাবে আচরণ করে এবং নিজের কর্তৃত্ব জাহির করে, মুলতুবির আদেশ দিয়েই মৌলানা সন্তুষ্ট হননি, তিনি এখন আবার যাঁরা তাঁর কর্তৃত্বপরায়ণ এবং স্পর্ধিত হুকুম নামায় ভীত হননি তাঁদেরকে তিরস্কার করে একটি হুইপও জারি করেছেন। মৌলানা বরাবরই দাবি করে এসেছেন তিনি বাঙালির চেয়েও বেশি কিন্তু পৃথিবীর এই প্রান্তের আচার-ব্যবহার সৌজন্য ভদ্রতা ও আতিথেয়তার বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সংসদীয় দলের সদস্যেরা যখন জেনারেল সেক্রেটারির আমন্ত্রণে মৌলানার গৃহে সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের স্বাগত জানানো এবং বসতে বলার সাধারণ ভদ্রতা তিনি দেখাননি। এমনকী যতক্ষণ তাঁরা সেখানে ছিলেন, তিনি নিজের মুখও দেখাননি।

মহামান্য মৌলানার একথা বুঝবার যথেষ্ট সময় হয়েছে যে একজন মোগল সম্রাটের ভূমিকা পালন করে তাঁর কোনও লাভ হবে না, সে-চেষ্টা করলে তিনি নিজেকেই হাস্যাস্পদ করবেন। বঙ্গদেশে তাঁর যে সামান্য প্রভাব এবং সামান্য সংখ্যক অনুগামী, এই প্রদেশের আবেগ অনুভূতির ওপর দিয়ে তিনি স্টিম রোলার চালিয়ে যেতে পারেন না।

আমি নিশ্চিত, বঙ্গীয় কংগ্রেস সংসদীয় দল, তিনি যে ভয় তাঁদের দেখিয়েছেন, তাকে তার প্রাপ্য মর্যাদা প্রদর্শন করে তুচ্ছজ্ঞান করবে। আমি বরং তাঁকে পরামর্শ দিই, এই প্রদেশে আর বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা তিনি না নেন কারণ, বৃহত্তর যেসব প্রশ্ন নিয়ে ভারতের মানুষ এখন অস্থির হয়ে উঠেছেন, সেদিকে তার শক্তি এবং মনোযোগ ব্যয় করেন।

শেষ করবার আগে আরেকটি কথা। মৌলানাকে আমি জানাতে চাই, কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র এবং বিভিন্ন প্রস্তাব অনুসারে, সর্বভারতীয় সংসদীয় উপ-সমিতি, তিনি যেমন মনে করেন, সেরকম সর্বশক্তিমান নয়। তাকে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে

হয় এবং বঙ্গদেশের কথা বলতে গেলে, কোনটি নিয়মসঙ্গত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, কে না জানে? আবার মৌলানাকে স্মরণ করিয়ে দিই, বঙ্গদেশে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, প্রাদেশিক নির্বাচন করাবে, যখনই সে-নির্বাচন হোক এবং তখনই আমরা দেখতে পাব, অ্যাডহক কমিটির এই আত্মজটি নির্বাচনে কেমন ফল করে।

কংগ্রেসের এই মোগল সম্রাটটি দ্রুত হাসির পাত্র হয়ে উঠছেন। তিনি এই অলীক মোহের বশবর্তী হয়ে আছেন যে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের তাঁর কক্ষ থেকে মাঝে মাঝে শৃঙ্খলাত্মক বজ্র নিক্ষেপ করে তিনি বঙ্গদেশকে শাসন করতে পারবেন। তাঁর এতে কিছু এসে যায় না যে, তিনি যা করছেন, কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র মোতাবেক তাঁর অধিকার বহির্ভূত এবং এ নিয়েও তাঁর কোনও মাথা ব্যথা নেই যে, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে করতে শেষ পর্যন্ত সমগ্র জনসাধারণকে তিনি কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করে ফেলবেন।

তাঁকে দেখে আমার শেষ পর্যন্ত মোগল সম্রাটদের কথা মনে পড়ে যায়, যাঁরা রাজকীয় জাঁকজমকে পরিবৃত ছিলেন বলে এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন যে তাঁদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছে এবং সাম্রাজ্যও তাঁদের হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। আমি ভাবি, আমাদের এই আধুনিক মোগল সম্রাটের কাণ্ডজ্ঞান কে ফিরিয়ে দেবে?

ওয়ার্কিং কমিটি নিজের সমস্ত ক্ষমতা মহাত্মা গান্ধীর হাতে সমর্পণ করেছে এবং তার অধিকাংশ সদস্য জেলখানায় প্রবেশ করেছে, কাজেই মৌলানা আবুল কালাম আজাদের হাতে কোনও ক্ষমতা নেই। কিন্তু এমনভাবে চিন্তাভাবনা করেই চলেছেন যেন তিনি সেই ফরাসি সম্রাট— "আমিই রাষ্ট্র।" আজ যদি একজন কেউ থাকেন কংগ্রেসের নামে যিনি কথা বলবার অধিকারী, তিনি মহাত্মা গান্ধী, মৌলা আবুল কালাম আজাদ নন।

এমনকী ওয়ার্কিং কমিটি যখন কাজ করছিল, তখনও সভাপতির অথবা সারা ভারত সংসদীয় উপ-সমিতি কারওরই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা ছিল না, যখনই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হত, ওয়ার্কিং কমিটি অধিবেশন করে সিদ্ধান্ত নিত।

এ বিষয়ে মৌলানার যদি কোনও সন্দেহ থাকে, আমি তাঁকে অনুরোধ করব, ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাবে সংসদীয় উপসমিতি গঠন করেছিল, তার শর্তাবলী দেখতে।

মৌলানার একটিমাত্র যুক্তি অঙ্গীকার এবং শৃঙ্খলা সংক্রান্ত। তাঁর কখনও মনে হয় না, সেই অঙ্গীকার যখন গ্রহণ করা হয়েছিল তার পরে সংঘটিত কংগ্রেসের অভ্যন্তরের বৈপ্লবিক সংকটের কারণে সেই যুক্তির আর কোনও সারবত্তা নেই। ওয়ার্কিং কমিটির ওপর জনসাধারণের আস্থা নেই। বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে, নিয়মসঙ্গত যে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি, ওয়ার্কিং কমিটি তার আস্থা হারিয়েছে, তার ফলে অঙ্গীকারটি স্বতঃই বাতিল হয়ে গেছে। ১৯৩৬-৩৭-এর ওয়ার্কিং কমিটিকে সেই সময়ে পরিস্থিতি যা ছিল, তার সঙ্গে আবার ফিরিয়ে দিন, তা হলে সেই অঙ্গীকার এখনও কার্যকর থাকবে। বর্তমান ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৩৬-৩৭-এর কমিটির উত্তরাধিকারী, এই যুক্তি অচল, কারণ বৈপ্লবিক সংকটের কালে পুরনো সব আনুগত্য এবং অঙ্গীকার ভেঙে যায়।

মৌলানা সম্ভবত মনে করেন, তিনি যা বলবেন সেটাই আইন, কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র এবং গঠনতান্ত্রিক আইন যাই বলুক। সেই কারণেই আইন এবং পদ্ধতির বিষয়ে তাঁর অজ্ঞতাবশত তাঁর এত ধৃষ্টতা এবং সাহস হয় যে তিনি বঙ্গীয় কংগ্রেসের সংসদীয় দলের বার্ষিক অধিবেশন বাতিল করার আদেশ দেন, যে অধিবেশন যথানিয়ম আহ্বান করেছিলেন। এবং সেই কারণেই যখন তিনি পঞ্জাব কংগ্রেস সংসদীয় দলকে বিশেষ একজনকে নেতা

নির্বাচিত করবার আদেশ দিলেন, একইরকম ধৃষ্টতা তিনি প্রদর্শন করলেন।

মৌলানার দুর্ভাগ্য, তাঁর আদেশ সত্ত্বেও সে-দল সর্দার সম্পূরণ সিংকে নেতা নির্বাচন করলেন। কিন্তু তখন থেকে মৌলানা তাঁর পিছনে লেগে আছেন। মহামান্য মোগল সম্রাট এখন আদেশ দিয়েছেন, সর্দার সম্পূরণ সিংকে পঞ্জাব কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করতে হবে। এখন দেখতে হবে, সে-দল তাদের নেতাকে বলিপ্রদান করে, না তাঁর পাশেই দাঁড়ায়, যেমন তারা বঙ্গদেশে করেছে।

যাই ঘটুক, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে কংগ্রেস থেকে মাস্টার তারা সিং ও সর্দার সম্পূরণ সিং, যাঁরা শিখ সম্প্রদায়ের বড় বড় নেতা, তাঁদেরকে জোর করে বহিষ্কার করে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব শিখদের কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করবেন বলে ভয় দেখাচ্ছেন। একমাত্র আশা, শিখেরা এই স্বেচ্ছাচারিতার সামনে নত হবেন না, কারণ কংগ্রেস একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান, কোনও ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর সম্পত্তি নয়।

আমাদের মোগল সম্রাট যেমনভাবে সর্বত্র সবকিছুই গোলমাল করে ফেলছেন, তাতে প্রত্যেক সুবিবেচক মানুষের দুশ্চিন্তা হতে পারে। সর্দার সম্পূরণ সিংয়ের সাম্প্রতিক ব্যাপারে, সেটা নিয়ে যা করবার করা উচিত ছিল কংগ্রেসের একনায়ক মহাত্মা গান্ধীর, কিন্তু মৌলানা তার মধ্যে মাথা না গলিয়ে থাকতে পারলেন না।

এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সিন্ধু প্রদেশের ব্যাপারটাতেও তিনি গোলমাল পাকিয়ে চলেছেন। আসামে যখন কংগ্রেসের জোট সরকার গঠিত হয়েছিল, মৌলানার তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও, তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে অচিরে তার পতন হবে। কিন্তু আমি যা বলেছিলাম তাই হল, সমস্ত আক্রমণের মুখে সেই মন্ত্রীসভা পাহাড়ের মতো অচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। মৌলানা প্রতিশোধ নিলেন যখন যুদ্ধ বাধল, তিনি কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের হাতে প্রদেশটি তুলে দিলেন।

সিন্ধু প্রদেশের ক্ষেত্রে, যখন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রাণপণে কংগ্রেস সমেত অন্য দলগুলির সঙ্গে জোট করতে চাইছিলেন, এবং আমি, কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তার পক্ষে জোরালো সমর্থন জানিয়েছিলাম, মৌলানা তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। তার ফল অবস্থার ক্রমাবনতি, শেষপর্যন্ত যার পরিণাম হল সিন্ধু প্রদেশে একটা বিশৃঙ্খলার অবস্থা।

এই তো সেদিন, সিন্ধু প্রদেশে অনেকদিন কাটানোর পর মৌলানা আমাদের প্রতিশ্রুতি দিলেন, সেখানে স্থায়ী মন্ত্রীসভা হবে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপিত হবে, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তাঁর সমস্ত ব্যবস্থার ভরাডুবি হতে চলেছে।

পরিশেষে আমি আবার মৌলানাকে অনুরোধ করব, দয়া করে একনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করবেন না, স্থানীয় ও প্রাদেশিক ব্যাপারে। বঙ্গদেশে তিনি পৌরসভা, প্রাদেশিক আইন পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনের ব্যাপারে অসংখ্যবার ধাক্কা খেয়েছেন। যথেষ্ট সময় হয়েছে তাঁর উপলব্ধি করবার, এই প্রদেশে তাঁর প্রভাব ও জনপ্রিয়তা কত সামান্য। তাঁর বর্তমান আত্মঘাতী নীতি পরিত্যাগ করে যেসব বৃহত্তর প্রশ্নে সারা দেশ এখন আন্দোলিত তার দিকে যদি তিনি মনঃসংযোগ করেন, দেশের প্রভূত উপকার করবেন।

গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পত্রাবলী

মহাত্মা গান্ধীকে

৩৮/২ এলগিন রোড
কলিকাতা
২৩. ১২. ১৯৪০

প্রিয় মহাত্মাজি,

মহাদেবভাই যখন প্রেসিডেন্সি জেলে আমার সঙ্গে দেখা করেন, আমি তার সুযোগ গ্রহণ করে আপনার কাছে একটি বার্তা পাঠিয়েছিলাম। আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম আপনাকে জানাতে যে, আপনি যদি কোনও আন্দোলন আরম্ভ করেন, আমাদের সহায়তা, তার যাই মূল্য হোক, সম্পূর্ণ আপনাকে দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকব, আমি আরও চেয়েছিলাম, আপনাকে যেন তিনি অনুরোধ করেন, আপনি বঙ্গদেশের বিতর্কের মীমাংসা করতে উদ্যোগী হন, যাতে এই প্রদেশ সে-আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে পারে। যেহেতু আপনাকে একনায়ক নিযুক্ত করা হয়েছে, আপনি সহজেই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্যাপারটি হাতে নিতে পারেন। আমার তাই মনে হয়েছিল।

সে-সময়ে সরল বিশ্বাসে আমি আশা করেছিলাম, আপনি একটি গণ-আন্দোলন আরম্ভ করবেন, ১৯২১, ১৯৩০ এবং ১৯৩২-এ যেমন করেছিলেন, যদিও মহাদেবভাই আমাকে বলেছিলেন, আপনি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের কথা চিন্তা করছেন। আজ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, আপনার আরম্ভ করা আন্দোলন আমাদের জাতীয় দাবি, স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে নয়। আর সে আন্দোলন গণ-সংগ্রামও নয়। সরকার যদি যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতায় অনুমতি দিত, আমার মনে হয় তা হলেই সে-আন্দোলনের সমাপ্তি হত। তা হলেও, সে আন্দোলনের সীমাবদ্ধ রূপ ও পরিধি সত্ত্বেও, আমাদের সাধ্যমতো এবং আমাদের রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলে, আমরা সহযোগিতা করতে চাই। আমরা জানতে চাই, আমাদের সহযোগিতা, যতটুকুই তার মূল্য থাক আপনি গ্রহণ করবেন কিনা, এবং যদি গ্রহণ করেন সেই সহযোগিতা প্রদানে আমাদের কী করা উচিত বলে আপনি মনে করেন। আমাদের যে সহযোগিতা তা হবে নিঃশর্ত, এই অর্থে যে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আমাদের যাবতীয় অভিযোগ অনুযোগ, তার কিছুই আমাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। যদি এবং যখন শীর্ষ নেতৃত্ব আমাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে, আমাদেরও একইরকম ব্যবহার করতে হবে। এখন আমরা যেমন মৌলানার স্বেচ্ছাচারী কর্তৃত্বব্যঞ্জক কাজকর্মের সঙ্গে লড়াই করছি, তখনও আমাদের সেইরকম সংগ্রাম করতে হবে। কিন্তু তার জন্য আমরা জাতির সামনে যেসব বড় বড় প্রশ্ন, তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারব না এবং সেসব ক্ষেত্রে আপনি আমাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন, আমাদের নীতির সঙ্গে যতদূর তা সঙ্গতিপূর্ণ। আমি

আপনাকে অনুরোধ করছি, আমাদের সহযোগিতা গ্রহণ করুন।

বঙ্গদেশের পরিস্থিতির বিষয়ে আমি মহাদেবভাইকে জানিয়েছি। আপনি যদি ঐক্য চান, চাইলেই পেতে পারেন। শুধু প্রয়োজন, আপনি এবং আমার দাদা শরৎচন্দ্র বসুর মধ্যে কথাবার্তা। তারপর থেকে পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে, আপনি নীরব থাকা এবং উদাসীন থাকাই পছন্দ করেছেন। মৌলানা পাগলের মতো, তিনি যাকে বলেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পথ ধরেই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলেছেন। তা নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা নেই, কারণ তিনি যদি চান আমরা তাঁর সঙ্গে তাঁর অবস্থানের ভিত্তিতেই কথা বলতে প্রস্তুত আছি। রাজনৈতিক বিষয়ে আমাদের যা মতামত তার কিছুই তিনি পরিবর্তন করতে পারবেন না, শুধু তিনি এই প্রদেশে লোকচক্ষে নিজেকে হাস্যকর করে তুলছেন। তাতে তিনি কংগ্রেস নামটিকেও ধুলোয় নামিয়ে আনছেন। আমি সবিনয়ে বলতে চাই, আমাদের শক্তি তাঁর চেয়ে কম না। যেহেতু মৌলানার কাজকর্মে আপনার নীরব সমর্থন আছে বলে মনে হয়, এ বিষয়ে আপনার মধ্যস্থতা আমি চাইছি না। আমি শুধু চাই এই যে পার্শ্ব-নাটক জোর করে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও বড় বড় বিষয়ে আমরা সহযোগিতা করব এবং আমরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। আন্তরিকভাবে আমি আপনাকে সহযোগিতা দিতে চাইছি। আমার এক আত্মীয় নাগপুরে যাচ্ছেন। তাঁর হাতে এই চিঠি পাঠাচ্ছি। তাঁকে বলেছি, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে।

আপনার স্বাস্থ্য কেমন আছে? সংবাদপত্রে উদ্বেগজনক খবর বেরোচ্ছে। আমি ভাল হচ্ছি ধীরে ধীরে। সশ্রদ্ধ প্রণাম নিন।

মহাত্মা গান্ধী
ওয়ার্ধা

আপনার স্নেহের
সুভাষ চন্দ্র বসু

মহাত্মা গান্ধীর পত্র

সেবাগ্রাম
ওয়ার্ধা
২৯. ১২. ১৯৪০

প্রিয় সুভাষ,

সুস্থই থাকো আর অসুস্থই থাকো, তোমাকে দমিয়ে রাখা অসাধ্য। বোমা ফাটাবার আগে তোমায় সেরে উঠতে হবে।

মৌলানা সাহেবের সঙ্গে আমার পরামর্শ হয়নি। তবে, সিদ্ধান্তের বিষয়ে আমি যখন খবরের কাগজে পড়লাম, আমার সেটা অনুমোদন করতেই হল। তুমি যে শৃঙ্খলা আর শৃঙ্খলাহীনতার মধ্যে পার্থক্য করতে পারলে না, তাতে আমি অবাক হলাম।

তবে, আমি এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে একমত যে, জনপ্রিয়তায় তোমাদের দু'জনের কারও সমকক্ষই মৌলানা নন। কিন্তু বিবেককে জনপ্রিয়তার ওপরে স্থান দিতে হয়। আমি জানি

বঙ্গদেশে তোমাদের দু'জনকে বাদ দিয়ে কাজের কাজ কিছু করা কঠিন। আমি এও জানি, এমনকী কংগ্রেসকে বাদ দিয়েও তোমরা কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। তবু সেই গুরুতর অসুবিধা সত্ত্বেও কংগ্রেসকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

সুরেশ আমায় লিখেছে, শরৎ আসছে। আমি অপেক্ষা করে আছি, যখন ইচ্ছা সে আসতে পারে। তুমিও পারো। তোমরা জানো, এখানে তোমাদের দেখাশোনা ভালভাবেই করা হবে।

আইন অমান্য আন্দোলনে ফরওয়ার্ড ব্লকের যোগ দেওয়ার বিষয়ে বলি, আমার মনে হয়, আমাদের মধ্যে এরকম মৌলিক মতভেদ থাকলে সেটা সম্ভব নয়। যতদিন না আমাদের মধ্যে কোনও পক্ষ অপর পক্ষের মত মেনে নিচ্ছে, আলাদা আলাদা নৌকাতেই আমাদের পাড়ি জমাতে হবে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে এবং শুধুমাত্র আপাত দৃষ্টিতেই মনে হতে পারে, নৌকাদুটির গন্তব্যস্থল অভিন্ন।

ততদিন আমরা যেন পরস্পরকে ভালবাসি এবং একই পরিবারের মধ্যে থাকি।

তোমার বাপু

মহাত্মা গান্ধীকে

৩৮/২ এলগিন রোড
কলিকাতা
১০. ১. ১৯৪১

প্রিয় মহাত্মাজি,

আপনার ২৯ ডিসেম্বরের পত্র পেয়ে আমি খুশি হয়েছি, যদিও সে তার বিষয়বস্তুর জন্য ততটা নয় যতটা নিজের মতামত আপনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন বলে। আমাদের দিক থেকে হার্দিক এবং আন্তরিক সহযোগিতা শুধু আমি নিজেই দিতে চাই তা নয়, আমার সঙ্গে আর যাঁরা আছেন সেটা তাঁদের অনেকেরই ইচ্ছা। সেই সহযোগিতা দিতে চাইলে তার জন্য নিজের রাজনৈতিক নীতি ও বিশ্বাস বিসর্জন দেওয়া প্রয়োজনও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। আপনি জানেন, পূর্বেকার আন্দোলনগুলিতে, এমন অনেকেই কট্টর গান্ধীবাদীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করেছেন, যাঁরা বহু প্রশ্নে সহমত ছিলেন না। এর পুনরাবৃত্তি কেন সম্ভব নয়? প্রার্থনা করি, আপনি আপনার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করুন।

আপনার পত্রে একটি বাক্য আছে যার তাৎপর্য আমি সঠিক অনুধাবন করতে পেরেছি কিনা সন্দেহ। আপনি বলেছেন, "যতদিন না আমাদের মধ্যে কোনও পক্ষ অপর পক্ষের মত মেনে নিচ্ছে, আলাদা আলাদা নৌকাতেই আমাদের পাড়ি জমাতে হবে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে এবং শুধুমাত্র আপাতদৃষ্টিতেই মনে হতে পারে, নৌকা দুটির গন্তব্যস্থল অভিন্ন।" তার অর্থ কি, আপনার মতে আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য ভিন্ন? তা কি করে হতে পারে? দয়া করে জানান আপনি ঠিক কী বলতে চেয়েছেন।

এমন অনেকে আছেন যাঁরা আমাদের পত্রালাপের বিষয় নিয়ে আমাদের মতামত জানতে

উদগ্রীব এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে আমাদের মধ্যে ঐকমত্য প্রত্যাশা করেন। এখানে আমাকে কি আপনি এই পত্রালাপ তাঁদের দেখাবার এবং দরকার হলে প্রকাশ করবার অনুমতি দিচ্ছেন?* এ পর্যন্ত আমি দু'জন মাত্র বন্ধুকে পত্রালাপটি দেখিয়েছি।

আমি আশাকরি আপনি ভাল আছেন। আমি মোটের ওপর ভাল আছি, তবে রোগের কতকগুলি লক্ষণ সহজে যাবার নয়।

সশ্রদ্ধ প্রণাম নেবেন।

আপনার স্নেহের
সুভাষ

বসু-নেহরু পত্রালাপ

জওহরলাল নেহরুর পত্র

আনন্দভবন
এলাহাবাদ
জুলাই ১১, ১৯৩৯

শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু
বোম্বাই

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ৮ জুলাইয়ের পত্র এইমাত্র পেলাম। আমার মনে হয় অন্য অনেক বিষয়ের মতো এ বিষয়েও আমাদের মতে মিল নেই। এ নিয়ে তর্ক করে কোনও লাভ হবে না। আমার নিজের মত ছিল এই যে, এ বিষয়ে কামাথ যা বলেছে তা ঠিক নয়। তুমি আমার ওপর একটি উদ্দেশ্য আরোপ করেছ যাতে আমার প্রতি এবং তোমার নিজের প্রতিও, সুবিচার করা হয়নি। যতক্ষণ না কামাথ তাঁর মতামত আক্রমণাত্মকভাবে ব্যক্ত করছেন, যাতে তাঁর দ্বারা পরিকল্পনা কমিশনের তিনি যে কাজ করছিলেন তার ওপর প্রভাব পড়ে, ততক্ষণ, কংগ্রেস কিংবা অন্য রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি কী মত ব্যক্ত করছেন, আমার কাছে তার কিছুমাত্র গুরুত্ব নেই। পরিকল্পনার বিষয়ে তাঁর একটি বিবৃতি নিয়ে আমার মনে হয় জানুয়ারির প্রথমদিকে আমি আপত্তি জানিয়েছিলাম। সেই বিবৃতি বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। আপত্তি ছিল তাঁর ওই বিবৃতি প্রদানে। আমার মনে হয়েছিল, পরিকল্পনা কমিটিতে যে দিকটা প্রতিফলিত হয় তার চেয়ে রাজনৈতিক জীবনে যে প্রচার পাওয়া যায় সেটাই তাঁকে অনেক বেশি আকৃষ্ট

---

* মূলে আছে, "Here I have your permission to show then the correspondence and if necessary to publish it?" সম্ভবত এটি মুদ্রণ প্রমাদ: অনুবাদক)

করেছিল। যদি সেইটাই তাঁর ইচ্ছে হয়ে থাকে এবং সে ইচ্ছা পোষণ করবার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁর ছিল, তা হলে পরিকল্পনা কমিটিতে তার কোনও সুযোগ নেই।

তুমি এ. কে. সাহার কথা লিখেছ, বলেছ, তাঁকে যুগ্ম-সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করা যেত। পরিকল্পনা কমিটির সদস্য হিসাবে সাহাকে সাম্মানিক সাধারণ সম্পাদক পদে নিযুক্ত করা যেত, কিন্তু বেতনভোগী যুগ্ম-সম্পাদক তাঁকে করা যেত না, যদি না তিনি পরিকল্পনা কমিটির সদস্য পদে ইস্তফা দিতেন। সেই সদস্যপদ থেকে তিনি ইস্তফা দেন, আমরা তা চাইনি, কারণ যে উপসমিতির তিনি সদস্য সেখানে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে আমরা লাভবান হতে চেয়েছিলাম। যুগ্ম-সম্পাদক হলে তিনি উপসমিতির সদস্য হতে পারতেন না, তাঁকে সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করা সম্ভব বলে আমার মনে হয়নি, কারণ তার জন্য বিশেষজ্ঞের জ্ঞানের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন হয় ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং ভারতের অধিবাসীদের সঙ্গে ব্যাপক পরিচয়ের। কোনও প্রাদেশিক সরকারে তাঁর উপযুক্ত কোনও পদের জন্য আমি অতিশয় চেষ্টা করছি।

আমাকে তুমি বুঝতে পারছ না দেখে আমি দুঃখিত। হয়তো সেটা এমন কোনও ব্যাপার নয় যার জন্য চেষ্টা করা দরকার।

তোমার স্নেহের
জওহরলাল নেহরু

বসু-রবীন্দ্রনাথ পত্রালাপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি

বর্ধমান স্টেশন
১১. ১২. ৩৯

পরম শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

অনেকদিন ধরে আমি আপনার কাছে যাবার কথা ভাবছি। অনেক বিষয় আছে যা নিয়ে কথা বলা দরকার। আপনার পরামর্শ আমার প্রয়োজন। আমি যদি জানতাম আমার জন্য আপনি কলকাতায় অপেক্ষা করবেন, আমি অবশ্যই পূর্ববঙ্গ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতাম। কলকাতায় ফিরে শুনলাম, আমার জন্য কলকাতায় অপেক্ষা করে আপনি শান্তিনিকেতনে ফিরে গেছেন। এখন আমি যুক্তপ্রদেশে ফিরে যাচ্ছি। আমার শরীর বিশেষ ভাল লাগছে না। আশাকরি দু-তিন দিনে আমার শরীর ভাল বোধ হবে। আসবার আগে আমি টেলিগ্রামে আপনার অনুমতি নেব। আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন।

বিনয়াবনত
সুভাষ চন্দ্র বসু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সচিবের প্রতি টেলিগ্রাম

টেলিগ্রাম
কলিকাতা ১২ ডিসেম্বর ১৯৩৯
সচিব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন
কবি কি পনেরোই কলকাতায় আসছেন

সুভাষ বোস

শরৎচন্দ্র বসুর প্রতি কারাগার থেকে লিখিত পত্রাবলী

শরৎচন্দ্র বসুকে

সংশোধিত ও অনুমোদিত
(অপাঠ্য) ২৮. ১০
D. C. S. B
(ডেপুটি কমিশনার, স্পেশাল ব্রাঞ্চ-এর স্বাক্ষর)
পাস করা
(অপাঠ্য) ৩০. ১০. ৪০
লেফটেন্যান্ট কর্নেল, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস-এর স্বাক্ষর

প্রেসিডেন্সি জেল
কলকাতা
২৪. ১০. ৪০

প্রিয় মেজদাদা,

কয়েকদিন আগে আমার বিজয়ার প্রণাম তোমার দেরাদুনের ঠিকানায় পাঠিয়েছি। এর মধ্যে সেই চিঠি তুমি নিশ্চয় পেয়েছ।

এতদিন ধরে আমি তোমাকে লেখা মৌলানা আবুর কালাম আজাদের চিঠির কথা ভেবে চলেছি এবং সেইসঙ্গে স্বর্গীয় শ্রী ভি. জে. প্যাটেলের ইচ্ছাপত্রের প্রসঙ্গে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং সর্দার বল্লভভাইয়ের পারস্পরিক প্রশংসার কথাও ভাবছি।

প্রথমটির বিষয়ে তোমার প্রতিক্রিয়া কী হয়েছে আমি জানি না, আমার নিজের প্রতিক্রিয়া (তার মূল্য যাই হোক) তোমরা জানাচ্ছি। পরবর্তী অধিবেশন যেহেতু কাছে এসে পড়েছে, আমার মনে হয় বঙ্গীয় আইন পরিষদ থেকে তোমার পদত্যাগ করা উচিত নয়। তবে তোমার

সুবিধামতো তুমি পদত্যাগ করে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে পারো, তোমার বিরুদ্ধে তাদের সবচেয়ে ভাল লোকটিকে দাঁড় করাতে এবং সেভাবে একটি পরীক্ষামূলক নির্বাচন হতে পারে। আগামী অধিবেশনের শেষ দিনটি সুবিধাজনক হতে পারে, যাতে তখন তার পরের অধিবেশনের জন্য যথেষ্ট সময় থাকে। তোমার পদত্যাগের ঘোষণা অল্পদিনের মধ্যেই তোমার সুবিধাজনক একটা সময়ে হয়তো করা যেতে পারে।

তবে সেটা অপেক্ষাকৃত একটা ছোট ব্যাপার। সত্যি করে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল আমরা কোন দিকে যাচ্ছি, সেই প্রশ্ন। আমি কংগ্রেসের কথা বলছি। একজন-একজন করে লোকে, কখনও-সখনও গুরুত্বপূর্ণ লোক, যাঁরা কাজ করেছেন, কষ্ট করেছেন, ত্যাগ করেছেন, তাঁরা বিতৃষ্ণাবশত কংগ্রেস ত্যাগ করছেন। সেই ক্ষতিপূরণ করবার জন্য অন্য কোনও সংগঠনের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করবার জন্য কিছু করা হচ্ছে না, নিকট ভবিষ্যতে তার কোনও সম্ভাবনাও আছে বলে মনে হচ্ছে না। নতুন কাউকে কংগ্রেসে যোগ দিতেও আমি দেখছি না।

মহাত্মা গান্ধী বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, এই টুকরো-টুকরো হয়ে যাওয়ার পরিণতি দলের পক্ষে শোচনীয় হবে, এবং নিজেকে এবং নিজের অনুগামীদের জমি শক্ত করবার জন্য নিঃশর্ত সহযোগিতার যে কথা তিনি আগে বলতেন, তা পরিত্যাগ করে তার বদলে নির্বাচিত ব্যক্তিদের আইন অমান্য আরম্ভ করছেন। কিন্তু এটা কি লোককে ঠকানো নয়? এ সহযোগিতাও নয় গণ-আন্দোলনও নয়। এতে কেউই খুশি হয়নি এবং এ পথে আমরা কোথাও পৌঁছতে পারব না। এবং এই আন্দোলনের সঙ্গে স্বরাজের কোনও সম্পর্ক নেই। এতে শুধু আমাদের দেশবাসীর একটা অংশ যাঁদের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ, তাঁদের বোঝানো হবে যে গান্ধীজি কাজের কাজ কিছু একটা করছেন।

সহযোগিতা বোঝা যায়, রায়বাদ বোঝা যায়, তার মধ্যেকার অসঙ্গতি সত্ত্বেও। গণ-আন্দোলনও আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু এটা কী? এ তো এটাও নয়, ওটাও নয়। না মাছ, না মাংস, না সুদৃশ্য লাল হেরিং।

গান্ধীবাদের যে সর্বশেষ পর্যায়টি, তার বকধার্মিকসুলভ ভণ্ডামি (পটেল-উইল কাণ্ড) গণতন্ত্র নিয়ে তার অনাচার এবং রাজনৈতিক বিবিধ দুঃখ দুর্দশার জন্য তার যেসব উদ্ভট দুর্বোধ্য সমাধান সূত্র (হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রজাদের প্রতি পরামর্শ) শুনলে গা ঘিন ঘিন করে। আমরা না ভেবে পারি না, ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের পক্ষে কোনটা বেশি বিপজ্জনক, ব্রিটিশ প্রশাসনযন্ত্র, না গান্ধীবাদী ক্ষমতাতন্ত্র। যে আদর্শবাদ, যা বাস্তববোধ-বিরহিত, যার মধ্যে সারবস্তুবিহীন ধার্মিক ভাবালুতা ভণ্ডামি, তার দ্বারা কোনও ফল পাওয়া যায় না।

প্রবঞ্চনা, প্রতারণার এই খেলা, এতে কেউই ঠকবে না, কারণ বিশ্বসুদ্ধ মানুষ অত বেশি বোকা নয়, যতটা আমাদের বাদামি বর্ণের বড় সায়েবরা হয়তো মনে করেন। আমাদের শান্ত দৃঢ় পদক্ষেপে নিজেদের কাজ করে যেতে হবে। এই মার্কামারা গান্ধীবাদের দিন ফুরিয়ে যেতে আর বেশি দেরি নেই কারণ অচিরেই লোকে তার স্বরূপ বুঝতে পারবে। মৌলানার অনশনকে যে তোমরা তার উপযুক্ত তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছ তাতে আমি খুশি হয়েছি।

আশাকরি ওখানে তোমাদের সকলের স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে, বিশেষ করে মেজ বউদির। কবে তুমি ফিরে আসছ? তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, কেন না প্রথমে তোমাদের সেরে

উঠতে হবে। দেখলাম খবরের কাগজের লোকেরা ওখানে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের লোকরাও কি করেছে? ওখানে আমাদের যথেষ্ট জনসমর্থন আছে।

কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচনের জন্যে দাঁড়াতে আমাকে সবাই চাপ দিচ্ছেন। আমি রাজি হয়েছি।

তোমার পরম স্নেহের
সুভাষ

পুঃ কিছুদিন আগে আমি ওয়ার্ধাতে মৌলানাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি, বিজয়ার উপহারের জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বোস
রয়াল হোটেল
দেরাদুন, ইউ পি

শরৎচন্দ্র বসুকে

সংশোধিত ও অনুমোদিত
অস্পষ্ট ৪/১১
ডি. সি. এস. বি.-র পক্ষে

প্রেসিডেন্সি জেল
কলিকাতা
৩১. ১০. ৪০

অনুমোদিত
অপাঠ্য
লেফটেন্যান্ট কর্নেল, আই. এম. এস.
সুপারিনটেনডেন্ট

প্রিয় মেজদা,

এই চিঠির আগে আমার প্রেরিত বিজয়ার পত্র এবং অন্য আর একটি তুমি নিশ্চয়ই পেয়েছ। দেরাদুনে গিয়ে তোমার ও মেজবউদিদির উপকার হল কিনা জানতে ইচ্ছে করে। আশাকরি হয়েছে।

কেন্দ্রীয় আইনসভায় আমার নির্বাচন বিষয়ে তুমি নিশ্চয়ই খবরের কাগজে পড়েছ। আশা

করি এর থেকে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব যা বোঝার বুঝতে পারবে।

কংগ্রেসের রাজনীতি যত বোধগম্য হচ্ছে, তত উপলব্ধি করছি, আগামী দিনে শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের লড়াই কত জোরদার করতে হবে। স্বরাজলাভের পর, এ ধরনের সংকীর্ণ, প্রতিশোধপরায়ণ, কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকজনের হাতে যদি ক্ষমতা যায়, দেশের অবস্থা কী দাঁড়াবে? এখন থেকে লড়াই না করলে তাদের হাতে ক্ষমতা যাওয়া আটকানো যাবে না। জাতির পুনর্গঠনের কোনও ধারণাই তাদের নেই— এই কারণেও এখন থেকেই লড়াই জারি করা প্রয়োজন। স্বাধীন ভারত যদি গান্ধীর শান্তিপূর্ণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে গান্ধীবাদ ভারতকে গভীর গর্তে নিক্ষেপ করবে। ভারত তখন আরও সব পীড়নলোভী ক্ষমতাশীল দেশের প্রতি আবাহন জানাতে থাকবে। যখন যেখানে অন্য যে কোনও রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব হবে, তা গ্রহণ করে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।

তলপেটে অন্ত্র এবং উপান্ত্রের চারপাশে গত এক সপ্তাহ যাবৎ ব্যথা হচ্ছে। এখন একটু কম। এ চিঠি আমি উডবার্ন পার্কের ঠিকানায় পাঠাচ্ছি কারণ তুমি কবে ফিরবে, আমি জানি না। প্রণাম নিও,

তোমার স্নেহের
সুভাষ

শ্রীযুক্ত শরৎ সি. বোস
কলকাতা

শরৎচন্দ্র বসুকে

সংশোধিত ও অনুমোদিত
অস্পষ্ট ৪. ১১
ডি. সি. এস. বি.-র পক্ষে

প্রেসিডেন্সি জেল
কলিকাতা
১৫. ১১. ৪০

প্রিয় মেজদা,

আমি অমিয়কে আমার কেস-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং তার সঙ্গে (সরকারের) বে-আইনি কাজ এবং অবিচারের যে প্রশ্ন জড়িত, তার উল্লেখ করে বিমান ডাকে একটা চিঠি দিয়েছি। আমি চাই তুমিও ওই একই বিষয়ে একটা বিস্তারিত চিঠি বিমান ডাকে তার কাছে পাঠাও। আমি চাই পার্লামেন্টে এবং তার বাইরে আমার বন্ধুদের কাছে সেসব তথ্য অমিয় যেন পাঠিয়ে দেয়। সে কাজ সহজেই ইন্ডিয়ান কনসিলিয়েশন গ্রুপ, ইন্ডিয়া লীগ ইত্যাদিতে বন্ধু যাঁরা আছেন যেমন মিস আগাথা হ্যারিসন, কৃষ্ণ মেনন, তাঁদের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

প্রচুর সংখ্যক ব্যক্তি, শুধুমাত্র খবর যদি পান, অতিশয় আগ্রহী হবেন। যেমন ধরুন, মি. থার্টল, এম. পি., ল্যানসবেরির জামাই, কলকাতায় যিনি তোমার অতিথি হয়েছিলেন, কিংবা মি. গ্রিনউড, এম. পি., যিনি এখন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, এবং লন্ডনে যে জনসংবর্ধনা আমাকে দেওয়া হয়েছিল ১৯৩৮ সালে, তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন, কিংবা 'নিউজ ক্রনিকল'-এর মি. ভারনন বার্টলেট, এম. পি., যাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল, ক্রনিকল ভবনে স্যার ওয়ালটার লেটনের মধ্যাহ্নভোজের সময়ে, এবং যিনি পরে কলকাতায় আমার সঙ্গে চা খেয়েছিলেন কিংবা মি. সোরেনসেন, এম. পি., ভারতীয় নানা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপনে যাঁর কোনও ক্লান্তি নেই, যাঁর সঙ্গে লন্ডনে আমার পরিচয় হয়েছিল।

আমি জানি না বিমান ডাকে চিঠি লন্ডনে পৌঁছতে আজকাল কতদিন লাগে। যদি দেখো দেরি হওয়া কম-বেশি নিশ্চিত, তার বদলে একটা দীর্ঘ কেব্‌ল্ পাঠিয়ে দিও।

আমি অমিয়কে লিখে পাঠাচ্ছি যে তাকে শুধু এইটুকু করতে হবে যে, আমার চিঠিটা আমার ২-৩ জন বন্ধুর কাছে পাঠাতে হবে, বাকি যা করবার তারাই করবে। তারপর আর অমিয়কে এই ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

তোমার অতি স্নেহের
সুভাষ

শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বোস
১ উডবার্ন পার্ট
কলিকাতা

শরৎচন্দ্র বসুকে

সংশোধিত এবং অনুমোদিত
অস্পষ্ট ২০. ১১
ডি. সি. এস. বি.-র পক্ষে

জরুরি

প্রেসিডেন্সি জেল
কলিকাতা
১৭. ১১. ৪০

প্রিয় মেজদা,

আমার দু'জন সিনিয়র অ্যাডভোকেটই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, বরদাবাবু এবং সন্তোষবাবু। আমি অবশ্যই আশা করছি ওঁরা শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন। আমার মামলা আলিপুরে এজলাসে উঠবে এ মাসের ২৩ তারিখ। বরদাবাবু সেখানে দাঁড়ান। ২৩ তারিখের মধ্যে বরদাবাবু যদি সেরে না ওঠেন, সেদিনের জন্যে অন্য কোনও ব্যবস্থা কোরো।

আশাকরি এর মধ্যে তুমি আমার ২৪. ১০ আর ৩১. ১০-এর চিঠি পেয়েছ। এখন ওয়ার্ধার প্রহসনের দ্বিতীয় দৃশ্য আরম্ভ হয়েছে।

গত ২-৩ দিন আমার কোমরে একটা ব্যথা হচ্ছে, সায়াটিকা ধরনের। এখনও আমি

স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারছি। এখনও দুশ্চিন্তার কোনও কারণ হয়নি। আশাকরি তোমরা ভাল আছ। মা কেমন আছেন?

তোমার পরম স্নেহের
সুভাষ

শ্রীযুত শরৎ চন্দ্র বোস
১ উডবার্ন পার্ক
কলিকাতা

নেতাজির প্রতি জয়প্রকাশ নারায়ণের গোপন পত্র, ১৯৪০

অনুমোদিত
অস্পষ্ট
লেফটেন্যান্ট কর্নেল, আই. এম. এস.
সুপারইনটেনডেন্ট
প্রেসিডেন্সি জেল

নেতাজি যখন ভারত থেকে নিষ্ক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, সেই সময়ে তিনি কারারুদ্ধ জয়প্রকাশ নারায়ণের কাছ থেকে একজন বিশেষ পত্রবাহক মারফৎ এই চিঠিটি পেয়েছিলেন। তারিখবিহীন পত্রটি জয়প্রকাশের নিজের হাতে কালিতে লেখা। স্পষ্টতই নিরাপত্তার কারণে লেখক চিঠিটি স্বাক্ষর করেননি। কলকাতায় নেতাজি ভবনে যখন তিনি এসেছিলেন তখন জয়প্রকাশ মূল পত্রটি তাঁরই লেখা বলে সনাক্ত করেছিলেন। পত্রটি নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর সংরক্ষণাগারে রক্ষিত আছে।

সম্পাদকদ্বয়

প্রিয় কমরেড,

এই চিঠিটি আমি যথেষ্ট দুশ্চিন্তার মধ্যে লিখছি। দুশ্চিন্তার কারণ, আমি জানি না চিঠিটি আপনি কীভাবে নেবেন। আমি যদি বলি, আপনার বিরুদ্ধে কোনও সময়ে আমার কোনও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের মনোভাব ছিল না, আপনি আমার সে কথা বিশ্বাস করবেন কিনা আমি বুঝতে পারিনি, রাজনৈতিক মতভেদ ছিল এবং আমি তা গোপন করবার চেষ্টা করিনি। অপরদিকে আপনার সাহস ও দৃঢ় মনোভাবের আমি চিরদিন প্রশংসা করেছি এবং এখন, যখন ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, আমি আপনার পূর্বজ্ঞান ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টির প্রশংসা করি।

এখানে আমি সবকিছু মনের মধ্যে উল্টে-পাল্টে দেখছি। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ফলে আমার সমস্ত চিন্তাভাবনা নিয়ে নতুনভাবে বিবেচনা করতে হচ্ছে। আমি স্বীকার করছি

আপোস বিরোধী সম্মেলন এবং আপনি ও স্বামীজি যে অভিমত গ্রহণ করছেন তা যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। সে কথা আমি প্রথম সুযোগেই প্রকাশ্যভাবে বলব।

আমি এই পত্র লিখছি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দেবার জন্য। আমার অনুরোধ, প্রস্তাবটি আপনি সযত্নে বিবেচনা করবেন। প্রস্তাবটি আমাদের সমগ্র ভবিষ্যৎ কর্মধারা এবং ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের গড়ে ওঠা সংক্রান্ত। প্রস্তাবটি আমি এখানে স্বামীজির সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং তিনি তা পছন্দই করেছেন। আরও বিস্তারিতভাবে প্রস্তাবটি আমাদের আলোচনা করতে হবে এবং সেই আলোচনার ফলাফল আমি যথাসময়ে জানাব।

বাইরে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির বন্ধুদের আমি আগেই প্রস্তাবটি পাঠিয়েছি। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন এবং অনুশীলনের কয়েকজন বন্ধুও এ-বিষয়ে সম্ভবত আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

প্রস্তাবটির কথা বলবার আগে, আমি সংক্ষেপে জানাতে চাই, বর্তমান পরিস্থিতি এবং অব্যবহিত ভবিষ্যৎ আমি কীভাবে দেখছি।

আমার মতে আজ আমাদের মূল কাজ এমন একটি কার্যধারা নির্ণয় করা যা মৌলিকভাবে কংগ্রেস-নির্ভর হবে না। কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করলে আমাদের এই কাজের গুরুত্ব কিংবা তাৎক্ষণিক প্রয়োজন কিছুমাত্র হ্রাস পাবে না। এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ অবশিষ্ট নেই, যে আইন অমান্য আন্দোলন, যদি আরম্ভ হয়, তার উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে কিছু বেশি সুযোগ-সুবিধা জোর করে আদায় করার বেশি কিছু হবে না। দিল্লি প্রস্তাব, জওহরলালের কথামতো মৃত এবং সমাধিস্থ আদৌ নয়। ব্রিটিশ সরকার আপোসের মনোভাব দেখানো মাত্র আবার তা পুনরুজ্জীবিত হবে। অতএব যাই হোক না কেন, আমরা চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছি, তা হল একটা মূল্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কংগ্রেসের আপোস। সে মূল্য বেশি হবে না কম দু' পক্ষের পরিস্থিতির প্রয়োজনের ওপর তা নির্ভর করবে।

এত দিন আমরা ধরেই নিয়েছি, বর্তমানে আমাদের রাজনৈতিক কর্মে কংগ্রেসই প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তারাই, শ্রমিকশ্রেণি থেকে শুরু করে বুর্জোয়াশ্রেণি পর্যন্ত সকলের প্রতিনিধি। এখন থেকে আমাদের কাজ করতে হবে সম্পূর্ণভাবে তার বিপরীত ধারণা অনুযায়ী যে, কংগ্রেস আর রাজনৈতিক কর্মধারার ভিত্তি নয়। আমি এ কথা বলছি না যে জনসাধারণের চিত্তে কংগ্রেসের প্রভাব আর নেই, (যদিও বিগত কয়েক বৎসর যা কখনও হয়নি, এখন সেইটাই হয়েছে। জনসাধারণের যে প্রভাব কংগ্রেসের ওপর ছিল, এখন আর সেটা নেই), কিংবা সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় কংগ্রেসের যে ভূমিকা সেটা তারা নিঃশেষ করে দিয়েছে। বরং, বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই বিরোধিতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সেই বিরোধিতার উদ্দেশ্য হবে, দিল্লি প্রস্তাবে যা দাবি করা হয়েছে, তারই কাছাকাছি কিন্তু এবং আমরা যে কংগ্রেসকে প্রভাবিত করতে পারব, বর্তমান পরিস্থিতিতে তার কোনও সম্ভাবনা নেই।

এখানে প্রয়োজন কংগ্রেসে যে পরিবর্তন এসেছে সেটা লক্ষ করা। অবশ্যই কংগ্রেস এখনও একটি গণ সংগঠন, যার ভিত্তি বিস্তৃত। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃবর্গ এখন যতখানি একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত যে গোষ্ঠী গণ-বিরোধী, (শ্রমিক-বিরোধী, এমনকী কোথাও কোথাও গণতন্ত্র-বিরোধী) এবং মতাদর্শে ও সহানুভূতিতে সম্পূর্ণ বুর্জোয়া মনোভাব সম্পন্ন, যা আগে কোনওদিন ছিল না। কৃষক, শ্রমিক ও বামপন্থী জাতীয়তাবাদের

প্রভাবকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের কাছে বিপ্লবী গণ আন্দোলন প্রত্যাশা করা বিরাট বোকামির কাজ হবে। আর, কংগ্রেসের আন্দোলন, যদি আরম্ভ হয়, যখন আরম্ভ হবে, তাকে হয়তো বৈপ্লবিক অভিমুখ দেওয়া যেতে পারে, এরকম একটা অস্পষ্ট আশা আমরা করতে পারি না। সে-সম্ভাবনা আমাদের সম্পূর্ণ নাকচ করতে হবে।

তা ছাড়া আরও একটা কারণ আছে, যে জন্য কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে আমাদের এখন রাজনৈতিক গণ আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তুত করার চেষ্টা করা উচিত। কংগ্রেসের করণীয় কাজ ছিল জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করা। সে কাজ সম্পন্ন করা, স্বাভাবিক অবস্থায়, সম্ভব হত একমাত্র বৈপ্লবিক পন্থায়, এবং আশা করা গিয়েছিল কংগ্রেস বৈপ্লবিক পন্থা গ্রহণ করবে (তার বিচ্যুতি সহ) কিছুদূর পর্যন্ত। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এরকম সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে যে, কংগ্রেস (তার বর্তমান সংগঠনে) সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করেই সম্পন্ন হবে। সন্দেহ নেই, আপসের জন্য চাপ দেওয়া দরকার, এবং সন্দেহ নেই কংগ্রেস চাপ দিতেই থাকবে (এমনকী কোনও এক ধরনের প্রত্যক্ষ সংগ্রামও করতে পারে)। কিন্তু সি. রাজাগোপালাচারি লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর ঘাম ও রক্ত ঝরিয়ে যে ক্ষমতা অর্জন করবার আশা করেন, সেটা পূর্ণ স্বাধীনতা হতে পারে না। সেই ক্ষমতা ঠিক ততটাই হবে, সি. গোপালাচারি এবং কংগ্রেস যতটা সাহস করে চাইতে পারবেন, যাতে ব্রিটেনের সাময়িক এবং অর্থনৈতিক অভিভাবকত্ব বজায় থাকে (বাইরে থেকে আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার হাত থেকে তাঁদের স্বাধীনতা যাতে স্বাক্ষরিত থাকে এবং অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা যাতে বিপন্ন না হয়।) *খুব বেশি আশা করা হবে না, যদি কোনও কোনও পরিস্থিতিতে* যার উদ্ভব অনতিবিলম্বে হওয়া সম্ভব সেইরকম ব্যবস্থা ব্রিটেনের শাসক শ্রেণির সেরকম অপছন্দ হবে না।

এটা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, আমরা একটা পর্যায়ের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। ভারতবাসীর (জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি, শহরে মধ্যবিত্ত, কৃষক শ্রেণি, শ্রমিক শ্রেণি) সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণের অবসান হয়েছে। জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি অংশ (উচ্চতর স্তরের) জাতীয় (প্রতিরক্ষা ইত্যাদি অজুহাতে) সংগ্রাম থেকে সরে গেছে। সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে খানিকটা ক্ষমতা তারা কেড়ে নিতে পারত, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের অবশিষ্ট চিহ্ন ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত তারা লড়াই করে যাবে, এমন আশা করা বৃথা। সাম্রাজ্যবাদের অবশেষ নিশ্চিহ্ন করা এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, একাজ শ্রমিক শ্রেণি, কৃষক শ্রেণি, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে করতে হবে। কাজেই ভারতের মতো দেশে এই পর্যায়ে কৃষক শ্রেণির ভূমিকাই হবে প্রধান। এই পর্যায় হবে প্রধানত কৃষিজীবীদের বিপ্লবের পর্যায়। তার অর্থ বুর্জোয়া বিপ্লবের (কৃষিজীবীদের বিপ্লবও তার একটা অংশ) এখনও অবসান হয়নি এবং সর্বহারার বিপ্লব কিংবা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় এখনও আসেনি, কিন্তু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম অংশ (সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংযুক্ত সংগ্রামের কাল) শেষ হয়েছে এবং তার দ্বিতীয় অংশ কৃষিজীবীদের সংগ্রামের কাল আরম্ভ হয়েছে।

এখানে আমি একথাও বলছি না যে, কৃষিজীবীদের বিপ্লব এর মধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ কৃষিজীবীরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে জমিদারদের জমিজমা কেড়ে নিচ্ছে, তাদেরকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, বড় বড় ভূসম্পত্তি নিজেরা দখল করে নিজেদের মধ্যে ভাগ

করে নিচ্ছে। এসব এখন শুরু হয়নি, যেমন ১৯২৭ সালে চিনে হয়েছিল। আমি যা বলতে চাই তা হল, ভারতীয় বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায়ের অবসান হয়েছে এবং স্পষ্টতই পরবর্তী পর্যায় আরম্ভ করবার জন্য, তার কাজ করবার জন্য, আমাদের এখন প্রস্তুত হতে হবে।

কোনও কোনও মহলে এখন অবিলম্বে সোভিয়েত স্থাপন করার কথাও বলা হচ্ছে। স্ট্যালিনের ভাষায় এ হল, পরাজয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া, একটা সমগ্র পর্যায়কে টপকে যাওয়া। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, এখন যা আছে তা হল কিষাণ সভা এবং তারাই এখন প্রধান ভূমিকা পালন করবে। এবং প্রকৃত সোভিয়েতগুলির তারাই হবে অগ্রদূত। (সোভিয়েত শব্দটি আমাদের ধার করার দরকার নেই, 'কিষাণ সভা'-ই যথেষ্ট। সকলেই সেটা সহজে বুঝতে পারে এবং তার একটা বিপ্লবী ঐতিহ্যও আছে)।

আগে যা বললাম তা থেকে বোঝা যাচ্ছে, আমাদের এখন আসল মনোযোগ ঘুরিয়ে দেওয়া উচিত কংগ্রেসের দিক থেকে কিষাণ সভার দিকে। খুব বেশি সংখ্যায় কিষাণ সভা নেই, এবং কংগ্রেসের মতো তাদের সংগঠন এত ব্যাপক নয় ঠিকই কিন্তু সেটা আমাদের বাধা হওয়া উচিত নয়, ঠিক ভাবে যদি তারা তাদের কী করা উচিত বুঝতে পারে, এবং ঠিক ঠিক স্লোগান তারা ব্যবহার করতে পারে, কিষাণ সভাগুলো ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠবে।

কিষাণ সভার ওপর আমি যে জোর দিচ্ছি, তার মানে এই নয় যে, অন্য সব সক্রিয়তা, সর্বহারার বিপ্লবের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমরা যা করছি, সেসব কাজে আমাদের অবহেলা করতে হবে। শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের দিকে আমাদের যতদূর সম্ভব মনোযোগ দিয়েই যেতে হবে।

আমাদের কংগ্রেসে থাকা উচিত, না কংগ্রেস ত্যাগ করা উচিত, এই প্রশ্ন নিয়ে অনেকে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমার মতে সে-প্রশ্নটি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ। আসল কথা হল, আমাদের পক্ষে কংগ্রেস আর বৈপ্লবিক কর্মের প্রধান অস্ত্র নয়, এবং সেই ধরনের কর্মের জন্য আমাদের প্রথম অন্য একটি ভিত্তি প্রস্তুত করতে হবে। কংগ্রেসে আমরা, যতদিন তাকে দিয়ে কাজ হবে, থাকতে পারি। কিন্তু অর্থনৈতিক এবং সাপ্তাহিক বন্ধনমোচনের জন্য কংগ্রেসের দিকে তাকিয়ে থাকতে আমরা আর জনসাধারণকে বলতে পারি না। জনগণকে কংগ্রেসের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখলে তাদের অত্যন্ত অনিষ্ট করা হবে, বিপ্লবের প্রতি অন্তর্ঘাত করা হবে। স্পষ্টতই কংগ্রেসের ওপর জনগণের নির্ভরতার আমাদের অবসান করতে হবে। তার জন্যে জনগণকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যেতে বলার আবশ্যক নেই। তবে দুটি কাজ আমাদের করতে হবে, একটি ইতিবাচক, আরেকটি নেতিবাচক। বর্তমান কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের চরিত্র আমাদের সহজ ভাষায় জনগণকে বুঝিয়ে বলতে হবে (নেতিবাচক) এবং জনগণের নিজেদের সংগ্রামের হাতিয়ার আমাদের তৈরি করে দিতে হবে, এবং তাদেরকে বলতে হবে একমাত্র তারই ওপর নির্ভর করতে।

যেহেতু, আমার যা মনে হয়, সেইটাই আমাদের কর্তব্য, প্রথম যা করা দরকার তা হল একটি বৈপ্লবিক মতাদর্শ নির্মাণ করা, অর্থাৎ একটি বৈপ্লবিক সমাজবাদী দল। আমার নিজের দল, কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির কথা বলতে গেল, আমাদের সামনে যে কাজ, তার পক্ষে সে দলের কাঠামোটা অত্যন্ত অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। এখনই সুবর্ণ সুযোগ সমস্ত বৈপ্লবিক মানুষকে একটি বৈপ্লবিক দলে সংহত করে আনার। আমরা যে আগেকার সমস্ত ভুলভ্রান্তি পিছনে ফেলে নতুনভাবে শুরু করব, তার ফলে আমরা দেশের বিভিন্ন বৈপ্লবিক

ধারাকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারব। এ প্রসঙ্গে আমার প্রস্তাব, সি. এস. পি., অনুশীলন, কীর্তি, শ্রমিক দল, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং ওই জাতীয় গোষ্ঠীগুলি নিয়ে আমরা একটি নতুন বৈপ্লবিক দল গঠন করি। সে দল দৃঢ় ভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে, অন্য কোনও দলের ওপর নির্ভরশীল হবে না। আমার মনে হয়, শুধু আপনি চাইলেই তা অতিশয় সম্ভবপর হবে। সি. এস. পি.-কে বাইরের একটা আবরণ হিসাবে, বিশেষ করে কংগ্রেসের ভিতরে থেকে, যতদিন আমরা সম্ভব বলে মনে করব, কাজ করবার জন্য চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

যাদের নিয়ে নতুন দলটি গঠন করতে হবে তাদের মধ্যে আমি কমিউনিস্ট পার্টির নাম করিনি, কারণ সি. পি. তার নিজের গঠনতন্ত্রের কারণে এবং সি. আই.-এর যে গঠনতন্ত্র, তার কারণে অন্য একটি সমাজতান্ত্রিক দলের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব মিলিয়ে দিতে পারে না। সে কাজ যদি তারা করেও তার উদ্দেশ্য হবে শুধু মাত্র সুযোগ পেলে অন্য দলে প্রবেশ করে তাকে দখল করা, অর্থাৎ তাকে তছনছ করে দেওয়া। অতএব নতুন দলটিকে সি. পি. থেকে স্বতন্ত্র থাকতে হবে, তবে দুটি দলের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে সংযোগ থাকতে হবে।

তার অর্থ এই নয় যে আমি নতুন দলটি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধী হবে বলে ভেবেছি। মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ আমাদের অবশ্যই রাখতে হবে এবং আমাদের বিপ্লবে সোভিয়েতের সাহায্য চাইতে হবে। কিন্তু নতুন দলটির নিজের নীতি অনুযায়ী চলবার স্বাধীনতা থাকা চাই, মস্কো থেকে আদেশ ব্যাতিরেকে।

আমার চিন্তা মতে, নতুন দলটি হবে সম্পূর্ণ গোপনচারী সর্বক্ষণের বিপ্লবীদের দ্বারা গঠিত। তার কার্যকলাপের মধ্যে থাকা চাই (এই বাক্য আমি সম্পূর্ণ করতে পারি না। আপনি বুঝতে পারবেন)।

সংক্ষেপে এই হল আমার প্রস্তাব। এই প্রস্তাব আমি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পেশ করছি। আপনার উচিত গুরুত্ব সহকারে এটি বিবেচনা করা। আমি সামনের মাসের শেষ দিকে মুক্তি পাওয়ার আশা করি। আপনার বিচারের সময়ে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করব। ইতিমধ্যে ওখানে আপনার বন্ধুদের সঙ্গে দয়া করে এটি নিয়ে আলোচনা করবেন, বিশেষ করে যাঁরা অনুশীলন সমিতিতে আছেন। আপনার প্রাথমিক পরামর্শ আপনি স্বামীজির হাতে পাঠাতে পারেন। এই পরিকল্পনা যদি আমরা কার্যকর করতে পারি, ভারতে আমরা বড় আকারে কিছু করতে পারব।

দল ছাড়াও, আমাদের দরকার সংগ্রামের জন্য জনগণের হাতে সাংগঠনিক বিবিধ অস্ত্র। বিভিন্ন কিষাণ সভা, মজদুর সভার মধ্যে প্রধানত তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি। ওগুলিকে কৃষক ও শ্রমিকদের এক মতে ইউনিয়নের মধ্যে সংহত করতে হবে (কৃষক ও শ্রমিক সোভিয়েত সমূহের কংগ্রেস) এই মুহূর্তে আমাদের অন্যতম কর্তব্য হবে সেই ইউনিয়নের গঠন।

আশা করি আপনার স্বাস্থ্য ভাল আছে এবং আপনার অর্জিত বিশ্রাম উপভোগ করছেন, এখানে আমরা ভালই আছি।

শুভেচ্ছা সহকারে
আপনার কমরেড

লর্ড লিনলিথগোর প্রতি লিখিত পত্রাবলী

লর্ড লিনলিথগো-কে

৩৮/২ এলগিন রোড
কলকাতা
২৯ ডিসেম্বর ১৯৪০

মহামান্য মহাশয়

অনেক ইতস্তত করবার পরে আমি মহাশয়কে বঙ্গদেশের পরিস্থিতির বিষয়ে পত্র লিখতে মনস্থ করেছি, যদিও এখনও আমি শয্যাশায়ী। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি এবং তা নিয়ে বিলম্ব করা চলে নয়। উপরন্তু মহোদয় সৌভাগ্যক্রমে এখন বঙ্গদেশে আছেন এবং তাঁর পক্ষে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা এবং আমি যা বলছি তার সত্যতা তৎক্ষণাৎ যাচাই করা সহজ। এ সুযোগ সচরাচর আসে না, এবং জনস্বার্থে এ-সুযোগ হারানো আমাদের উচিত না। আপনার সময় ও মনোযোগের কিছু আমি অধিকার করছি সেই উদ্দেশ্যে।

২) গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৫ অনুযায়ী, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের পরিকল্পনা সত্ত্বেও, প্রাদেশিক ক্ষেত্রেও গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল-এর কিছু কিছু দায়িত্ব থাকে। কিন্তু সেই সাংবিধানিক ব্যবস্থাও অন্য কোনও কারণ ব্যতিরেকে, প্রাদেশিক বিষয়ে মহোদয়ের অনুসন্ধানের যৌক্তিকতার ভিত্তি হতে পারে না। কিন্তু যুদ্ধের ফলে ভারতে সাংবিধানিক পরিবর্তনের দরুন ক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণ ঘটেছে এবং ভারত সরকার সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের শাসন পরিচালনা নিজের হাতে গ্রহণ করেছে।

৩) এখন আমি, মহোদয়ের সামনে যে বিষয়টি উত্থাপন করতে চাই, তাতে সরাসরি আসব, এপ্রিল ১৯৩৭ থেকে এমন একটি মন্ত্রীসভা বঙ্গদেশে শাসন করছে যার মনোভাব এবং উদ্দেশ্য প্রধানত সাম্প্রদায়িক। এই শাসনের পিছনে একটি সম্মিলিত জোট, সম্ভবত অলিখিত জোট আছে যার একদিকে আছে কতিপয় মুসলিম বিধানসভা সদস্য এবং আরেক দিকে ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে মুসলিমদের কার্যক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে এবং রাজনৈতিক বিষয়ে গভর্নর এবং ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়ের কথাই সর্বোপরি মান্য। যাঁরা এই দুই পক্ষের কোনওটিতেই নেই, ১৯৩৭ সাল থেকে প্রদেশ শাসনে তাঁদের কোনও স্থান নেই। কিন্তু তাঁদের বর্জনে বিশেষ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হত না। যদি শাসনকার্য মোটামুটি দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতা সহকারে পরিচালিত হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা হয়নি। আমাদের প্রশাসনের মৌলিক নীতি মনে হয়, সাম্প্রদায়িকতা এবং তার অন্য দুটি বৈশিষ্ট অদক্ষতা এবং অসাধুতা।

(৪) এখানে আমার তাড়াতাড়ি বলা দরকার, যেভাবে আমি বঙ্গদেশের মন্ত্রীসভার সমালোচনা করছি, তার সঙ্গে হিন্দু মহাসভার মনোভাবের কোনও মিল নেই। মুসলিম স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য আমার মতাবলম্বীরা সাগ্রহে সানন্দে এবং স্বেচ্ছায় দিতে প্রস্তুত। অতীতে এ বিষয়ে আমাদের সদিচ্ছা নানা কাজে আমরা প্রমাণ করেছি, যেসব কাজের ফলে আমরা, হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন, কখনও কখনও তাঁদের মধ্যে জনপ্রিয়তা হারিয়েছি।

আজ আমরা ভারতের সেই দলের একমাত্র প্রতিনিধি যে দল দুই প্রধান সম্প্রদায়ের

মধ্যে সেতুর কাজ করবার আশা করতে পারে এবং তা সত্ত্বেও ভারতীয় মুসলিমদের এক বৃহৎ অংশের বিশ্বাস ও আস্থা ভোগ করতে পারে।

(৫) এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে এদেশে ব্রিটিশ শাসনের ঊষাকাল থেকে বঙ্গদেশই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের লালনভূমি। হিন্দুবঙ্গ, বিশেষ করে এইসব দশকে, জাতীয়তাবাদের ভাষাতেই চিন্তা করেছে এবং কাজ করেছে, যার ফলে এই প্রদেশে হিন্দু মহাসভার আন্দোলন কোনও দিনই দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করতে পারেনি। কিন্তু আজ মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার অনিবার্য ফলস্বরূপ হিন্দুবঙ্গের ওপরে সাম্প্রদায়িকতার ঢেউ এসে পড়ছে। সাম্প্রদায়িকতার এই ঘূর্ণাবর্তে এবং তার অসংখ্য ঘূর্ণিপাতের মধ্যে যাঁরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী তাঁরা অসহায় বোধ করছেন।

(৬) এ কথা বলা যায় যে, বঙ্গদেশের হিন্দুরা যে ১৯৩৭ সাল থেকে দুঃখ দুর্দশা ভোগ করছে কিংবা তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব বাড়ছে কিংবা প্রশাসনে সাম্প্রদায়িকতা, অদক্ষতা, দুর্নীতি দেখা যাচ্ছে, তাতে ব্রিটিশ সরকারের কিংবা ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়ের কিংবা সাধারণভাবে মুসলিমদের সরাসরি কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কিন্তু এটা শুধু আপাতদৃষ্টিতে সত্য। আমি বলতে চাই, যদিও আজ বঙ্গদেশের হিন্দুরা অসুবিধায় পড়ে থাকেন, বিপদে পড়ে থাকেন, ঘটনা যে দিকে এগোচ্ছে, তাতে অচিরে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও এর ফল ভোগ করবেন। অন্যভাবে বলতে গেলে বঙ্গদেশের মুসলিম মন্ত্রীসভা যে অস্ত্রটি প্রয়োগ করছেন, তার আঘাত অন্য সম্প্রদায়সমূহের ওপরও এসে পড়বে। এবং বঙ্গদেশে যখন সিন্দু দেশের সংকটের পুনরাবৃত্তি হবে, পরিস্থিতি সমাধানের বাইরে চলে যাবে।

(৭) আমি মহোদয়ের মনোযোগ বঙ্গদেশের পরিস্থিতির গুরুতর সম্ভাবনা সমূহের দিকে আকৃষ্ট করতে চাই, এই কারণে নয় যে হিন্দুদের দুঃসময় চলছে, এই কারণে যে অবিলম্বে এর নিবারণের উপায় না পাওয়া গেলে এবং তার প্রয়োগ না করালে সমগ্র প্রদেশের শান্তি ভবিষ্যতে বিপর্যস্ত হতে পারে।

(৮) সম্ভাব্য সমাধান সমূহের একটি এবং যেটি সর্বশ্রেষ্ঠ, সেটি হল এমন একটি সরকার যার ওপরে দুই প্রধান সম্প্রদায়েরই আস্থা থাকবে এবং যেটি সমগ্রভাবে প্রদেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করবে। আদর্শ সমাধান হবে ন্যায়বিচার, নৈতিকতা এবং কর্মদক্ষতার ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি সরকার। অবশ্য এখন আমাদের মন্ত্রীরা আছেন যাঁরা নিজেদের হিন্দু বলেন, যাঁদের বিশেষ কোনও জনসমর্থন নেই। যার ফলে সাধারণভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের বর্তমান সরকারের ওপর কোনও আস্থা নেই। তপশীলি জাতি সমূহের কথা বলতে গেলে, তাঁদের প্রতিনিধিদের অধিকাংশ এখন বিরোধীদের সঙ্গে বসেন, এবং দু'জন তপশীলি মন্ত্রী আইনসভার বিরোধী পক্ষের তপশীলি সদস্যদের মধ্যে ভাঙন ধরাতে পারেননি, উদার হস্তে আনুকূল্য বিতরণের ক্ষমতা সত্ত্বেও। মুসলিম প্রসঙ্গে বলতে গেলেও তাঁদের প্রতি সুবিচার করতে গেলে বলতে হয়, তাঁদের মধ্যে এক প্রভাবশালী অংশ প্রবলভাবে বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট। তার প্রমাণ স্বরূপ, কৃষকপ্রজা পার্টি, যার সমর্থকের সংখ্যা নগণ্য নয়, একভাবে বিরোধীপক্ষকে সমর্থন করছে।

(৯) এ বিষয়ে মহোদয়ের দায়িত্ব বিশাল, প্রত্যক্ষভাবে এবং অপ্রত্যক্ষভাবে। প্রত্যক্ষ দায়িত্বের কারণ সাংবিধানিক সূত্রের মধ্যে নিহিত। অপ্রত্যক্ষ দায়িত্ব এই কারণে যে, বর্তমান মন্ত্রীসভা তার অস্তিত্বের জন্য সম্পূর্ণভাবে গভর্নরের ওপর এবং ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়ের ওপর নির্ভরশীল।

(১০) বঙ্গদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি মহোদয় সন্তুষ্ট হন, তাঁর সন্তোষের কারণ যাই হোক, আমার আর কিছু বলবার নেই এবং এই পত্রটিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা চলে। কিন্তু আমরা প্রকৃত ঘটনা হিসাবে জানি, পরিস্থিতির মধ্যে গুরুতর সম্ভাবনা সমূহ নিহিত আছে এবং ব্রিটিশ সরকারকে এবং ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়কে তাদের নিজের স্বার্থেই সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে। হলওয়েল স্মৃতিসৌধ সংক্রান্ত সত্যাগ্রহের বিষয়ে বেসরকারি ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায় সুবিবেচনা মনোভাব অবলম্বন করেছেন, যা প্রকৃত প্রশংসা অর্জন করেছে। এবং এও সম্পূর্ণ অসম্ভব নয় যে, আজও সেই সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অভাব হবে না।

(১১) আরেকটি যে সমাধানের কথা আমার মনে হয়েছে, সেটি হল, যুদ্ধের কালে সংবিধানকে মুলতুবি রাখা। কিন্তু সেই সমাধানটির বিষয়ে, আমি এখন কিছু বলতে চাই না, কারণ অন্য একটি সমাধানও পাওয়া যেতে পারে।

(১২) ব্রিটিশ সরকার এবং ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায় ১৯৩৭ থেকে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক জীবনে যে ভূমিকা পালন করে আসছেন, সেই ভূমিকাই যদি পালন করে চলেন, পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে থাকবে যতদিন না তা সংশোধনের অতীত হয়ে পড়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই ঘটনাই যদি ঘটে, আমাদের অন্তত এইটুকু স্বান্ত্বনা থাকবে যে, আমরা যথেষ্ট সময় থাকতে বিষয়টি সর্বোচ্চ সরকারি কর্তৃপক্ষের নজরে এনেছিলাম।

আপনার বিশ্বস্ত
সুভাষচন্দ্র বোস।

লর্ড লিনলিথগো-কে

৩৮/২ এলগিন রোড
কলিকাতা
৩ জানুয়ারি ১৯৪১

মহামান্য মহাশয়,

(১) মি. লেইথওয়েট এ মাসের ১ তারিখের পত্রে মহোদয়ের যে বার্তা প্রেরণ করেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আরও একটি বক্তব্য বঙ্গদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে মহোদয়ের গোচরে আনা আমার উচিত ছিল বলে মনে করি।

(২) মাস দুয়েক আগে বঙ্গ সরকারের একটি নতুন বিজ্ঞপ্তিতে সমস্ত সভা, মিছিল ইত্যাদি নিষিদ্ধ হয়েছে, রাজনৈতিক জীবনের যেগুলি অপরিহার্য অঙ্গ। ১৯৩৯-এ যুদ্ধের আরম্ভের সময়ে জারি আদেশের অপেক্ষা এই আদেশটি অধিকতর কঠোর।

(৩) সরকারের মুখপাত্র এ বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে সাধারণত বলে থাকেন, তথাকথিত নিষেধাজ্ঞাটি কোনও নিষেধাজ্ঞাই নয়, কারণ সভা ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় অনুমতি গ্রহণ করে করা যেতে পারে। কিন্তু আমার প্রজন্মের লোকেরা, যাঁরা বিশ বছর ধরে রাজনৈতিক জীবনে আছেন, কখনওই সভা ইত্যাদি অনুধাবনের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতির জন্য আবেদন করেননি, এবং সেই রীতি এখনও পরিত্যাগ করবেন না। সরকার এ বিষয়ে অনবহিত নয়। অতএব উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিটি প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জনসভা ইত্যাদির ওপরে নিষেধাজ্ঞাই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(৪) মহোদয়ের স্মরণ থাকতে পারে, গত বৎসর, ১৯৩৯-এর প্রথম দিকে জারি করা বঙ্গীয় সরকারের নিষেধাজ্ঞার প্রতি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম। তারপর আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় গৃহমন্ত্রী, দু'জনের সঙ্গেই যোগাযোগ করি এবং তাঁদের কাছে আবেদন করি, ওই অদ্ভুত বিজ্ঞপ্তটি প্রত্যাহার করে ব্রিটিশভারতের অন্যান্য অংশে যা আছে তার সঙ্গে একই রকম অবস্থা প্রবর্তন করতে। আমি তাঁদের মনে করিয়ে দিই, দিল্লিসহ সারা দেশে আমি বক্তৃতা দিতে পারব আর বঙ্গদেশে প্রবেশ করেই আমাকে মুখ বন্ধ করে চলতে হবে, এই অবস্থা কতখানি অসঙ্গতিপূর্ণ। আমি আরও উল্লেখ করেছি অন্যসব প্রাদেশিক সরকারের মতো বঙ্গদেশের সরকারও রাজদ্রহোমূলক, যুদ্ধ-বিরোধী বক্তৃতার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারত এবং সমস্ত জনসভা ইত্যাদির ওপর সাধারণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা শুধু অন্যায় নয়, অপ্রয়োজনীয় ছিল। আমার আবেদন বৃথা হয়েছে এবং শেষপর্ব পর্যন্ত পাঁচ মাস অপেক্ষা করার পর আমরা যে নিষেধাজ্ঞা সহ্যের অতীত হয়ে যাওয়ার পথে, তাকে অমান্য করতে আরম্ভ করি। প্রথমে আমাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্রাতর করা হয় কিন্তু তারপরে সুবুদ্ধি উদয় হওয়ার ফলে কর্তৃপক্ষ আমাদের জনসভাসমূহে আর বাধা দেয়নি। আমার মনে হয় না, সেই অদ্ভুত আচরণের দ্বারা বঙ্গ সরকার তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

(৫) ঠিক একই রকম পরিস্থিতির আজ উদয় হয়েছে এবং বঙ্গ সরকার তাদের দুর্বোধ্য নীতির দ্বারা শুধুমাত্র আইন অমান্য আন্দোলনই ডেকে আনছে। মহোদয়কে আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছে, এই পরিস্থিতিতে একজন স্বাধীনতা প্রেমী মানুষ, যখন সে স্থানীয় সরকারের কাছ থেকে কোনও সাড়া পায়নি, তখন সে কী করবে। তার কী করা উচিত।

(৬) এখানে আমাদের সরকার সংবাদপত্রকেও বাদ দেয়নি। প্রথমত অন্য প্রদেশগুলির তুলনায় এখানকার নজরদারি ও সংশোধন ব্যবস্থা অনেক বেশি কঠোর, যেটা বিভিন্ন প্রদেশের সংবাদপত্রের মধ্যে তুলনা করলেই প্রমাণ হবে। কিন্তু তার চেয়েও যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল, সামান্য অজুহাতে কোনও কোনও খবরের ওপর সরকার পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করছে। হলওয়েল সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময়ে বঙ্গ সরকার বিজ্ঞপ্তির দ্বারা সেই আন্দোলনের সমস্ত খবর প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দেয়। ভারত সরকারের গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহ সংক্রান্ত নীতির সঙ্গে তার কত তফাত।

(৭) মাসখানেক আগে, যখন বঙ্গদেশের জেলে কয়েকজন বন্দি অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করেন, বঙ্গ-সরকার বিজ্ঞপ্তির দ্বারা সেই অনশন ধর্মঘট সংক্রান্ত সমস্ত খবর, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দেয়। আমার বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমি অনুরূপ কোনও ঘটনা কখনও দেখিনি। এই ঘটনার সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক দিক হল ঘটনাটি ঘটেছে একটি জনপ্রিয় মন্ত্রীসভার ছত্রছায়াতলে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, এই প্রদেশের মানুষ এ রকম জনপ্রিয় সরকার সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করে না।

(৮) বঙ্গ সরকার, তাদের সুবিধামতো 'একই নীতির' কথা বলে। কিন্তু সেই নীতি যখন অন্যত্র, এই প্রদেশের যা প্রচলিত তার চেয়ে বেশি এগিয়ে যায়, তখন আর সে যুক্তির কথা মনে থাকে না।

(৯) এই পত্র লেখার উদ্দেশ্য প্রতিকার প্রার্থনা নয়, মহোদয়কে বিবিধ বিষয়ে অবহিত রাখা, যাতে আমাদের যেসব অসুবিধার মধ্যে জীবন-ধারণ করতে হল অন্তত সেটা উপলব্ধি করতে পারেন।

আপনার বিশ্বস্ত
সুভাষ চন্দ্র বোস

প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টের প্রতি

সুপারিনটেনডেন্ট
প্রেসিডেন্সি জেল, সমীপেষু

মহাশয়,

আজ সকালে, কর্তব্যরত এক ওয়ার্ডারের আদেশে, চুয়াল্লিশ নম্বর সেলের কয়েদিকে নিগ্রহ করা হয়। আমি এই অভিযোগের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। উক্ত কয়েদি আমার ‘ফালতু’ অর্থাৎ সহায়ক। নিগ্রহের ঘটনাটি ঘটে আজ প্রত্যুষে যখন জেলর রাউন্ড দিতে বেরোয়।

আমার সহায়ক কয়েদির কাছ থেকে আমি কী ঘটেছিল জানবার চেষ্টা করে যা জানতে পেরেছি তা এই:

জেলর যখন তার সেলের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন— তখন কয়েদিটি উঠে দাঁড়াতে বিলম্ব করেছিল। সে বলছে সে ওর্য়াডারের ‘সাবধান’ শব্দটি শুনতে পায়নি এবং তার অবহেলা ইচ্ছাকৃত ছিল না। তার এই অপরাধের জন্য ওয়ার্ডার ওভারসিয়র, পারাওয়ালা এবং অন্য একজন কয়েদিকে আদেশ করে ওই কয়েদিকে ‘ধোলাই’ দিতে অর্থাৎ উত্তমরূপে প্রহার করতে। প্রহার করা হয়, জেলর সেই ওয়ার্ড (চুয়াল্লিশ সেল) ছেড়ে যাওয়ার পর।

কয়েদি যা বলছে আমি বিশ্বাস করি, কারণ সে প্রকৃতই কানে কম শোনে। প্রায়ই তাকে আমার কথা শোনানোর জন্য আমাকে চেঁচিয়ে কথা বলতে হয়। আসলে আমি তার বধিরত্বের বিষয়ে অভিযোগ করার কথা, এবং তার বদলি করানোর কথা ভাবছিলাম, কিন্তু তার ভাল ব্যবহারের জন্য আর নিজের কাজ সে ঠিক ভাবে করে বলে তা করিনি।

আমি ভেবেছিলাম ১৯৪০ সালে ‘ধোলাই’-এর প্রথা উঠে গেছে। কিন্তু যা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে ‘ধোলাই’ কোনও বিরল ঘটনা নয়। কিন্তু ‘জেলকোড’-এ তার কোনও ব্যবস্থা নেই।

আপনাকে আমার অনুরোধ, ওই ঘটনাটি সরকারিভাবে দেখবেন।

ধন্যবাদান্তে,

আপনার বিশ্বস্ত
সুভাষচন্দ্র বোস
১৫. ৭. ৪০

প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টের প্রতি

সুপারিনটেনডেন্ট
প্রেসিডেন্সি জেল, সমীপেষু

১৭. ৭. ৪০

প্রিয় মহাশয়,

গলা ব্যথা, নাকের অসুবিধা, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি প্রতিরোধের জন্য আমি নিয়মিত নাকের স্প্রে ব্যবহার করি এবং তাতে সুফল পাই। বর্তমানে স্প্রে করার ওষুধ ফুরিয়ে গেছে। একমাত্র সেই ওষুধেই মেনথল ইত্যাদি থাকে এবং ওইটিই আমার ভাই ডক্টর সুনীলচন্দ্র বোস আমাকে দিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে আমি প্রেসক্রিপশনটি পেতে চাই এবং আমি নিশ্চিত, জেল হাসপাতাল ওষুধটি প্রস্তুত করতে পারে। আপনি কি দয়া করে আপনার কোনও কর্মচারীকে বলতে পারবেন, ডক্টর বোসকে টেলিফোন করে বলতে যেন তিনি আপনার কাছে প্রেসক্রিপশনটি পাঠিয়ে দেন। তাতে একদিনের মধ্যেই প্রেসক্রিপশনটি আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। তা না হলে জানবার কোনও উপায় নেই, আমার চিঠি কবে তাঁর কাছে পৌঁছবে। দশ দিন আগে আমি বাড়িতে যে চিঠি দিয়েছি তা এখনও পৌঁছয়নি, কেননা যেসব জিনিস আমি চেয়েছি, এখনও আসেনি।

আপনার বিশ্বস্ত
সুভাষচন্দ্র বোস

আপনি কি দয়া করে আপনার বাড়ি থেকে পাঠানো শেষ প্রেসক্রিপশানটি দেখবেন? বলা হয়েছে, যে প্রেসক্রিপশনটি আগেই পাঠানো হয়েছে তাতে নাকের স্প্রের প্রেসক্রিপশনটিও ছিল।*

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
১৭/৭

* * *

শেষ প্রেসক্রিপশনটি এই সঙ্গে পাঠানো হল। এটি হজমের ওষুধের প্রেসক্রিপশন, নাকের স্প্রে নয়। দেখা হয়ে গেলে দয়া করে প্রেসক্রিপশনটি ফেরত পাঠিয়ে দেবেন।

এস. সি. বোস
১৭/৭

* * *

* (মূল prescription-এর বদলে এখানে আছে 'problem,' অবশ্যই ছাপার ভুলে: অনুবাদক)

দেখা হয়েছে, ফেরত পাঠানো হল।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
১৭/৭

* * *

সাক্ষাৎকারের আবেদন খারিজ
(১) মিস. ইলা বোস— দু'বার
(২) কল্যাণ বোস

পি. সি. টা ৩৫-৮৯ অবশিষ্ট

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
১৭/৭

মাননীয় গৃহমন্ত্রী
বঙ্গাল সরকার

প্রেসিডেন্সি জেল সুপারিনটেনডেন্টের মাধ্যমে,

প্রিয় মহাশয়,

হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলন সংক্রান্ত বিষয়ে সংবাদপত্র ইত্যাদির ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার ওপর মি. জে. হাশমির মুলতুবি প্রস্তাবের ওপর বঙ্গীয় আইনসভায় এ মাসের ১৮ তারিখে আপনার ভাষণের স্টেটসম্যানে প্রকাশিত প্রতিবেদন আমি পড়লাম। স্টেটসম্যানের সংবাদ যথার্থ কিনা আমি জানি না। আপনার ভাষণ অতিশয় ভ্রান্ত এবং সেই কারণে যারা কারাগারে থাকার কারণে সেই ভাষণের উত্তর দিতে অক্ষম, তাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। আমি প্রতিবাদ জ্ঞাপনের আগে ভাষণের যথার্থ বিবরণ দেখতে চাই, সেটাই উচিত। অতএব আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, দয়া করে আপনার ভাষণের একটি সঠিক অনুলিপি আমাকে পাঠান।

যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে যদি আমি তা না পাই, স্টেটসম্যানের প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই আপনাকে আমার বক্তব্য আমায় জানাতে হবে।

আপনার বিশ্বস্ত
সুভাষ সি. বোস

প্রেসিডেন্সি জেল
১৯. ৭. ৪০

প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টের প্রতি

সুপারিনটেনডেন্ট
প্রেসিডেন্সি জেল সমীপেষু

প্রিয় মহাশয়,

এ মাসের ৫ তারিখে আমি মাননীয় গৃহমন্ত্রীকে আমাদের অবস্থানের প্রশ্নে একটি পত্র লিখেছিলাম। যে পত্রের সুনির্দিষ্ট জবাব সরকারের কাছ থেকে যতদিন না পাই, আপনি কয়েকটি বিষয়ের নিষ্পত্তি করতে পারেন, যেগুলি আমার মনে হয়, আপনার অধিকারভুক্ত।

(১) সঙ্গলাভের প্রশ্ন

আমাকে ৫ তারিখ থেকে অন্যদের থেকে পৃথক করে একাকী করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই আমি একাধিকবার আপনাকে মৌখিক প্রতিবাদ জানিয়েছি এবং একবার আমার মতো একই ধারায় যারা বন্দি, তাঁদের সঙ্গে দৈনিক এক ঘণ্টা করে মেলামেশা করবার জন্যে অনুমতি চেয়ে পত্র দিয়েছি। সে ধরনের বিচ্ছিন্নতা এখন মনে হয় স্থায়ী ব্যবস্থা, সেটা সর্বাংশে অবৈজ্ঞানিক এবং অস্বাস্থ্যকর এবং আমার বন্দি অবস্থায় দীর্ঘকালের মধ্যে আমার ওপরে আগে কখনওই চাপিয়ে দেওয়া হয়নি।

(২) দৈনিক ব্যায়ামের প্রশ্ন

এই ওয়ার্ডে পায়চারী করার কোনও ব্যবস্থা নেই বললেই চলে, আয়তনে এটি এতই ক্ষুদ্র, সেই কারণে আপনাকে অনুরোধ করছি, আমাকে 'লক-আপ'-এর পরে জেলের চৌহদ্দির মধ্যে সন্ধ্যাবেলায় পায়চারী করবার অনুমতি দিন। এমন একটিও জেলখানা ভারতে কিংবা ব্রহ্মদেশে নেই, যেখানে কোনও সময়ে সে অনুমতি দিতে অস্বীকার করা হয়েছে। আমি, দৃষ্টান্ত হিসাবে কয়েকটি জেলখানার নাম উল্লেখ করছি:

(১) আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, কলকাতা
(২) বহরমপুর জেল, বঙ্গদেশ
(৩) সেওনি জেল— সি. পি. (জেলের প্রাচীরের বাইরে)
(৪) জব্বলপুর সেন্ট্রাল জেল— সি. পি.
(৫) আর্থার রোড জেল— বোম্বাই
(৬) মান্দালয় জেল
(৭) রেঙুন জেল } ব্রহ্মদেশ
(৮) ইনসেইন জেল

(৩) সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকারের জন্য আমার একটি আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আমি নিশ্চিত যে, আমার কয়েকজন আত্মীয়ও এর মধ্যে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য আবেদন করেছেন। আমি ধরে নিতে পারি, তাঁদেরকেও অনুমতি দেওয়া হয়নি, অতএব আমি বাধিত হব, যদি দয়া করে আপনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে দেখেন আমার আত্মীয়দের

মধ্যে কার কার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি আছে। আমাদের পরিবার বৃহৎ এবং আমি সহজেই তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইতে পারি যাঁদের ওপর সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই।

আমার ভাই শরৎচন্দ্র বোসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারটি ছিল বিশেষ ধরনের, সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে সরাসরি তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এইসব বিষয়ের কোনও কিছু যদি বর্তমানে সম্পূর্ণ আপনার কর্তৃত্বাধীন না থাকে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সেগুলি নিয়ে যা করণীয় করুন।

ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত
সুভাষ সি. বোস

প্রেসিডেন্সি জেল
২৩. ৭. ৪০

প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টের প্রতি

সুপারিনটেনডেন্ট
প্রেসিডেন্সি জেল
সমীপেষু

প্রিয়মহাশয়,

আমাদের মধ্যে সদ্য যে কথাবার্তা হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে বলছি, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, তাড়াতাড়ি করে আমি যে কয়েকটি বক্তব্য লিখেছি, সে বিষয়গুলি বিবেচনা করে অনুরোধ করবেন (অবশ্য, যেখানেও প্রয়োজন সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে) দয়া করে লক্ষ করবেন, আমি কোনও মাত্রাতিরিক্ত দাবি করছি না। বস্তুত এমন একটিও দাবি নেই, আগেকার সরকার যা স্বীকার করেনি।

(১) খাদ্য এবং অন্যান্য ভাতা আগেকার বন্দিত্ব কালে যেমন ছিল (আমার মনে হয় ১৯২৪-২৭-এ খাদ্য ভাতা ছিল ৬ টাকা ১০ আনা প্রতিদিন এবং তার পরের বন্দিত্ব কালে ৪ টাকা ৮ আনা)।

(২) কিছু সুযোগসুবিধা, যেমন, চিঠির কাগজ, খাতা, কাপ-প্লেট, ছুরি সমেত এবং অন্যান্য জিনিসপত্র যথা সুটকেস, জামা-কাপড়, ইত্যাদি রাখা ও সরবরাহ— যেগুলি জেলের নিষেধ লঙ্ঘন করে না।

(৩) বিশেষ বিশেষ দৈনিক সংবাদপত্র সরবরাহ নিষিদ্ধ থাকবে না (যেমন, বিগত বন্দিত্ব কালে ১৯৩৬-৩৭-এ, আমাকে সমস্ত সংবাদপত্র দেওয়া হত।)

(৪) সরকার দ্বারা নিষিদ্ধ নয়, এমন সমস্ত বইপত্র অনুমোদন করতে হবে।

(৫) আমি কতগুলো পত্র লিখতে পারব সে বিষয়ে উদার নীতি যেমন,

(শেষবার, ১৯৩৬-৩৭-এ) সেই সংখ্যা ছিল সপ্তাহে ৪ থেকে ৫ বার।

(৬) আমার নিজের খরচে গ্রামাফোন আনা, তার ব্যবহারের সময় অবশ্য এমন ভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে, যাতে জেলের কাজ বিঘ্নিত না হয়।

(৭) সুপারিনটেনডেন্টের অনুমতিক্রমে আমাকে যেন মাঝে মাঝে আমার চিকিৎসক ভাই ডা. সুনীল সি. বোসের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়।

(৮) বর্তমানে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়, ব্যায়াম এবং সাক্ষাৎকার সংক্রান্ত। ব্যায়ামের বিষয়ে, সকালে অথবা বিকালে নদীর ধারে আমাকে যেন পায়চারী করতে দেওয়া হয়, গাড়ির খরচ আমার নিজের। ১৯৩৭ সালে তার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

সাক্ষাৎকারের বিষয়ে ১৯৩৭-এ আমাকে অপরাহ্নে বাড়ি যেতে দেওয়া হত। তাতে যদি আপত্তি থাকে, আমাকে রোজ সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। সে সব সাক্ষাৎকার ওয়ার্ডের ভিতরে করতে দেওয়া যেতে পারে, কোনও পুলিশ অফিসারের উপস্থিতি ছাড়াই। (১৯৩৬-এ ডিসেম্বরে এবং ১৯৩৭-এর প্রথম দিকে আমাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দৈনিক সাক্ষাৎকার করতে দেওয়া হত, যেখানে আমি ছিলাম রাজবন্দি এবং সাক্ষাৎকারের সময়ে কেউ সেখানে থাকতেন না। পরবর্তী কালে আমাকে প্রত্যেকদিন বাড়ি গিয়ে দেখা করতে দেওয়া হত।)

জেলখানায় দৈনিক সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে, ভাল হয়, ওয়ার্ডের মধ্যে তার ব্যবস্থা হলে, কারণ তাতে আমার কিংবা অন্য কারও কোনও অসুবিধা হয় না। রাজবন্দি হিসাবে সাধারণত আমাকে ওয়ার্ডের ভিতরে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয়েছে, দরকার হলে আমি আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাতে পারি। ১৯২১ এবং ১৯২২ সালে মি. সি. আর. দাশের ক্ষেত্রে, লে. কর্নেল হ্যামিলটন এই ওয়ার্ডে দৈনিক সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিতেন এবং মেজর সলবেরি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে সে অনুমতি দিতেন। যদিও তিনি বিচারাধীন ছিলেন এবং পরে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন।

এখানে আমি এখন প্রস্তাব দিয়েছি যা আমার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অর্থাৎ জেলে বন্দি অবস্থা। এবং আমি এ চিঠি লিখছি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করে। এই পত্র লেখার সময়ে আমি ধরেই নিচ্ছি আমি রাজবন্দি। আর শুধু এইটুকু বলব যে, এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যায়াম এবং সাক্ষাৎকার সংক্রান্ত। বর্তমান বন্দি অবস্থা, দুঃখের বিষয়, আমার স্বাস্থ্য এবং আমার স্নায়ুর পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে।

সরকারের পক্ষে বিষয়টি যাতে সহজ হয় আমি বলতে পারি, ব্যায়াম এবং সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে আমাকে যদি উল্লিখিত সুযোগগুলি দেওয়া হয়, আমার সততায় যদি তাঁরা বিশ্বাস রাখেন, তাঁদের বিশ্বাসের আমি প্রতিদান দেব। এমনকী সার জন অ্যান্ডারসনের সরকারও শক্তিশালী সরকার হিসাবে যার সুনাম ছিল, আমাকে যখন তাঁরা উল্লিখিত সুযোগ-সুবিধাগুলি দিয়ে দিলেন, ব্যায়াম এবং সাক্ষাৎকারের জন্য, আমার সম্পর্কে কোনও অভিযোগ ওঠেনি।

আপনার বিশ্বস্ত
সুভাষ সি. বোস

প্রেসিডেন্সি জেল
৭. ৮. ৪০

প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টের প্রতি

সুপারিনটেনডেন্ট
প্রেসিডেন্সি জেল
সমীপেষু,

প্রিয় মহাশয়,

কার্যত যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল নির্জন কারাবাস, তার বিরুদ্ধে বারে বারে প্রতিবাদ জানানোর পর সরকার দয়া করে শ্রীঅমরেন্দ্র এন. বোসকে... ওয়ার্ড থেকে এই ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করে দেন। আমি ধরে নিচ্ছি যে, এর উদ্দেশ্য আমার সঙ্গীর ব্যবস্থা করা। তাই যদি হয়, আমি সরকারকে জানাতে পারি যে, সে-উদ্দেশ্য উপরোক্ত ব্যবস্থার দ্বারা সাধিত হয়নি। এর দ্বারা সরকার শুধু বলতে পারবেন, আমি নির্জন কারাবাসে নেই।

২) আমি কেবলমাত্র এই সরল আবেদনটি করেছিলাম, আমাকে প্রতিদিন ঘণ্টা খানেকের জন্য রাজনৈতিক বন্দিদের ওয়ার্ডে (আমি ওয়ার্ড ১৭-র কথা বলছি) যেতে দেওয়া হোক। আমাকে সে অনুমতি দেওয়া হয়নি, কী কারণে আমি বুঝতে পারছি না। এখানে এই ওয়ার্ডে যে বিচারাধীন বন্দিরা আছেন, তাঁরা হত্যা প্রবঞ্চনা ইত্যাদির অভিযোগে অভিযুক্ত। মনে হচ্ছে, সঙ্গী হিসাবে এরা যথেষ্ট ভাল, বিনা বিচারে যাঁরা ১৭ নং ওয়ার্ডে বন্দি, তাঁরা তা নন। আমাকে যদি এই ওয়ার্ড থেকে যেতে দেওয়া না হয়, তাঁরা এখানে কয়েকজন করে আসতে পারেন।

(৩) আরেকটি বিষয়ে সরকার সহজেই সম্মত হতে পারেন, যদি তাঁরা না চান যে এইরকম বন্দি দশায় আমার মাথা খারাপ হয়ে যাক। তাঁরা আমাকে আমার নিজের খরচে একটা রেডিও রাখতে দিতে পারেন। আমি কথা দিচ্ছি সেই রেডিও এমন ভাবে ব্যবহার করব যাতে জেলের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত না হয়। তাতে কারও কোনও ক্ষতি হবে না। আমাকে স্বস্তি ও আরাম দেবে। এখনকার দিনে রেডিও এবং সিনেমা (স্ববাক চিত্র) সভ্য জগতে সর্বত্র জেলখানায় চলতে দেওয়া হয়। বস্তুত এখানে এই জেলখানাতেই সেদিন পর্যন্ত একটা টকি ছিল, সাধারণ কয়েদিদের জন্য। সরকার যদি আমাদের সাধারণ অপরাধীদের চেয়ে নিচু শ্রেণিতে রাখতে না চান, আমার মনে হয় আমাকে একটি রেডিও রাখতে দিতে পারেন যার জন্যে আমি এতদ্বারা ব্যক্তিগত অনুরোধ জানাচ্ছি।

এ বিষয়ে যদি উচ্চতর কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন হয়, প্রয়োজনীয় আদেশের জন্য উচ্চতর মহলে আপনি এটি পাঠিয়ে দিলে আমি বাধিত হব।

আপনার বিশ্বস্ত
সুভাষ সি. বোস

প্রেসিডেন্সি জেল
২২. ৮. ৪০

প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টের প্রতি

সুপারিনটেনডেন্ট
প্রেসিডেন্সি জেল,
সমীপেষু,

প্রিয় মহাশয়,

আমার সাক্ষাৎকারের বিষয়ে রিকুইজিশন বইয়ে আপনার নোট আমি দেখলাম। আবার আমি এখানে আমায় সাক্ষাৎকারে আপনার অনুমতি না দেওয়ার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আপনি সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিতে অস্বীকার করছেন এমন একটা সময়ে, যখন সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন অন্য যে কোনও সময়ের চেয়ে বেশি।

(২) যখন কেউ অসুস্থ থাকে তার জেলের ভিতরে সাক্ষাৎ সে তার সেলের ভিতরই হোক আর হাসপাতালেই হোক, সাধারণ ব্যাপার। জেলের ভিতরে সাক্ষাৎ যদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়, তার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, যতদিন সে অসুস্থ থাকবে সে কোনও সাক্ষাৎকার করতে পারবে না। স্পষ্টত, এ রকম অবস্থা অসম্ভব। বর্তমান ক্ষেত্রে আপনার উচিত আমার সঙ্গে হাসপাতালের রোগীর মতো ব্যবহার করা, শুধু চিকিৎসার ব্যাপারে নয়, অন্য ব্যাপারেও।

(৩) বঙ্গদেশের জেলে যতদিন আছি, তুলনামূলক ভাবে সেই স্বল্পকালের মধ্যে আমি অসুস্থ হয়েছি কদাচিৎ কিন্তু নিজে দেখেছি বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে জেলের ভিতরেই সাক্ষাৎকার করতে। এই ওয়ার্ডেই (এবং আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে, যখন তিনি সেখানে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন) প্রয়াত দেশবন্ধু সি. আর. দাশকে তাঁর পরিবারের সঙ্গে প্রতিদিন অপরাহ্ণে কয়েক ঘণ্টা করে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হত।

(৪) যখনই আমি সাক্ষাৎকারের সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছি, একই সুযোগ আমিও পেয়েছি এবং জেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র আপত্তি জানানো হয়নি, যেমন ব্রহ্মদেশে মান্দালয়, রেঙ্গুন এবং ইনসেইন জেল, মধ্যপ্রদেশে সেওনি এবং জব্বলপুর জেলে।

অতএব আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করুন এবং আমাকে এখানে সাক্ষাৎকার করতে দিন। এই সপ্তাহে আমাকে সাক্ষাৎকারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা শাস্তি দেওয়ার সামিল, বিশেষত আবার যখন আমি সম্পূর্ণ একা। পুনর্বিবেচনার পথেও যদি আপনার উত্তর নেতিবাচক হয়, আপনি সরকারের কাছে বিষয়টি পাঠালে আমি বাধিত হব।

আপনার বিশ্বস্ত
সুভাষ সি. বোস

প্রেসিডেন্সি জেল
৩০. ৮. ৪০

প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টের প্রতি

সুপারিনটেনডেন্ট
প্রেসিডেন্সি জেল,
সমীপেষু,

প্রিয় মহাশয়,

আমার আইনজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য সরকারের যে সম্মতি আমি পেয়েছি, সেই প্রসঙ্গে বলি, প্রথমত, আমি কর্তৃপক্ষ-নিযুক্ত আমার অ্যাটর্নির সঙ্গেই দেখা করতে চাই এবং বিষয়টি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করতে চাই।

আমি ধরে নিচ্ছি এই সাক্ষাৎকার যথাবিধি পথ ধরে হবে। এবং একান্তে হবে, যেখানে কোনও অফিসার উপস্থিত থাকবেন না।

আমার অ্যাটর্নি মি. নৃপেন্দ্র সি. মিত্র, মেসার্স মিত্র অ্যান্ড মিত্র সলিসিটরস, ৫ হেস্টিংস স্ট্রিট। কলিকাতার মিত্র অ্যান্ড মিত্র কোম্পানির নাম টেলিফোনের তালিকায় আছে। মি. মিত্র প্রতিদিন সকালে ১১:৩০ মিনিট নাগাদ তাঁর অফিসে থাকেন। তাঁর বাসভবনও টেলিফোন তালিকায় আছে, এন. সি. মিত্র। ২বি অভয় গুহ রোড, কলিকাতা এই নামে ও ঠিকানায়। যেহেতু আগামী কাল ছুটি, আমি চাই, সাক্ষাৎকারটি আজ অপরাহ্নে হোক।

ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত
সুভাষ সি. বোস

প্রেসিডেন্সি জেল
৩১. ৮. ৪০

প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টের প্রতি

সুপারিনটেনডেন্ট
প্রেসিডেন্সি জেল

প্রিয় মহাশয়,

আজ সকালে আপনাকে একটি পত্র দেওয়ার পর, 'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ডে' আমি দেখলাম, আমার বিরুদ্ধে চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট একটি ওয়ারেন্ট জারি করেছেন এবং আইনের দুটি ধারায় আমার নামে অভিযোগ আনা হয়েছে। এর ফলে, এখনই আমার আইনি পরামর্শদাতার সঙ্গে পরামর্শ করা আরও জরুরি হয়ে পড়েছে। অতএব আমার অ্যাটর্নি মি. নৃপেন্দ্র সি. মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার যেন আজ বিকালেই স্থির করা হয়।

সাক্ষাৎকারের সময়ে যাতে কোনও ভুল বোঝাবুঝির কিংবা অপ্রিয়তার সৃষ্টি না হয়

আপনি, সাক্ষাৎকারটি রীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হওয়ার এবং একান্তে হওয়ার জন্য নির্দেশ রেখে গেলে আমি বাধিত হব।

ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত
সুভাষ সি. বোস

প্রেসিডেন্সি জেল
৩১. ৮.৪০

প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টের প্রতি

সুপারিনটেনডেন্ট
প্রেসিডেন্সি জেল,
সমীপেষু,

প্রিয় মহাশয়,

কয়েক দিন আগে পি.ডব্লিউ. ডি-র প্রতিনিধি আমাকে একটি নোট দেখান, যাতে বলা হয়েছে, রেডিও সেটটির জন্য অপরিহার্য একটি 'আর্থ কানেকশানের' জন্য ২২ টাকা খরচ পড়বে। আমি রেডিও সরবরাহকারীদের সঙ্গে দু'বার পরামর্শ করেছি এবং তাঁরা আমাকে জানিয়ে দেন, পি. ডব্লিউ. ডি. যে আর্থ কানেকশান লাগাতে বলেছে তার প্রয়োজন নেই। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, বাড়িতে আমার রেডিও সেটের জন্য আর্থ কানেকশন লাগেনি। রেডিও যাঁরা দিচ্ছেন তাঁরা দক্ষ এবং নিজেদের কাজ জানেন। তা ছাড়া, ভুল পরামর্শ দেওয়ার ফলে এবং ত্রুটিযুক্ত সংযোগ দেওয়ার ফলে যদি ক্ষতি হয়, তাঁদের লোকসান হবে। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের দক্ষ পরামর্শ আমি অগ্রাহ্য করতে চাইছি না। আপনি কি দয়া করে বিষয়টি বিবেচনা করে, যদি প্রয়োজন হয় পি. ডব্লিউ. ডি.-র সঙ্গে আলোচনা করবেন?

সবশেষে (যদিও এটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়) এখানে আমার বাস অস্থায়ী এবং পি. ডব্লিউ. ডি. যে স্থায়ী সংযোগের কথা বলেছে, মনে হয় সে কারণেও তার প্রয়োজন নেই।'

আপনার বিশ্বস্ত
সুভাষ সি. বোস

২০. ৯. ৪০

প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টের প্রতি

সুপারিনটেনডেন্ট
প্রেসিডেন্সি জেল
সমীপেষু

প্রিয় মহাশয়,

দুর্গাপূজা সংক্রান্ত নিয়মাবলী এবং নিষেধাদির বিষয়ে ডেপুটি জেলরের নোট আমি দেখেছি। দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

দুর্গাপূজার বিষয়ে যে সব ছাড় তা দেওয়া হয়েছিল' ১৯২৬ সালে মান্দালয়ের জেলে বাঙালি রাজবন্দিদের অনশন ধর্মঘটের পরে। সে সময়ে আমাদের পূজা করবার জন্য সম্পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল এবং সরকার একটি পূজা-ভাতাও দিয়েছিল, স্ব-আয়োজিত একটি মাত্র সংযম আমরা পালন করেছিলাম। যদিও আমাদের সংগীতবাদ্যের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, আমরা এ বিষয়ে সতর্ক ছিলাম যাতে যথা সম্ভব কম আওয়াজ করা হয়।

দুর্গাপূজা বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে,

(১) এটি দেশের এই অঞ্চলে হিন্দুদের বৃহত্তম জাতীয় উৎসব।

(২) এটি সম্মিলিত পূজা, সেই কারণে একে শুধু পূজা নয়, উৎসবও বলা হয়ে থাকে।

(৩) দুর্গাপূজার জন্য তিনজন পুরোহিত প্রয়োজন হয় তার মধ্যে একজন চণ্ডীপাঠের জন্য। দু'জনের কম দিয়ে কাজ চালানো শারীরিক ভাবেই অসম্ভব এবং দু'জনকে দিয়ে করাতে গেলেও একজন পুরোহিতের ওপর চণ্ডীপাঠের দায়িত্ব চাপাতে হয়। প্রায়ই তারা তাতে রাজি হন না। কেননা তাতে বড় বেশি চাপ পড়ে।

(৪) পূজার সময়ে নির্ঘণ্ট ঠিক হয় জোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত গাণিতিক হিসাব অনুযায়ী। যেমন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে সন্ধিপূজা তার অনুষ্ঠান হয় অষ্টমী তিথিতে, প্রায় প্রায়ই পূজার লগ্ন আসে গভীর রাত্রে (এ বছর সন্ধিপূজা কোন সময়ে হবে, আমি জানি না)

জেলের মধ্যে দুর্গাপূজা অনায়াসে সম্ভব হতে পারে একমাত্র যদি নিম্নলিখিত ছাড়গুলি দেওয়া হয়।

(১) যেহেতু দুর্গাপূজা সম্মিলিত ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, যে-সব হিন্দু কয়েদি চায় তাদের সকলকেই তাতে যোগদান করতে দেওয়া উচিত। এখানে বলা দরকার যে অলিপুর সেন্ট্রাল জেলে মুসলিম কয়েদিদের ঈদের সময় এবং ক্রিশ্চান কয়েদিদেরও ক্রিশ্চান উৎসবের সময়ে সে রকম সুযোগ দেওয়া হয়। যাই হোক সমস্ত হিন্দু কয়েদিদের যোগদান করতে না দেওয়ার কোনও কারণ নেই।

(২) অন্তত দু'জন পুরোহিত থাকতে দেওয়া উচিত।

(৩) তাঁদেরকে পঞ্জিকার গণনা অনুযায়ী সময়ে পূজা করতে দেওয়া উচিত, সে সময় যখনই হোক।

(৪) বাজনা-বাদ্য, যতটুকু ন্যূনতম প্রয়োজন, তার অনুমতি দেওয়া উচিত। বিশেষ করে আরতির সময়ে বাজনা অপরিহার্য। (আমাদের অবস্থানগত প্রশ্ন, যা নিয়ে এখন বিচার-বিবেচনা চলছে, তার সঙ্গে পূজা ভাতার বিষয়েও বিবেচনা করা উচিত।)

এই ছাড় যদি না দেওয়া হয়, কার্যত তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে সরকার জেলখানায় পূজা করতে দেয় না। এর ফলে ১৯২৬-এর পনেরো দিন অনশন ধর্মঘটের কষ্ট স্বীকার করে আমরা যে সুযোগ-সুবিধাগুলি লাভ করেছি অযৌক্তিকভাবে তা নাকচ করা হল। এর আরও অর্থ হবে, আমলা তন্ত্র যে সব সুযোগসুবিধা দিয়েছিল, জনপ্রিয় সরকার তা ফিরিয়ে নিল।

সে-পরিস্থিতির পরিণতি স্বাভাবিকভাষায় আমাদের পক্ষে গুরুতর হবে। দয়া করে আপনি ব্যাপারটা নিয়ে ভালভাবে চিন্তা করবেন এবং প্রয়োজন হলে উচ্চতম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

আপনার বিশ্বস্ত
সুভাষ সি. বোস

২০. ৯. ৪০

পুঃ দুর্গাপূজা আরম্ভ হয় চান্দ্রমাসের ষষ্ঠদিনে এবং শেষ হয় দশম দিনে কিন্তু পাঁচ দিনের মধ্যে চারটি দিন বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বঙ্গপ্রদেশের গৃহমন্ত্রীর প্রতি

মাননীয়
গৃহমন্ত্রী,
বঙ্গদেশ সরকার
সমীপেষু,

প্রিয় মহাশয়,

আমি এই বিষয়ের প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই যে, আমাকে নিয়ে বর্তমানে যে-দুটি বিচার চলছে, তাতে জনসাধারণকে অবাধে আদালতে আসতে দেওয়া হচ্ছে না। যদিও সাধারণ ভাবে জনসাধারণকে বোঝানো হচ্ছে যে বিচার চলছে প্রকাশ্যে, গোপনে নয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাকে এ বিষয়ে অবহিত করা হয় গতকাল, যখন আমি আমার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করলাম। না হলে নাগরিক হিসাবে আমার অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য ব্যবস্থা আগেই গ্রহণ করতাম।

সরকারকে এই দুটি কাজের একটি করতে হবে:

(১) সাধারণের কাছে ঘোষণা করা যে, বিচার চলবে গোপনে, এবং তারপরে জনসাধারণকে তা থেকে দূরে রাখা। সে ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারব আমাদের কী করা দরকার।

(২) প্রকাশ্যে বিচার করা এবং জনসাধারণকে অবাধে আদালতে আসতে দেওয়া।

কিন্তু সরকার যেন প্রকাশ্য বিচার করছে, এই ভাব দেখিয়ে, প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণকে

তার বাইরে রাখতে পারে না। গাছেরও খাব, তলারও কুড়োব, তা হয় না।

আমি একটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টান্তের কথা জানি। আমার এক নিকট আত্মীয় এক প্রধান নেতার বিচার করছিলেন। পুলিশ চেয়েছিল সাধারণ মানুষকে বাইরে রাখতে, কিন্তু তিনি তা করতে দেননি। তখন পুলিশ অজুহাত দিল, আদালতে অত জায়গা নেই। তখন বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট বাইরে গিয়ে একটি গাছের তলায় আদালত বসিয়ে জনসাধারণকে অবাধে প্রকাশ্য বিচার দেখতে দিলেন। এই রকম মনোভাবের দ্বারাই একজন পাবলিক সারভেন্টের উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত। কেননা জনসাধারণের কাজ যিনি করেন, তিনি বড়ই হন আর ছোটই হন তাঁর উচিত নয় পুলিশের আদেশ মেনে চলা।

পুলিশ সাধারণ মানুষকে অবাধে আদালতে প্রবেশ করতে দেয় না। এই কথা আমি অবিশ্বাস করি না, কারণ ব্যাঙ্কশাল কোর্টে আমি নিজে একজন পুলিশ সারজেন্টের দ্বারা অপমানিত হয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত তাঁর সম্বিৎ ফিরে এসেছিল। কারণ আমি তেড়ে উঠেছিলাম এবং আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়েছিলাম।

পুলিশের হস্তক্ষেপের জন্য বিচারে উপস্থিত থাকতে আমার আত্মীয়দের অত্যন্ত অসুবিধা হচ্ছে। এ আমার অসহ্য মনে হয়, যে, জনসাধারণ, যাদের মধ্যে আমার আত্মীয়রাও আছেন, যাঁরা আদালতে থাকতে চান, সামান্য একজন সার্জেন্ট কিংবা তার সমকক্ষ লোকেরা তাঁদেরকে অপমান করবেন।

যতক্ষণ না বিষয়টির এমন মীমাংসা হচ্ছে যা আমার কাছে সন্তোষজনক, এ মাসের ৩ এবং ২৮ তারিখে যথাক্রমে ব্যাঙ্কশাল কোর্ট এবং আলিপুর কোর্টে হাজির হতে আমি অস্বীকার করছি। যে সব জিনিস আমরা আমলাতন্ত্রের জমানায় সহ্য করিনি, তা জনপ্রিয় মন্ত্রীসভার শাসনকালে করব না। অবশ্য এর যা ফল সে যত অপ্রিয় ও কষ্ট করই হোক, আমি তা ভোগ করব।

বিষয়টি জরুরি হিসাবে দেখবেন, কারণ আদালতে হাজির হওয়ার পরবর্তী তারিখ ৩।

আপনার বিশ্বস্ত
সুভাষ সি. বোস

প্রেসিডেন্সি জেল
১.১০.৪০

মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি

বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট
আলিপুর
সমীপেষু

প্রিয় মহাশয়,

এ মাসের ১ তারিখ আমি মাননীয় গৃহমন্ত্রীকে একখানি পত্র দিয়েছিলাম, আলিপুর এবং

ব্যাঙ্কশাল কোর্টে আমার বিচারে উপস্থিত থাকতে ইচ্ছুক জনসাধারণ (যাঁদের মধ্যে আমার আত্মীয়রা আছেন) তাঁদের ওপরে পুলিশের হস্তক্ষেপের বিষয়ে। তারপর আমি সরকারের কাছ থেকে, এই জেলের সুপারিনটেনডেন্টের মারফত খবর পেয়েছি যে, আমার অভিযোগের কারণ দৃঢ় করবার জন্য সরকার নির্দেশ দিয়েছে। আমি আশা করব, আপনার যতদূর ক্ষমতা, আপনি দয়া করে দেখবেন যেন, আমার বিচারের সময়ে কর্তব্যরত পুলিশ যথোচিত আচরণ করেন।

প্রেসিডেন্সি জেল
২২.১০.৪০

আপনার বিশ্বস্ত
সুভাষ সি. বোস

বঙ্গদেশের গৃহমন্ত্রীর প্রতি

মাননীয় গৃহমন্ত্রী
বঙ্গ সরকার
সমীপেষু

প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্ট মারফত

প্রিয় মহাশয়,

আমি প্রায় চার মাস জেলে আছি ''ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া'' আইনের একটি ধারায়, যাতে আদালতে বিচারের প্রয়োজন হয় না। উপরন্তু আমি বিগত দু' মাস বিচারাধীন বন্দি হয়ে আছি। উক্ত আইনের একটি ধারায় বিচারাধীন বন্দিত্ব এবং আরেকটি ধারায় অভিযুক্ত হওয়া, এতে সরকারি আদেশ এবং বিচার পদ্ধতি, এই দুইয়ের এমন এক সংমিশ্রণ ঘটানো হয়, যার শুধু যে কোনও নজির নেই, তা নয়, সেটা স্পষ্টত বেআইনি এবং অন্যায়।

(২) অধিকন্তু, যখন বিচারক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জামিনের আবেদন করা হয়েছিল, পাবলিক প্রসিকিউটর তার বিরোধিতা করেন। ধরে নেওয়া যেতে পারে, স্থানীয় সরকারি নির্দেশক্রমে। তার ফলে জামিন দেওয়া হয়নি। বিচার পদ্ধতির মধ্যে সরকারি হস্তক্ষেপের এটি নিদর্শন, এই হস্তক্ষেপ আরও আপত্তিজনক এই কারণে যে, স্থানীয় সরকারের, ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া আইনে মামলার বিষয়ে ভারত সরকারের নির্দেশগুলি কার্যকর করছে না।

(৩) আমার যখন বিচার চলছে, এইভাবে আমাকে বলপূর্বক জেলে বন্দি করে রাখা অন্যায় এবং বেআইনি। একবার যখন অপরাধের জন্য একটি আদালতে পেশ করা হয়েছে, আইনকে তার নিজের পথে চলতে দেওয়া উচিত। কী করে আমাকে একই ডি. আই. আইনে বিনা বিচারে আবার কারারুদ্ধ করা যায়?

(৪) এইসব যে একটি জনপ্রিয় মন্ত্রীসভার শাসনাধীনে ঘটছে সেটা বিস্ময়কর ও বেদনাদায়ক। আমি লক্ষ করছি, এই একই মন্ত্রীসভা, ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী, বিশেষ করে যখন তারা মুসলিম লীগের সদস্য তাদের ক্ষেত্রে কী করেছে। এর বহুসংখ্যক দৃষ্টান্ত গভর্নমেন্টকে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, তার চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখতে পাই ঢাকা জেলার মুরাপাড়ার

মৌলবির আকস্মিক কারামুক্তিতে। এইরকম প্রত্যেকটি দৃষ্টান্ত আমি লক্ষ করছি।

(৫) এইসব কারণে এবং আরও অনেক ঘটনা অনুযায়ী গভর্নমেন্টের উচিত আমাকে এখনই মুক্তি দেওয়া। ভারতীয় বিধানসভায় আমার নির্বাচনের ফলে এরও প্রয়োজন রয়েছে, আমি যেন তার অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারি। যার শুরু হচ্ছে ৫ নভেম্বর, যদি অবশ্য আমার স্বাস্থ্য তার বাধা না হয়। ব্রহ্ম গভর্নমেন্ট যদি একজন দোষী-সাব্যস্ত কয়েদিকে বিধানসভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকার অনুমতি দিয়ে থাকতে পেরে থাকে, একজন, যে দোষী সাব্যস্ত কয়েদি নয়, তাকে বঙ্গদেশের জনপ্রিয় গভর্নমেন্ট কি অনুরূপ সুযোগ দিতে পারে না?

(৬) সর্বশেষে বলি (যদিও এটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়) আমার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থায় আমাকে বন্দি করে রাখা, সরকারের তরফে আমার প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরণ ছাড়া কিছু নয়, যার কোনও ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাই না।

এই পত্রটি লেখা হল অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এবং আমার প্রার্থনা, এটি যেন যথাযোগ্যভাবে বিবেচনা করা হয়।

প্রেসিডেন্সি জেল
৩০.১০.৪০

আপনার বিশ্বস্ত
সুভাষ চন্দ্র বোস

প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টের প্রতি

সুপারিনটেনডেন্ট
প্রেসিডেন্সি জেল
সমীপেষু,

প্রিয় মহাশয়,

আজ আমি মাননীয় গৃহমন্ত্রীকে আমার জেলে বন্দি হয়ে থাকা নিয়ে একটি পত্র দিয়েছি। আমার ইচ্ছা, ওই চিঠিটির সঙ্গে, আমার কারাবাসের আদেশ প্রত্যাহার না করার ফল আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে কী হতে পারে, সে-বিষয়েও সরকারকে অবহিত করা হক। সেইজন্য আমি এই পত্র আপনাকে লিখছি, এই অনুরোধ জানিয়ে, আপনি দয়া করে এর বিষয়বস্তু সরকারের গোচরে আনবেন, যতটা সম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করে। আমি পত্রটি আপনাকে বন্ধ খামে পাঠাচ্ছি, যাতে আর কারও এটি দেখবার দরকার না হয়। এ-চিঠি কোনও হুমকি নয়, এবং আমি আশা করি সে-হিসাবে এটি গ্রহণ করা হবে না। আমার পক্ষে অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে এমন কয়েকটি ঘটনা আপনাকে খোলাখুলি জানানোই এর উদ্দেশ্য।

মাননীয় গৃহমন্ত্রীকে লেখা আমার পত্রে যে-বিষয়ে বিবেচনার কথা বলা হয়েছে, কিংবা আভাস দেওয়া হয়েছে, গভর্নমেন্টে তার কোনও প্রতিক্রিয়া হবে বলে আমি মনে করি না। সেই কারণে বিগত দু'মাস ধরে ভাবছি, আমার কী করা উচিত। একটি অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদ জানানো ছাড়া এবং সেই প্রতিবাদের প্রমাণ স্বরূপ স্বেচ্ছায় অনশন

করা ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই, ''জনপ্রিয়'' মন্ত্রীসভার ওপর এই উপবাসের কোনও প্রভাব পড়বে না। কেন না আমি মুরাপাড়ার সেই মৌলবিও নই, ধর্মে মুসলমানও নই, তার ফলে আমার ক্ষেত্রে এই অনশন আমৃত্যু অনশন হবে। আমি জানি তাতেও গভর্নমেন্টের কোনও হেলদোল হবে না, এবং ''জনপ্রিয়'' মন্ত্রীসভা, সব আমলাতান্ত্রিক সরকারের মতো, সরকারি মর্যাদার প্রশ্ন তুলবে এবং গভর্নমেন্টকে অনশন করে কোনও কাজে বাধ্য করা যায় না— এই অতি পরিচিত যুক্তিটি দেখানো হবে। ইংল্যান্ডে কর্কের লর্ড মেয়র টেরেন্স ম্যাকস্উইনি যখন এই রকম একটি বিষয় নিয়ে অনশন করছিলেন আমি তখন সে-দেশে ছিলাম। সারা দেশ তাতে বিচলিত হয়ে পড়েছিল, পার্লামেন্টের সমস্ত দল এবং হিজ ম্যাজেসটি রাজাও দৃশ্যত বিচলিত বোধ করেছিলেন। কিন্তু লয়েড জর্জের সরকার অনড় হয়ে ছিল। তার ফলে রাজাকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হয়েছিল, ক্যাবিনেটের মনোভাবের জন্য তিনি রাজকীয় বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে অক্ষম। এসব কথা আমি বলছি শুধু আপনাকে এবং সরকারকে বিশ্বাস করানোর জন্য যে সমগ্র পরিস্থিতি আমি ঠান্ডা মাথায় যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখেছি, এবং হালকা ভাবে আমি বিষয়টিকে নিইনি।

কাজেই যদিও আমি আশা করি না আমার অনশনের বিশেষ কোনও ফল হবে, এই একটা সান্ত্বনা আমার থাকবে যে, গভর্নমেন্টের একটি অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছি। ব্রিটিশেরা, এবং ব্রিটিশ সরকার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের উচ্চ আদর্শ তুলে ধরার কথা বলছে, কিন্তু নিজেদের বেলায় তাদের নীতি ওই সব আদর্শের বুলিকে অস্বীকার করছে। নাৎসিবাদ ধ্বংস করতে তারা আমাদের সহায়তা চায়, কিন্তু নিজে তারা নাৎসিবাদের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। আমার প্রতিবাদ অনাবৃত করে দেবে এই হতভাগা দেশে তাদের নীতির এবং একটি প্রাদেশিক সরকারের নীতির, ভন্ডামি, যারা বলে তারা ''জনপ্রিয়'' কিন্তু বাস্তবে তাদের মনে একমাত্র তখনই কোনও সাড়া জাগানো যায়, যখন কোনও মুসলমান তার সঙ্গে জড়িত থাকে। আমার আরও একটি সন্তোষের কারণ, এই প্রসঙ্গে বলি, আমার অনশন এবং তার ফলে যা যা ঘটেছে, তার প্রভাব ভারতের বাইরেও পড়বে, কারণ আমি সেই ভারতীয়দের অন্যতম, দেশের সীমার বাইরেও যাদের লোক জানে।

ভেবে দেখবার আর একটিমাত্র বিষয় হল যে, রোগের যে চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে সেটা রোগের চেয়েও খারাপ কি না এবং আমি অনেক দিন অনেক রাত্রি তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছি। এ প্রশ্নে আমার উত্তর, বর্তমান অবস্থায় বেঁচে থাকার কোনও মূল্য নেই। এই মরণশীল বিশ্বে সবই শেষ হয়ে যায় একমাত্র নীতি ছাড়া, এবং সেইসব নীতি বেঁচে থাকে, একমাত্র যদি লোকে তার জন্য প্রাণ দিতে ইতস্তত করে না। যদি এক-একজন করে মানুষ নীতির জন্য আত্মবলিদান দেয়, সে নীতির মৃত্যু হয় না। অন্যদের মধ্যে বেঁচে থাকে। তাঁদের দুঃখযন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে আদর্শ সফল ও বিকশিত হয়ে ওঠে। ঠিক যেমন একটি প্রাণী আরেকটি প্রাণীর জন্ম দেয়, তেমনি একটি জাগ্রত সত্তা, আরেকটি জাগ্রত সত্তার জন্ম দেয়। সেই কারণ, আমার মধ্যে মূল্যবান যদি কিছু থেকে থাকে, আমার মৃত্যুতে আমার দেশ, বা মানবজাতির কোনও ক্ষতি হবে না। বরং, ঈশ্বর যদি চান, তারা উচ্চতর নৈতিক স্তরে আরোহণ করবে, কারণ যে যাই বলুন, মহত্তম যে ত্যাগ আমরা করতে পারি, তা হল আরেকজনের জীবন না নিয়ে নিজের জীবন দান করা।

শেষ করার আগে আর একটি কথা। দীর্ঘকাল আমি কারাবাস করেছি, অনশনও করেছি। অনশন সত্যাগ্রহকে বিফল করবার জন্য অত্যুৎসাহী পুলিশ আফিসারেরা কখনও কখনও

যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন আমি জানি। স্বভাবতই আমি আগে থেকেই তার জন্য প্রস্তুত থাকব। তা ছাড়া আমি জোর করে খাওয়াতে দেব না, আমাকে খাদ্য গ্রহণে বাধ্য করার নৈতিক অধিকার কারও নেই। এই বিষয়টি ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সঙ্গে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়েছিল টেরেন্স ম্যাকস্উইনির বেলায় এবং তার পরবর্তীকালে, ১৯২৬ সালে আমাদের অনশন ধর্মঘটের সময়, ভারত সরকারের সঙ্গে। জেল কোডের ধারা অনুযায়ী অন্য কোনও সারকুলার যা তার পরে কোনও সময়ে জারি করা হয়েছে, আমার ওপরে তার কোনও বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

আমি আবার বলছি, কালীপুজোর পুণ্য দিনে লিখিত এই পত্রটিকে চরমপত্র জ্ঞান করা উচিত হবে না। এ শুধু একজন ব্যক্তির নিজের বিশ্বাসের বিবৃতি অত্যন্ত বিনয় সহকারে রচিত। অতএব এটিকে একটি গোপনীয় নথি হিসাবে ব্যবহার করা উচিত, গভর্নমেন্টের কাছে যা গোপনে পাঠানো দরকার। আমি শুধু চাই সরকার জানুক আমার মনে কী আছে, যাতে তারা আমার উদ্দেশ্য এবং তার পরিণতি আমার জন্য কী হতে পারে, উপলব্ধি করতে পারেন।

আমার প্রতি আপনি একভাবে যে সৌজন্য প্রদর্শন করে আসছেন, তার জন্য ধন্যবাদ।

প্রেসিডেন্সি জেল
৩০.১০.১৯৪০

আপনার বিশ্বস্ত
সুভাষ চন্দ্র বোস

ভারতীয় আইনসভার সভাপতিকে

মাননীয় প্রেসিডেন্ট
ভারতীয় আইনসভা
নিউ দিল্লি
সমীপেষু,

মহাশয়,

আমি সদ্য ঢাকা বিভাগ নির্বাচক মণ্ডলী কর্তৃক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছি। আপনি বোধহয় অবগত আছেন, ২ জুলাই, ১৯৪০ থেকে আমি ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া আইনের ২৬ ধারায় বিনা বিচারে জেলে বন্দি আছি। উপরন্তু, এই বিনাবিচারে বন্দি থাকা ছাড়া, ডি. আই. রুলের অন্য একটি ধারায় আমার নামে মামলা করা হয়েছে, এবং তার ফলে আমি বিচারাধীন বন্দি ছ'মাস ধরে। আমার পক্ষে যে জামিনের আবেদন করা হয়েছে বিচারক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে, তাও সরকারি মুখপাত্রের বিরোধিতায় কাল অগ্রাহ্য হয়েছে।

সাংবিধানিক আইনের বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী আইনসভায় অধিবেশনের সময়ে আমাকে গ্রেপ্তার ও আটক বে-আইনি বলে আমি দাবি করছি, এবং সেই কারণে আমি অনুরোধ করছি দয়া করে পদক্ষেপ গ্রহণ করুন, যাতে আমি নিউ দিল্লিতে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যে অধিবেশন আরম্ভ হবে তাতে উপস্থিত থাকতে পারি।

আমার এই দাবির বিরুদ্ধে এই যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে উপরোক্ত নিষেধের স্পষ্ট উল্লেখ আইনের কোনও ধারায় নেই। আমার নিবেদন, যে-কোনও সংবিধানের উপরোক্ত অধিকার নিহিত এবং ভারতীয় সংবিধান তার ব্যতিক্রম হতে পারে না।

মহাশয়, আপনি হয়তো জানেন, সম্প্রতি একজন সাজাপ্রাপ্ত বন্দি যিনি ব্রহ্মদেশের আইন সভার সদস্য তাঁকে সেই সভায় অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে দেওয়া হয়েছিল। নিশ্চয়ই, আমি যখন সাজাপ্রাপ্ত বন্দি নই, তার চেয়ে, কম কিছু আমি দাবি করতে পারি না।

এ বিষয়ে আপনি শীঘ্র ব্যবস্থা নিলে আমি বাধিত হব।

প্রেসিডেন্সি জেল
কলকাতা
১.১১.৪০

আপনার
সুভাষ সি. বোস

অনুলিপি প্রেরিত
মাননীয় ডেপুটি প্রেসিডেন্ট
ভারতীয় আইনসভা

প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টের প্রতি

সুপারিনটেনডেন্ট
প্রেসিডেন্সি জেল
সমীপেষু,

প্রিয় মহাশয়

গত ৩০ অক্টোবর, কালীপূজার দিন আমি আপনাকে যে গোপন পত্রটি লিখছিলাম আশা করি আপনি সেটি ঠিকমতো গভর্নমেন্টের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই পত্রটি তারই অনুসারী এবং দুটি পত্রই, একই তারিখে অর্থাৎ ৩০ অক্টোবরে, মাননীয় গৃহমন্ত্রীকে লিখিত পত্রের সঙ্গে একই সঙ্গে পড়তে হবে।

(২) আমি আপনাকে পত্র লেখার পর পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, এম এল এ ভারতীয় আইনসভায় যে মুলতুবি প্রস্তাবটি পেশ করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গে, ভারত সরকার পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, আমার গ্রেপ্তার এবং জেল হওয়ার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বঙ্গদেশের সরকারের, যে সরকার তার সমর্থকদের দাবি অনুযায়ী একটি ''জনপ্রিয়'' মন্ত্রীসভা দ্বারা পরিচালিত। এও পরিষ্কার যে এই ''জনপ্রিয়'' সরকার আমার সঙ্গে যে-রকম ব্যবহার করেছে এ-দেশে তার কোনও নজির নেই, এবং ডি. আই. আর. সংক্রান্ত ভারত সরকারের নির্দেশাবলী লঙ্ঘন করেছে। আমার পক্ষে এটা বেদনাদায়ক যে, 'জনপ্রিয়' গভর্নমেন্ট ডি. আই. আইন সমূহ ব্যবহার করছে ভারতকে রক্ষা করবার জন্য নয়, একটি কর্মপদ্ধতিকে সুরক্ষিত করতে যা একাধারে বেআইনি এবং অন্যায়।

(৩) গতকাল যখন আমার আইনজ্ঞ জামিনের জন্য দরখাস্ত করেন, বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট দরখাস্ত মঞ্জুর করেন, কিন্তু বলতে বাধ্য হন যে তাঁর আদেশ অকার্যকর, ডি. আই. আইনের ২৬ ধারায় সরকার আমাকে বিনা বিচারে আটক করার কারণে। বিচার-পদ্ধতিতে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের এর চেয়ে নগ্ন দৃষ্টান্ত আমি কল্পনা করতে পারি না। ডি. আই. আইনগুলি পাশ করা হয়েছিল কি ভারতকে রক্ষা করার জন্য, না এই রকম বে-আইনি কাজ এবং অবিচারকে সুরক্ষিত করার জন্য?

(৪) আমি দুঃখিত যে এই সরকার আরেকটি অন্যায় কাজ করেছে, ভারত সচিবকে আমার গ্রেপ্তারি ও আটক সম্পর্কে ভুল তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে, ইতিমধ্যেই জানা গেছে, মি. সোরেনসেনের প্রশ্নের জবাবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভারত সচিব হাউস অব কমন্সে ঘোষণা করেছেন হলওয়েল মনুমেন্ট সংক্রান্ত ঘটনার জন্য আমাকে কয়েদ করা হয়েছে। সমগ্র সত্যটি যদি বলা হত ইংল্যান্ডে এ নিয়ে আরও কিছু কথাবার্তা হত, কেন না সেদেশে আমার বন্ধুরা আছেন পার্লামেন্টে এবং জনসাধারণের মধ্যেও।

(৫) আমি যেটা মনে করি আমার আইনত অধিকার তাকে যথার্থ প্রতিপন্ন করার জন্য আমার একটি রাস্তাই খোলা আছে, নৈতিক প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে সন্তুষ্ট থাকা, কারণ আর সমস্ত দরজা 'জনপ্রিয়' সরকার আমার মুখের ওপর বন্ধ করে দিয়েছে। অতএব, আপনাকে ৩০ অক্টোবর যেমন জানিয়েছি, এবং কাল পূজার দিন আমি যা প্রতিজ্ঞা করেছি, সেই অনুযায়ী অবিলম্বে আমি আমার অনশন আরম্ভ করব। সঠিক তারিখ যথাসময়ে সরকার যথারীতি জানাব কিন্তু সে-কাজ আমি করব অনশন আরম্ভ করবার অব্যবহিত পূর্বে। অনেক দিন আগে গত মাসের ৩০ তারিখ আমি চিঠি দিয়েছি, কাজেই সরকার যথেষ্ট সময় থাকতেই নোটিস পেয়েছে।

এ চিঠি আপনি গোপনীয় মনে করলে এবং দয়া করে সরকারের কাছে সেই ভাবে যথা শীঘ্র সম্ভব পাঠালে আমি বাধিত হব।

প্রেসিডেন্সি জেল
১৪.১১.১৯৪০

আপনার বিশ্বস্ত
সুভাষ চন্দ্র বোস

বঙ্গপ্রদেশের রাজনৈতিক বিভাগীয় সেক্রেটারির প্রতি

১৬.১১.১৯৪০

সেক্রেটারি
বঙ্গ-সরকার
রাজনৈতিক বিভাগ
সমীপেষু

প্রিয় মহাশয়,

আমি জানতে পেরেছি, ২৯ অক্টোবর এম. এল. এ. শ্রী বি. পি. পাইনকে লেখা আমার একটি পত্র স্পেশাল ব্রাঞ্চ ধরে রেখেছে। আমি বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করতে আপনাকে অনুরোধ করছি।

গতকাল আমি তিনটি চিঠি লিখেছি— মি. আর্থার গ্রিনউড এম পি, মি. শরৎচন্দ্র বোস (কলকাতা) এবং মি. এ. এন. বোস. (লন্ডন)-কে। তার কোনও একটি যদি ধরে রাখা হয়ে থাকে, আমি বঙ্গ গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন করব, এবং বঙ্গ গভর্নমেন্ট যদি স্পেশাল ব্রাঞ্চের উক্ত কাজ সমর্থন করে, আমি ভারত গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন কর।

আপনির বিশ্বস্ত
সুভাষ সি. বোস

বঙ্গদেশের মাননীয় গভর্নর, মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার উদ্দেশে:
'আমার রাজনৈতিক বিবৃতি'

হিজ় একসেলেন্সি বঙ্গদেশ গভর্নর—
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
এবং
মন্ত্রীসভা

ইওর একসেলেন্সি এবং ভদ্রমহোদয়গণ

আমি এই পত্র লিখছি মাননীয় মন্ত্রীর প্রতি লিখিত ৩০ অক্টোবর ১৯৪০-এর পত্র (মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত) এবং প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টের কাছে লিখিত ৩০ অক্টোবর এবং ১৪ নভেম্বরের পত্র যেগুলো যথাসময়ে সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল সেই সব পত্রের সম্পর্কে। এই পত্রে আমি লিখিতভাবে পেশ করব আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুতর পদক্ষেপ কোন কোন কারণে আমি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি।

আমার এমন কোনও আশা এখন আর নেই যে আপনার কাছে আমি সুবিচার পাব। তাই আমি দুটিমাত্র অনুরোধ করব, যার দ্বিতীয়টি এই পত্রের শেষে থাকবে। আমার প্রথম

অনুরোধ, এই পত্রটি যেন সযত্নে সরকারি লেখ্যাগারে রক্ষিত থাকে। যাতে আমার দেশবাসী, যাঁরা আপনাদের পরে গভর্নমেন্টে আসবেন তাঁরা এই পত্র হাতে পান। দেশবাসীর জন্য এতে একটি বার্তা আছে। সেই কারণে এটি একটি রাজনৈতিক ঘোষণাপত্র।

ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া আইনের ১২৯ ধারায় কোনও ব্যাখ্যা ছাড়া এবং কারণ না দেখিয়ে বঙ্গদেশ সরকারের আদেশ অনুযায়ী ২ জুলাই ১৯৪০-এ আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে প্রথম ব্যাখ্যাটি পরবর্তী কালে এসেছে ভারত সচিব মি. এমারির কাছ থেকে। তিনি হাউস অব কমন্সে পরিষ্কার বলেন, আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কলকাতার হলওয়েল মনুমেন্টের ধ্বংসের জন্য আন্দোলনের ব্যাপারে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বঙ্গীয় আইনসভায় এক অধিবেশনে এই বিষয়ে কার্যত সমর্থন করেন, বলেন হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলনই আমার মুক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গভর্নমেন্ট যখন হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাকে যাকে আটক করা হয়েছিল তাঁদের সকলকেই মুক্তি দেওয়া হয়, ব্যতিক্রম নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী এম. এল. এ, এবং আমি। তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয় আগস্ট ১৯৪০-এর শেষের দিকে, এবং প্রায় একই সঙ্গে, ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া আইনের ১২৯ ধারা, যাতে কেবলমাত্র অস্থায়ী বন্দিত্বের ব্যবস্থা ছিল, তার বদলে ওই আইনের ১২৬ ধারায় আমাকে স্থায়ীভাবে আটক রাখার আদেশ জারি করা হয়।

আশ্চর্যের বিষয়, ২৬ ধারায় নতুন আদেশের সঙ্গেই খবর এল যে আমার নামে ডি. আই. আইনের ৩৮ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে দু' জন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে, আমার তিনটি বক্তৃতায় জন্য এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা ''ফরওয়ার্ড ব্লক''-এ আমি যে সম্পাদক ছিলাম তাতে আমার তিনটি প্রবন্ধর জন্য। তিনটি বক্তৃতার মধ্যে দুটি দিয়েছিলাম ১৯৪০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে এবং তৃতীয়টি এপ্রিলের প্রথমে। এইভাবে আগস্টের শেষ দিনে, ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া আইনের একটি ধারায় বিনা বাধায় আমাকে স্থায়ীভাবে আটক করে, এবং একই সঙ্গে ওই আইনের আরেকটি ধারায় আমার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু করে গভর্নমেন্ট একটি নজিরবিহীন অনন্য সাধারণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। প্রশাসনিক আদেশ এবং বিচার বিভাগীয় পদ্ধতির এইরকম সংযোগ আমি আগে কোনওদিন দেখিনি। এরকম কাজ স্পষ্টত বেআইনি এবং অন্যায়, এতে বিশুদ্ধ প্রতিহিংসাপরায়ণতার গন্ধ পাওয়া যায়।

এটা চোখে না পড়ে উপায় নেই, মামলা রুজু করা হয়েছিল তথাকথিত অপরাধের ঘটনার অনেক দিন পরে। আরও লক্ষণীয়, ''ফরওয়ার্ড ব্লক''-এ সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধের জন্য পত্রিকাটিকে আগেই শাস্তি দেওয়া হয়েছে, সিকিউরিটি ডিপোজিট ৫০০ টাকা বাজেয়াপ্ত এবং আরও ২০০০ টাকা জমা দেওয়ার দ্বারা। উপরন্তু পত্রিকাটির ওপর আক্রমণ করা হয় অকস্মাৎ, সরকারি নীতি অনুযায়ী যে সতর্কতা জারি করা হয় তা না করেই, অনেকদিন পরে।

বঙ্গ সরকারের মনোভাব আরও প্রকট হল যখন দু'জন বিচারক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আমার জামিনের দরখাস্ত করা হল। সরকারি মুখপত্র দুটি আবেদনেরই জোরালো বিরোধিতা করলেন। দ্বিতীয় দরখাস্তের সময় একজন ম্যাজিস্ট্রেট মি. ওয়ালি-উল ইসলাম জামিনের দরখাস্ত মঞ্জুর করলেন, কিন্তু বাধ্য হয়ে জানালেন, তাঁর আদেশ অকার্যকর থাকবে যতদিন না সরকার ২৬ ধারায় আমার আটকের আদেশ প্রত্যাহার করে। কাজেই এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে, সরকারের লক্ষ হল বিচার সংস্থা সমূহের কাজের স্বাধীনতা খর্ব করা ও আইনের শাসনে হস্তক্ষেপ করা। স্থানীয় সরকারের কাজ আরও আপত্তিকর মনে হয় যখন

মনে পড়ে এইসব ব্যাপারে ভারত সরকারে নির্দেশাবলী অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

সরকারের কর্মরীতির আরেকটি যে দিক উল্লেখযোগ্য মনে হয়, একই সঙ্গে আমার নামে দু'জন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মামলা রুজু করা হয়েছে, উদ্দেশ্য যদি এই ছিল যে, আদালতে আমার একাধিক বক্তৃতা পেশ করা হবে, সেকাজ দু'জন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে না গিয়েও অনায়াসে করা যেত, কেন না বিগত বারো মাসে কলকাতা শহরের মধ্যেই আমি প্রচুর সংখ্যক বক্তৃতা দিয়েছি। একজন সাধারণ লোক অতএব মনে করতে বাধ্য যে আমাকে যাতে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তার জন্য সরকার এত ব্যগ্র, যে যদি একটা মামলা না হয়, সেই ভয়ে তারা দুটো মামলা রুজু করেছে।

পরিশেষে (এটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়) একজন নিরপেক্ষ মানুষের মনে হবে সরকারের কাজ অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত, কারণ অভিযোগ সংক্রান্ত কার্যাবলী তথাকথিত দোষাবহ কাজের এতদিন পরে শুরু করা হয়েছে। যেসব কাজ অভিযোগের কারণ, সত্যিই যদি সেগুলো দোষাবহ হয়ে থাকে, সরকারের অনেক আগেই পদক্ষেপ করা উচিত ছিল, অর্থাৎ যে-সময়ে সেসব কাজ করা হয়েছিল তখনই।

আমি কি আপনাকে অনুরোধ করতে পারি, এক মুহূর্তের জন্য আমার মতো লোকের প্রতি আপনার মনোভাব এবং যেসব মুসলিম ভারত প্রতিরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হয়েছেন সেই সব মুসলিমের প্রতি আপনার মনোভাব তুলনা করে দেখুন। ডি. আই. আইনে আটক হয়েছেন, এবং হঠাৎ কোনও কারণ বা যুক্তি ছাড়াই মুক্তি পেয়েছেন মুসলিমদের ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা এ পর্যন্ত কতগুলি ঘটেছে? মুরাপাড়ার মৌলবির দৃষ্টান্ত লোকের মনে এখনও এত টাটকা যে তার বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। আমাদের কি বুঝতে হবে, আপনার শাসনে মুসলিমদের জন্য একটা আইন তার হিন্দুদের জন্য আরেকটা আইন এবং কোনও মুসলিম যখন জড়িত ডি. আই. আইনের অর্থ আলাদা? তাই যদি হয় সেই মর্মে সরকারের একটা ঘোষণা করলেই পারেন।

এ যুক্তি যদি দেখানো হয়, কিংবা একথা বলা হয় যে, আমার কারারুদ্ধ হওয়ার জন্য ভারত সরকার দায়ী, প্রাদেশিক সরকার নয়, আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে পারি, এই সেদিন ভারতীয় বিধানসভায় আমার বিষয়ে পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মিশ্রর একটি মুলতুবি প্রস্তাব প্রসঙ্গে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, বিষয়টি কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদে আসা উচিত নয়, কারণ আমাকে জেলে পাঠিয়েছে বঙ্গদেশ সরকার। আমার বিশ্বাস ওইরকমই একটি স্বীকারোক্তি মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে বঙ্গীয় আইনসভাতেও করা হয়েছিল।

এবং এও আমরা ভুলতে পারি না যে বঙ্গদেশে আমরা একটি "জনপ্রিয়" সহৃদয় মন্ত্রীসভার পক্ষপুটে সুরক্ষিত।

ভারতীয় বিধানসভায় আমার সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলে আরও একটি প্রশ্ন ওঠে। আইনসভার অধিবেশনকালে আইনসভার সদস্যদের "অগ্রেপ্তারযোগ্যতা" সংক্রান্ত এই অধিকার প্রত্যেকটি সংবিধানে অন্তর্নিহিত, আইনে তার স্পষ্ট উল্লেখ থাক আর না থাক, এবং এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর। অতি সাম্প্রতিক কালে বর্মীয় সরকার একটি দোষী সাব্যস্ত বন্দিকে বর্মার আইনসভায় উপস্থিত হতে অনুমতি দিয়েছিল, অথচ আমি দোষী সাব্যস্ত না হওয়া সত্ত্বেও আমাদের জনপ্রিয় মন্ত্রীসভা আমাকে সে-অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন।

সরকারের পক্ষ সমর্থনকারীরা যদি এম. পি. ক্যাপ্টেন র‍্যামজের নজির হাজির করবার

চেষ্ট করেন, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর নামে গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে, কিন্তু আমরা সমস্ত তথ্য অবগত না হওয়ার দরুন, সপক্ষে কিংবা বিপক্ষে কিছু বলা কঠিন, একটা কথা যদিও বলাই যায়, ক্যাপ্টেন র‍্যামজেকে যদি অন্যায়ভাবে জেলে দেওয়া হয়ে থাকে, এবং শেষপর্যন্ত কোনও সুরাহা না হয়, মি. কেনেডি (গ্রেট ব্রিটেনে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত) এবং অন্যেরা যা বলেছেন বলে জানা গেছে অর্থাৎ, ইংল্যান্ডে গণতন্ত্রের মৃত্যু হয়েছে, তাতে সেটাই সমর্থিত হবে। যাই হোক, ক্যাপ্টেন র‍্যামজে হাউজ অব কমন্সের কমিটির দ্বারা তাঁর বিষয়টি পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

আমার বিষয়টি নিয়ে সাধারণভাবে কিছু করা গেলে, দুটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বিবেচনা করে দেখতে হবে। প্রথমত ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া আইনগুলো পিছনে জনসমর্থনের কিংবা নৈতিকতার কোনও গ্রহণযোগ্যতা আছে? দ্বিতীয়ত, সেইসব আইনে যা আছে, আমার ক্ষেত্রে কি তার যথার্থ প্রয়োগ হয়েছে? দুটি ক্ষেত্রেই উত্তর, না।

ভারত প্রতিরক্ষা আইন সমূহের পিছনে কোনও নৈতিক মান্যতা নেই, কারণ মানুষের মৌলিক গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা সে-সব আইন অমান্য করে। উপরন্তু ওইসব সাধন মূলত যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা এবং সকলই জানে ভারতকে যুদ্ধরত শক্তি হিসাবে ঘোষণা করা হয় জোর করে যুদ্ধে নামানো ভারতবাসীর অথবা ভারতীয় আইনসভার সম্মতি ব্যাতিরেকে। উপরন্তু, ব্রিটেন যে প্রবলভাবে দাবি করে যে সে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করছে তাতে সে-দাবিরও বিরুদ্ধতা করা হয়েছে। এবং শেষত কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেস দল ভারত প্রতিরক্ষা আইনের এবং ভারত প্রতিরক্ষা রুল সমূহের গৃহীত হওয়াতে অংশ গ্রহণ করেনি। এই পরিস্থিতিতে, অন্যায় হবে না, যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ভারত প্রতিরক্ষা আইনকে কি ভারত দমন আইন বা অবিচার সুরক্ষা আইন বলা যেতে পারে?

সরকারের পক্ষে এ কথা বলা যায় যে, ভারত প্রতিরক্ষা আইন যেহেতু কেন্দ্রীয় আইনসভার আইন, সেজন্য তার অধীনে সমস্ত আইন সকল প্রাদেশিক সরকার কার্যকর করতে বাধ্য। কিন্তু আগে যা বলা হয়েছে তাতেই এই অভিযোগ যুক্তিযুক্ত সাব্যস্ত হয় যে আমার ক্ষেত্রে সেসব আইন ঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। স্পষ্টত আইন বিরুদ্ধ কাজ করা হয়েছে, অন্যায় করা হয়েছে। সেই অদ্ভুত আচরণের, আমার মতে, একটি মাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে। সরকার আমার বিরুদ্ধে স্পষ্টতই প্রতিহিংসামূলক নীতি অনুসরণ করে চলেছে যার কারণ বোঝা যায় না।

দু'মাসের অধিক কাল আমার বিবেকের দরজায় এই প্রশ্ন বারংবার করাঘাত করেছে, এই দুরূহ পরিস্থিতিতে আমার কী করা উচিত। আমার কি পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ করে যা ঘটে তাকেই মেনে নেওয়া উচিত, না আমার যা অন্যায় এবং বে-আইনি মনে হয় তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত। অত্যন্ত ধীরস্থির ভাবে বিবেচনা করার পর আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, পরিস্থিতির কাছে নতি স্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না। অন্যায় করার চেয়ে অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করা বেশি গুরুতর অপরাধ। অতএব প্রতিবাদ আমাকে করতেই হবে।

কিন্তু এত দিন ধরে প্রতিবাদে চলেছে, এবং প্রতিবাদের সমস্ত সাধারণ পন্থা নিঃশেষ হয়ে গেছে। সংবাদপত্রে এবং বক্তৃতামঞ্চে আন্দোলন, সবকারের কাছে আবেদন, আইনসভায় উত্থাপন, আইনের পথে প্রচেষ্টা, এই সমস্তই কি করে দেখা হয়নি এবং সবই নিষ্ফল হয়নি? একটি মাত্র পন্থা অবশিষ্ট আছে, কারাগারে বন্দির হাতে যেটি সর্বশেষ অস্ত্র অনশন ধর্মঘট,

উপবাস। ঠান্ডা মাথায় সেই পন্থাটির ভাল-মন্দ আমি বিবেচনা করে দেখেছি, তাতে লাভ বা ক্ষতি কী হতে পারে ভেবে দেখেছি। এ বিষয়ে আমার কোনও মিথ্যা মোহ নেই, এবং আমি সম্পূর্ণ অবহিত যে এ থেকে স্পষ্ট লাভ কিছুই হবে না কারণ আমার এ বিষয়ে যথেষ্ট ধারণা আছে, এ রকম পরিস্থিতিতে সরকার এবং আমলাতন্ত্র কী করে থাকে আমার মনশ্চক্ষে এখন ভাসছে, টেরেন্স ম্যাকস্উইনি এবং যতীন দাসের দৃষ্টান্ত, একটি প্রশাসন যন্ত্রের হৃদয় বলে কিছু থাকে না, যাতে কোনও সাড়া জাগতে পারে যদিও তার মিথ্যা অহমিকা থাকে, যেটি সে সর্বদা আঁকড়ে ধরে থাকে।

বর্তমান অবস্থায় জীবন আমার অসহনীয় হয়ে উঠেছে। যা বে-আইনি, অন্যায় তার সঙ্গে আপস করে বেঁচে থাকা আমার ধাতে নেই। সে মূল্য দেওয়ার চেয়ে আমি বরং জীবন ত্যাগ করব। সরকার জোর করে আমায় জেলখানায় বন্দি করে রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি তার জবাবে বলছি, "আমাকে মুক্তি দাও, নইলে আমি জীবনধারণ করতে অস্বীকার করব, এবং আমি বাঁচব, না মরব, তা আমারই সিদ্ধান্ত হবে।"

হাতে হাতে নগদ লাভ যদি কিছু নাও হয়, কোনও কষ্ট স্বীকার, কোনও আত্মত্যাগ কখনও বিফল হতে পারে না। কষ্ট স্বীকার এবং আত্মত্যাগের দ্বারাই কোনও আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। সব যুগে সব দেশে এই আইনই চিরন্তন, আত্মোৎসর্গকারীর রক্তেই থাকে ধর্মসংস্থাপনের বীজ (The blood of the martyr is the seed of the church")

এই মরণশীল জগতে সব কিছুই নশ্বর, বিনাশ প্রাপ্ত হবে। কিন্তু ধ্যান-ধারণা, আদর্শ ও স্বপ্নের বিনাশ নেই। একজন মানুষ একটি আদর্শের জন্য প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু তার চিন্তা বিশ্বাস তার মৃত্যুর পরে হাজার জীবনের মধ্যে বৃত হবে। এইভাবেই ঘোরে বিবর্তনের চক্র এবং এক প্রজন্মের চিন্তা, ধারণা, স্বপ্ন পরবর্তী প্রজন্মের ওপরে বর্তায়। এই পৃথিবীর কোনও চিন্তাই কখনও চরিতার্থতা লাভ করেনি দুঃখবরণ ও আত্মত্যাগ ব্যতীত।

কোনও একটা আদর্শের জন্য আমি জীবন ধারণ করেছি, জীবন দান করেছি, এর চেয়ে বড় সান্ত্বনা·একজন মানুষের আর কী হতে পারে? এর চেয়ে বড় পরিতোষ একজন মানুষের আর কী হতে পারে, তার প্রাণ তারই মতো প্রাণের জন্ম দেবে তবে অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য, এই বিশ্বাসের মতো। একজনের আত্মা এর চেয়ে বড় কী পুরস্কার প্রার্থনা করতে পারে, এই নিশ্চয়তার চেয়ে যে তার বাণী পর্বত ও উপত্যকা, বিস্তীর্ণ প্রান্তর অতিক্রম করে দেশের দূর দূর প্রান্তে সমুদ্রের পরিধি ছাড়িয়ে দূর দূর দেশে, পৌঁছে যাবে? নিজের লক্ষ্য ও আদর্শের বেদীতে শান্ত হয়ে আত্মবলিদান, তার চেয়ে চরিতার্থতা জীবনের আর কী হতে পারে?

অতএব এ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, দুঃখবরণ ও আত্মবলিদানে কেউ কিছু হারায় না। পৃথিবীতে পার্থিব কোনও ক্ষতি যদি হয়, মৃত্যুহীন জীবন তাকে প্রতিদান দেয় অনেক বেশি।

আত্মা এইভাবেই নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। একজন মানুষকে মরতে হয়, একটি জাতির বেঁচে থাকার জন্য। আজ আমাকে মরতে হবে, যাতে ভারত বেঁচে থাকে, স্বাধীনতা এবং গৌরবলাভ করে।

আমরা দেশবাসীর উদ্দেশে আমি বলি, "ভুলো না মানুষের সবচেয়ে বড় অভিশাপ দাস হয়ে থাকা। ভুলো না, সবেচেয়ে বড় অপরাধ অবিচার ও অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করা। শ্বাশ্বত আইন স্মরণ রেখো, জীবন যদি পেতে চাও, জীবন দিতে হবে। এবং মনে রেখো, সবচেয়ে বড় পুণ্য, অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। তার জন্য যে মূল্যই দিতে হোক।

আজকের সরকারকে আমি বলি, বন্ধ করো সাম্প্রদায়িকতা এবং অবিচারের পথ ধরে তোমাদের এই যাত্রা। তোমাদের সেই রাস্তা থেকে ফিরে আসার সময় এখনও আছে। বুমেরাং ছুড়ো না, অবিলম্বে তা তোমাদের ওপর গিয়ে পড়বে। এবং বঙ্গদেশকে আরেকটি সিন্ধুদেশ বানিও না।

আমার কথা শেষ হয়েছে। আপনাদের প্রতি আমার দ্বিতীয় এবং শেষ অনুরোধ জোর করে আমার অনশনে হস্তক্ষেপ করবেন না, আমাকে শান্তিপূর্ণ ভাবে আমার জীবনের শেষের দিকে যেতে দিন। টেরেন্স ম্যাকস্উইনির বেলায়, কিংবা যতীন দাসের অথবা মহাত্মা গান্ধীর বেলায় এবং ১৯২৬-এ আমাদের নিজেদের বেলাতেও সরকার অনশনে হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আশা করি এবারও তাঁরা তাই করবেন, না হলে জোর করে আমাকে খাওয়াবার কোনও চেষ্টা করা হলে আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করব, যদিও তার ফল আরও মারাত্মক হতে পারে। ২৯ নভেম্বর ১৯৪০ আমি আমার অনশন আরম্ভ করব।

প্রেসিডেন্সি জেল
২৬.১১.১৯৪০

আপনাদের বিশ্বস্ত
সুভাষচন্দ্র বোস

পুঃ আগেকার অনশনের মতো, আমি শুধু লবণ মেশানো জল গ্রহণ করব তবে প্রয়োজন মনে করলে, তা বন্ধ করতে পারি।

এস. সি. বি.

বঙ্গদেশের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
এবং
মন্ত্রীমণ্ডলী
সমীপেষু

প্রিয় মহাশয়,

আপনাদের প্রতি এই আমার সর্বশেষ আবেদন।

(২) আমি ইতিমধ্যেই সরকারকে এই অনুরোধ জানিয়ে পত্র পাঠিয়েছি যেন জোর করে খাওয়ানো না হয় এবং জানিয়েছি, তা সত্ত্বেও যদি সে-চেষ্টা করা হয়, সর্বশক্তি দিয়ে আমাকে তার প্রতিরোধ করতে হবে, তার ফল, আরও বেশি মারাত্মক হতে পারে। প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্টকে লেখা আমার ৩০ অক্টোবর তারিখের পত্রে, এবং সরকারকে লেখা ২৬ নভেম্বরের পত্রে আমার মনোভাব আমি স্পষ্ট জানিয়েছি। সেই কারণে, জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যখন আমি আভাস পেলাম যে, আমার ক্ষেত্রে জোর করে খাওয়াবার কথা আবার চিন্তা করা হচ্ছে, আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছি।

(৩) আমার পূর্ব্বোল্লিখিত দু'খানি পত্রে আমি এ বিষয়ে যেসব যুক্তি দেখিয়েছি, তার আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না, তবে আমার বক্তব্য আমি সংক্ষেপে জানাতে চাই।

(৪) প্রথমত আমাকে জোর করে খাওয়ানোর ক্ষেত্রে সরকারের কোনও নৈতিক অধিকার নেই, যেখানে অন্যায় এবং আইনবিগর্হিত কাজ, যার সঙ্গে প্রবল সাম্প্রদায়িকতা মিশ্রিত, তার দ্বারা আমার জীবন দুর্বিষহ করে রাখার জন্য তারা দায়ী।

(৫) এই পরিস্থিতিতে সরকারের কোনও আইনগত ক্ষমতাও নেই জোর করে আমাকে খাওয়ানোর। এই ব্যাপারে সরকারকে আমাকে জোর করে খাওয়ানোর ক্ষমতা দান করে এমন কোনও আইনের কথাও আমি জানি না। সরকারের একটি বিভাগীয় আদেশ আইনের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না, বিশেষ করে যখন সেই আদেশে একজন ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা খর্ব করা হয়।

(৬) পুনঃ পুন আমার অনুরোধ সত্ত্বেও যদি আমাকে জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যাঁরা তার জন্য দায়ী, তার দ্বারা আমার কোনও আঘাত অথবা যন্ত্রণা, শারীরিক অথবা মানসিক, ঘটালে, দেওয়ানি অথবা ফৌজদারি অপরাধের দায় তাঁরাই বহন করবেন।

(৭) উপরোক্ত বিষয় ও নীতিসমূহ ছাড়াও, অনশন আরম্ভের আগে এবং পরে আমার শারীরিক অবস্থার কারণে এমনিতেই বলপ্রয়োগে আহার করানো অসম্ভব হবে। এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত। ওই পরিস্থিতিতে, জোর করে খাওয়াতে গেলে তার উদ্দেশ্য তদ্বারাই ব্যর্থ হবে, এবং জীবন প্রলম্বিত করার থেকে তার অন্তিম ত্বরান্বিত হবে। এবং দেওয়ানি দায়িত্ব, বলপ্রয়োগের জন্য, তাতে আরও কঠোর হয়ে উঠবে।

(৮) এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদের জানাতে পারি, জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা হলে, আমার আর অন্য কোনও উপায় থাকবে না, তার দরুন আমার যে অসহ্য এবং দীর্ঘায়িত যন্ত্রণা তার হাত থেকে উদ্ধারের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া। একমাত্র আত্মহত্যার দ্বারাই তা সম্ভব, এবং তার দায়িত্ব পুরোপুরি সরকারের ওপর বর্তাবে। যে ব্যক্তি জীবনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তার অবসানের জন্য তার হাতে শত শত উপায় থাকে, এবং পৃথিবীর কোনও শক্তি তার মৃত্যু নিবারণ করতে পারে না। সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়টি আমি বেছে নিয়েছি, এবং কম শান্তিপূর্ণ অধিকতর উগ্র কোনও উপায় অবলম্বনে আমাকে বাধ্য করা নৃশংসতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি এখন যে পথ গ্রহণ করেছি সেটা সাধারণ অনশন নয়। এটি কয়েক মাসের চিন্তার ফল। শেষ পর্যন্ত কালীপূজার পুণ্য দিনে প্রার্থনাপূর্ণ অন্তরে আমি তাকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করেছি।

(৯) আগে কয়েকবার আমি অনশন ধর্মঘট করেছি, কিন্তু এই অনশন অসাধারণ, আগে কখনও যা করিনি।

(১০) মানুষ একমাত্র খাদ্য গ্রহণ করেই বাঁচে না, তার আত্মিক এবং নৈতিক আহারও দরকার। শেষোক্ত আহার ব্যতিরেকে সে বেঁচে থাকবে, আপনাদের পরিকল্পনা সার্থক করবার জন্য। আপনাদের পরিকল্পিত ছকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার জন্য, আপনারা তা আশা করতে পারেন না।

(১১) ২৬ নভেম্বর পত্রে আমি আগেই জানিয়েছি, আপনাদের কাছে আমার দুটি মাত্র অনুরোধ, প্রথম আমার ২৬ নভেম্বরের পত্র, সেটি আমার রাজনৈতিক জবানবন্দি, যখন সরকারের লেখ্যাগারে সযত্নে রক্ষিত হয়, এবং দ্বিতীয়ত আমাকে যেন শান্তিপূর্ণ ভাবে

আমার জীবনাবসানের দিকে এগিয়ে যেতে দেওয়া হয়, এই চাওয়া কি আপনাদের কাছে খুব বেশি চাওয়া?

প্রেসিডেন্সি জেল
২/৫. ১২. ১৯৪০

আপনাদের বিশ্বস্ত
সুভাষ চন্দ্র বোস

বঙ্গপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার উদ্দেশে

৩৮/২, এলগিন রোড
কলকাতা
৯.১২.৪০

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা
সমীপেষু,
(বঙ্গদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিবের মাধ্যমে)

প্রিয় মহোদয়গণ,

গত ৫ ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৪ : ৩০ নাগাদ প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিনটেনডেন্ট আমার সেলে এসে যথারীতি শুভেচ্ছাদি জ্ঞাপন ও খোঁজ-খবরের পরে বলেন, 'আমি আপনাকে বাড়ি পাঠাবার আদেশ পেয়েছি। অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত।' এর অর্থ নিতান্ত অল্পবুদ্ধির কাছেও পরিষ্কার হওয়া উচিত।

পরদিন সকালে আমি জেনে অবাক হলাম, সরকার কর্তৃক ভারত প্রতিরক্ষা আইনের ২৬তম ধারা অনুযায়ী আমার অন্তরীণ থাকার আদেশ প্রত্যাহার হয়নি, শুধুমাত্র মুলতুবি রাখা হয়েছে।

তখনও মনে করা হয়েছিল, অন্তত অভিযোগকারীর মামলাটি প্রত্যাহার করা হল। এখন দেখা যাচ্ছে, সে ধারণাও ভুল।

আমার শুধু মনে হচ্ছে, আমি যখন জেলে ছিলাম তখনই আমাকে এসব জানালে ভাল হত। যাই হোক, এখন আমি সরকারকে অনুরোধ করছি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে জানান:

(১) ভারত প্রতিরক্ষা আইনের ২৬তম ধারা অনুযায়ী আদেশটি তাঁরা প্রত্যাহার করবেন কিনা;

(২) আমার বিরুদ্ধে যে দুটি মামলা ঝুলছে, তাঁরা প্রত্যাহার করবেন কিনা।

তাঁদের উত্তর পেলে আমি ঠিক করব সুস্থ হলে আমি জেলে ফিরে গিয়ে অনশন ধর্মঘট শুরু করব, না কি এখনই তা করব।

লক্ষ করবেন, ওই দুটি মামলা সংক্রান্ত আইনগত অবস্থা অত্যন্ত অসঙ্গতিপূর্ণ, কারণ আমি পুলিশের হেফাজতেও নেই, আর জেলের হেফাজতেও নেই।

সে যাই হোক, এ মাসের ৫ তারিখে আমার প্রতি সৌজন্যের জন্য আমি সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

আপনার বিশ্বস্ত
সুভাষ চন্দ্র বোস

বঙ্গপ্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুলিপি প্রদত্ত।

এম. এন. রায়ের পত্র

৩বি স্টোর রোড
বালিগঞ্জ
কলকাতা
জুন ১২, ১৯৩৯

প্রিয় সুভাষ বাবু,

আপনার পরামর্শ মতো লিখিত বিবৃতি এই সঙ্গে পাঠালাম। আমার বিশ্বাস এতে প্রয়োজন মিটবে। তা যদি হয়, আপনি এটি সংবাদপত্রে পাঠাতে পারেন। না হলে দয়া করে জানান।

আন্তরিকভাবে আপনার

এম. এন. রায়

এম. এন. রায়ের বিবৃতি, জুন ১২, ১৯৩৯

মি. কে. এফ. নরিম্যান আমাকে বামপন্থী কংগ্রেসিদের একটি সম্মেলনে যোগ দিতে আমন্ত্রণ করেছেন। সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে, বোম্বাইয়ে এ. আই. সি. সি'.র সভার প্রাক্কালে, ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠনের বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বোস যখন কংগ্রেসের অভ্যন্তরের সমস্ত বামপন্থীদের একত্র করার ক্ষেত্র হিসাবে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করার উদ্দেশ্য ঘোষণা করেন, তারপর থেকে অনেক বাদানুবাদ হয়েছে এবং নানা বামপন্থী গোষ্ঠী এবং প্রধান প্রধান বামপন্থী ব্যক্তিদের কাছে অনেকে দাবি করেছেন, শ্রীযুত বোসের প্রস্তাব সম্বলে তাঁদের মনোভাব স্পষ্ট করে জানানোর জন্য। ইতিমধ্যেই অকাধিকবার আমি এ-বিষয়ে আমার মতামত জানিয়েছি। 'লীগ অব র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন'-এর মনোভাবও প্রকাশ্যে জানানো হয়েছে। কংগ্রেসের মধ্যে যত বামপন্থী আছেন তাঁদের জন্য একটি সাধারণ মঞ্চ সেই সব বামপন্থীদেরই সমর্থন করা উচিত, যাঁরা আন্দোলনের স্বার্থকে বিশেষ কোনও গোষ্ঠীর স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিতে সক্ষম। একটি সাধারণ উদ্দেশ্য সাধানের জন্য যে সহযোগিতা সকলেই কামনা করেন, প্রস্তাবিত 'ব্লক'-এর মঞ্চে তা সম্ভব হতে পারে, কারণ বর্তমানে যে সব গোষ্ঠী আছে, সেগুলো নতুন সংগঠনে মিশে যাক, শ্রীযুত বসু তা চান না। কাজেই শ্রীযুত বোস একটি প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য নিয়ে যে-আন্দোলন আরম্ভ করেছেন, 'লীগ অব র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন' এবং আমি নিজেও তাকে স্বাগত জানাই। অতএব আমরা এই উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত সম্মেলনে যোগ দেব, যাতে বামপন্থী শক্তি সমূহের সংহতির কাজে সহায়তা হয়। এবং তার ফলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভবিষ্যৎ তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হবে।

আমি প্রকাশ্যে আগেই বলেছি, আবার বলছি, গান্ধীবাদকে সম্পূর্ণ বাতিল করা এবং সংগ্রামের অন্য পন্থার প্রয়োজন মানুষকে বোঝানো, এই হবে বিপ্লবী বামপন্থীদের প্রধান নীতি, যে বিপ্লবপন্থীরা কংগ্রেসের বিকাশ হিসাবে উঠে আসবেন। বিভিন্ন প্রকাশ্য বিবৃতি থেকে আমি যত দূর বুঝতে পেরেছি, ফরওয়ার্ড ব্লক এই মনোভাব পোষণ করে না। অবশ্যই

আমরা, আমাদের মত যাতে প্রবল করা হয়, তার জন্য চেষ্টা করত, কিন্তু আমরা যেটা মনে করি, কার্যকর বামপন্থার সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মসূচি, সেটিকে গ্রহণ করার ওপর আমাদের সহযোগিতা নির্ভর করবে না। একটি ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে বোম্বাইয়ের প্রস্তাবিত সম্মেলনে যা গৃহীত হবে, তার ভিত্তিতেই আমরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত থাকব।

এম. এন. রায়ের পত্র

১৩, মোহিনী রোড
দেরাদুন
অক্টোবর ১৩, ১৯৩৯

প্রিয় বন্ধু,

কংগ্রেস মন্ত্রীসভা সমূহের পদত্যাগের বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব সম্পর্কে আমার মতামত-সংক্রান্ত টেলিগ্রাফ-যোগে প্রেরিত যে খবর অক্টোবর ২৮ তারিখের ফরওয়ার্ড ব্লকে বেরিয়েছে তার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি কি? সেই বিবৃতির মূল বয়ান, এই সঙ্গে যেটি পাঠালাম। আপনি দেখতে পারেন যে, ওই সমস্ত মন্তব্য ভিত্তিহীন, এবং আশা করি আমার প্রতি কৃত অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য যা প্রয়োজন আপনি করবেন।

আপনার
এম. এন. রায়

সীতা ধর্মবীরকে

ট্রেন
১২. ১১. ৩৯

প্রিয় সীতা,

বিগত কিছুদিন আমি তোমাকে চিঠি লিখতে পারিনি। আসাম ও পূর্ব বঙ্গে ৯দিন ভ্রমণের পর আমি এখন বাড়ি ফিরছি। আমি ভালই আছি। এর চেয়ে ভাল থাকার আশা করতে পারি না।

আমি আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ, বিশেষ করে লীলা। দিদিকে কয়েক ছত্র লিখে এই সঙ্গে পাঠলাম। জানি না, সে এখন লাহোরে আছে, না লীলাকে নিয়ে দিল্লি চলে গেছে।

তোমার স্নেহের

সুভাষ

অমিয় চক্রবর্তীকে*

৩৮/২ এলগিন রোড,
কলিকাতা
বর্দ্ধমান স্টেশন
১১. ১২. ৩৯

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমি আজ U.P. থেকে ফিরিতেছি। শীঘ্রই শান্তিনিকেতনে আসিতেছি। আশা করি আপনি ওখানে আরও কয়েক দিন আছেন। কবির কিংবা আপনার কি এর মধ্যে কলিকাতায় আসিবার সম্ভাবনা আছে? আমার শরীর এখন অসুস্থ— Influenja-র মত হইয়াছে। আশা করি ২/৩ দিনের মধ্যে সারিয়া উঠিব। আন্তরিক প্রীতি সম্ভাষণ গ্রহণ করিবেন।

ইতি
ভবদীয়
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

এম. অন্নপূর্ণাইয়ার পত্র

রাজামুন্দ্রাই
১৫.১.১৯৪০

প্রিয় সুভাষবাবু,

সংগ্রাম এবং আমাদের ব্লকের কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা নিয়ে যে সব প্রশ্ন উঠেছে, সে-বিষয়ে আমি গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করছি।বন্ধুদের সঙ্গেও আমি পরামর্শ করেছি। সংগ্রামে অন্ধ্রদেশের অবদান এবং আমার নিজের ভূমিকা নিয়েও আমি গভীরভাবে চিন্তা করছি। চারটি বিষয়ের ওপর আমি জোর দিয়েছি। এই চিঠিতে আমি আমার চিন্তাভাবনা পুরোপুরি ব্যক্ত করব :

(১) আমার সুবিবেচিত মত, অনতিবিলম্বে আমাদের একটি আহ্বান ঘোষণা করা উচিত।

(২) ব্যক্তিগতভাবে আমার মত, একদিন না একদিন আমাদের বেরিয়ে যেতেই হবে। কিন্তু তার জন্য সবচেয়ে অনুকূল, মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে সবচেয়ে উপযোগী মুহূর্তটি বেছে নিতে হবে। তাঁরা তাঁদের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক সময়ে আমাদের বহিষ্কার করবেন। তার চেয়ে আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক সময়ে আমাদের বেরিয়ে আসাই ভাল। তবে, আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, এই দুটি বিষয় আমাদের কার্যকরণীতে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করে, একমাত্র তার পরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

(৩) তৃতীয় বিষয় অন্ধ্রতে সংগ্রাম। আমি আগেই আপনাকে বলেছি, আমরা স্থানীয় প্রশ্ন নিয়ে চার জায়গায় আগেই সংগ্রাম আরম্ভ করতে পারি। অন্যান্য জেলাতেও সাধারণ সংগ্রাম

* মূল বাংলায়। বানান অপরিবর্তিত।

আরম্ভ করতে হবে। কিন্তু মোটের ওপর আমাদের সমস্যা অর্থ-সংস্থান সংক্রান্ত। আপনার কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ সংগ্রামের জন্য ১০০০ টাকা পাঠান।

(৪) আমার কথা বলতে গেলে, আপনি জানেন, আপনার জন্য এবং ব্লকের জন্য আমি সবকিছু করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমারও দারুণ অসুবিধা, অর্থের অভাব। আপনার পরামর্শ অনুযায়ী ইনসিওরেন্সের সব কাজ আমি নিশ্চিত ভাবে বন্ধ করে দিয়েছি। আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, ডিসেম্বর পর্যন্ত আমার পরিবার প্রতিপালনের জন্য আপনি কি আমাকে মাত্র ১০০০ টাকা দিতে পারেন? আমি সে টাকা আমার স্ত্রীর হাতে দিয়ে ব্লকের কাজে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করতে পারব। অনেক সময়, দুশ্চিন্তা এবং অসুবিধা তাতে বাঁচবে, এবং আমি আমার সমস্ত সময় পার্টির কাজে দিতে পারব।

কাজেই, আমি মাত্র দু-হাজার টাকার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি, অর্ধেক দলের জন্য আর অর্ধেক পরিবার প্রতিপালনের জন্য।

যদি আপনি দয়া করে সে-অর্থের ব্যবস্থা করতে পারেন, আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি, আমি দলের কাজে আমার সমস্ত সময় মনোযোগ এবং শক্তি দিতে পারব এবং নিশ্চিত জানি ১৯৪০ সাল শেষ হবার আগেই তেলেগু দেশে ব্লক অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হয়ে উঠবে। প্রকৃতপক্ষে সেই টাকা সে কাজের পক্ষে পর্যাপ্ত হবে না, কিন্তু সেই অর্থকে কেন্দ্র করে আমি প্রয়োজনীয় আরও টাকা সংগ্রহ করতে পারব, আমি জানি বর্তমানে আপনার সবচেয়ে বড় অসুবিধা অর্থ-সংক্রান্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আপনাকে অনুরোধ করছি কোনও ভাবে কষ্ট করে সেই অর্থ সংগ্রহ করুন।

শুধু এ ছাড়া আর আমার বলবার কিছু নেই যে আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি, আমি আপনার সঙ্গেই ভাসব, আপনার সঙ্গেই ডুবব। নানা জনের মত, এখানে আপনার ভ্রমণ অত্যন্ত সফল হয়েছিল। তাই আপনাকে আমার অনুরোধ, আপনি যদি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন, ফেব্রুয়ারিতে দশটি দিন আমাদের দিন। কমপক্ষে দশটি দিন অবশ্যই দেবেন। ভ্রমণের দিনগুলি এ মাস শেষ হওয়ার মধ্যে ঠিক করুন। দয়া করে আমাকে জানান। আমাদের কার্যকরণীর অধিবেশনের স্থান এবং কাল আপনি কবে ঠিক করবেন।রবে ঠিক ক

যদি আপনি টাকা পাঠান, দয়া করে টেলিগ্রাম করে আমায় বলুন এসে টাকা নিয়ে যেতে, কিংবা, ওখান থেকে কারও হাত দিয়ে পাঠান। তাকে আপনি শুধু বলে দেবেন, আমার বাড়ি গোদাবরী স্টেশন থেকে মাত্র ৬০ গজ দূরে। এবং যে কোনও মালবাহক সেখান থেকে তাঁকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসতে পারবে।

যদি আমাকে সাহায্য করা আপনার পক্ষে অসম্ভব হয়, আমাকে সে-বিষয়ে জানান। তা হলে আমি রাজনৈতিক কাজের পাশাপাশি আমার বাড়ির কাজেও ফিরে যাব। দয়া করে আমাকে অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখবেন না। লালা শঙ্করলালও আমাকে পার্টির জন্য সারাক্ষণের কর্মী হতে বলেছিলেন এবং বলেছিলেন আমার জন্য ১০০০ টাকা সংগ্রহ করতে পারবেন এবং তিনি বলেছিলেন, সে-পরিমাণ টাকা অযৌক্তিক নয়। তাঁর কাছ থেকে আমি আর কিছু শুনিনি।

অতএব দয়া করে অবিলম্বে নীচের ঠিকানায় আমাকে উত্তর পাঠাবেন :

"ম্যানেজিং এজেন্টস। দি ন্যাশনাল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস। রাজামুন্দ্রাই।"

ভিতরে একটি খাম দেবেন, এবং সেটি আমার নামে দেবেন।

আমার ব্যক্তিগত বিষয় উত্থাপন করে আপনাকে বিব্রত করতে হল, সেই কারণে আমি দুঃখিত। কিন্তু তা ছাড়া আমার উপায় ছিল না। সেজন্য আমাকে ক্ষমা করে বাধিত করবেন।

আন্তরিকভাবে আপনার
এম. অন্নপূর্ণাইয়া।

পুঃ সংক্ষেপে: দয়া করে ২৬ তারিখের পর আমাদের কার্যকরণীর সভার দিন ঠিক করুন। (২) দয়া করে অন্ধ্রভ্রমণে ফেব্রুয়ারিতে ১০ দিন দেবেন।

(৩) দয়া করে অন্ধ্রে সংগ্রামের জন্য ১০০০ টাকা ও আমার পরিবার প্রতিপালনের জন্য ১০০০ টাকা দেবেন। (৪) এই পত্র দয়া করে গোপন রাখবেন। (৫) এই চিঠিতে প্রদত্ত খামের ঠিকানাটি লক্ষ করবেন।

দয়া করে সত্বর উত্তর পাঠান।

আমি এই কথাটার ওপর জোর দিলাম কারণ আপনি নিজেই বলেছেন, চিঠিপত্রের ব্যাপারে আপনি তৎপর নন।

এম. এ. পি.

ডা. সত্যপালের পত্র

প্রেরক :
ডা. সত্যপাল, বি. এ., এম. বি., এম. এম. এ.
চিকিৎসক ও ডেন্টাল সার্জন,

২, অ্যাবট রোড
লাহোর
২৩. ১. ১৯৪০

প্রিয় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বোস

মি. হবিবুল্লা ও মি. ফজল হোসেন, অল পঞ্জাব মোসলেম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের দুই প্রতিনিধি, আপনার সুবিধা মতো যথাসম্ভব শীঘ্র পঞ্জাবে আসবার জন্য আপনাকে অনুরোধ জানাতে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। আপনি তাঁদের অনুরোধে সম্মত হলে আমি অতিশয় বাধিত হব।

ছাত্র আন্দোলনে আপনি অতিশয় আগ্রহী এবং আমি নিশ্চিত, ফেডারেশনের সদস্যদের মনোভাব আপনি বুঝতে পারবেন এবং আমাদের মধ্যে উপস্থিত থেকে আমাদের অনুগৃহীত করবেন।

শ্রদ্ধা সহকারে
একান্ত আপনার
সত্যপাল

বদ্রাশি
নওসেরা
১৯. ২. ৪০

প্রিয় কমরেড,

অনেকদিন আপনার কোনও পত্র পাইনি, মনে হয়, আপনি দীর্ঘ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, আমি ইতিমধ্যেই আপনাকে দু-একদিন পত্র পাঠিয়েছি, আপনি পেয়েছেন কিনা জানি না।

এই প্রদেশের সব জায়গা থেকে কমরেডরা সংগ্রামের জন্য আগ্রহী। আমার মনে হয় না, রামগড়ে প্রস্তাবিত ফরওয়ার্ড ব্লক অধিবেশনের আগে সেই মর্মে আপনার কাছ থেকে কোনও নির্দেশ পাব। যাই হোক, এ-বিষয়ে নির্দিষ্ট কিছু লিখে পাঠান।

রামগড় অধিবেশনে ফরওয়ার্ড ব্লকের টিকিটে আমাদের ১৩ জন প্রতিনিধি থাকবেন। আমরা আশা করেছিলাম এবার সভায় আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে। কিন্তু ক্ষমতাসীন দক্ষিণপন্থীরা আমাদের মনোনয়নপত্রগুলি বাতিল করতে, কিংবা আমাদের পরাজয়ের ব্যবস্থা করতে যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন। যাই হোক, আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। দিকে দিকে আমাদের সংগঠন বাড়ছে।

পেশোয়ার শহরে আমরা নির্ভর করেছিলাম অসংগঠিত সমাজতন্ত্রী, যাঁরা ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দিয়েছেন তাঁদের ওপরে কিন্তু ঘটনা যা ঘটল, তাঁরা আমাদের পরিত্যাগ করলেন, যদিও তাঁরা কোনও সমাজতন্ত্রবাদী দল সংগঠন করেননি।

গুরুত্ব সহকারে যাঁরা চিন্তাভাবনা করেন এমন কয়েকজন দক্ষিণপন্থী পেশোয়ারে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেও পারেন। লালকুর্তাদের একজন প্রাক্তন জেনারেল আমাদের জানিয়েছেন, বেশ কয়েকজন লালকুর্তাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের দিকে চলে আসতে পারেন। আপনি বোধহয় জানেন, পেশোয়ার শহরে এ পর্যন্ত আমাদের কোনও লালকুর্তা স্বেচ্ছাসেবী ছিলেন না। তাঁকে যদি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা হিসাবে পাই সেই শহরে আমরা রীতিমতো শক্তিশালী হয়ে উঠব।

সাপ্তাহিক ফরওয়ার্ড ব্লকের ম্যানেজারকে দয়া করে নির্দেশ দিন, এই সঙ্গে পাঠানো কাগজে যাঁদের নাম আছে, তাঁদের যেন পত্রিকা পাঠান।

আকবর শাহ

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গার পত্র

প্রেরক :
অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গা, এম. এল. এ.
ভাইস প্রেসিডেন্ট
অল ইন্ডিয়া কিষাণ সভা
নিডুব্রলু (পি. ও) এস. আই.

মাদ্রাজ অফিস

সাউথ ইন্ডিয়ান ফেডারেশন
অব পেজেন্টস অ্যান্ড
এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার্স
৫৭, বরদা মুথিয়াপ্পান স্ট্রিট
জি. টি. নিডুব্রলু
২০. ২. ৪০

প্রিয় সুভাষবাবু,

আমি আপনাকে সানন্দে জানাচ্ছি যে অন্ধ্রতে এবং মাদ্রাজ শহরে ফরওয়ার্ড ব্লক লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছে। তার জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টির অত্যন্ত ভ্রান্ত নেতৃত্বের এবং আমাদের ওপর তাদের নির্বোধ আক্রমণের। বামপন্থীদের এই দক্ষিণপন্থার দিকে সরে যাওয়ায় আমাদের কিষাণসভার সদস্যরা আমাদের বন্ধু করতে আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁরা আমাকে আশ্বস্ত করেছেন যে, ফরওয়ার্ড ব্লককে বড় করে তুলতে তাঁরা সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করবেন। তাঁরা সবাই জানেন ফরওয়ার্ড ব্লকের দিকে এই অগ্রগমনের পিছনে আমি আছি এবং সেই কারণে আমি নিঃসন্দেহ কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এফ. বি. অন্ধ্রতে এবং তামিলনাডে সবচেয়ে শক্তিশালী বামপন্থী শক্তি হয়ে দাঁড়াবে।

বলে রাখি, অবশেষে আমরা ঠিক করেছি, সারাভারত কিষাণসভার পরবর্তী অধিবেশন পালসাতে করব। কলকাতা থেকে একরাতের যাত্রা। যেখানে পৌছানো যায়, বিএনআর রেলে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে ২৫ কিংবা ২৬ এবং আমি বিশেষভাবে আগ্রহী আপনাকে একটি বিশেষ বার্তা দিতে।

১ এপ্রিল, কিংবা প্রয়োজনে এমনকী ২৮ মার্চও, আমরা আমাদের অন্ধ্র কৃষক সমিতির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আমাদের গ্রামে করতে চাই। আমি বিশেষভাবে চাই, আপনি তার উদ্বোধন করুন এবং আমরা একশোজন ছাত্রকে প্রশিক্ষণ দিতে চাই আমার প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তুলবার জন্য। আপনি যদি দু'দিন সেই বিদ্যালয়ে থাকেন, তাতে অনেক কাজ হবে। তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি ওই সপ্তাহটি ২৬ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল অন্ধ্রের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখে দেবেন।

আমার মনে হয়, কমরেড অন্নপূর্ণাইয়া আগেই আপনাকে পালসার কথা জানিয়েছেন।

আগামী কাল আমি নেলোর জেলা সফরে যাচ্ছি, ২৬ পর্যন্ত থাকব। ২৮ তারিখ সালেম

যাব। ৬ মার্চ দিল্লিতে থাকব এবং তারপর রামগড় যাব। সেখানে আমাদের দেখা হবে।

প্রীতি সহকারে
রঙ্গা

প্রসঙ্গক্রমে বলি, মৌলানা আজাদ একটি সুন্দর সূচনা বাণী পাঠিয়েছেন। তাতে আমাদের শক্তি বাড়ল। অতএব আপনি তাঁর বামপন্থায় বিশ্বাস সম্পর্কে ঠিকই বলেছিলেন।

আজ আমি একটি ছোট বিবৃতি প্রকাশ করব, মৌলানা আজাদ আগামী সংগ্রামের অনুকূলে যে মত প্রকাশ করেছেন তাকে স্বাগত জানিয়ে।

আমি আরও একটি বিবৃতি দেব, রামগড়ে একটি বৃহৎ সমাবেশের প্রয়োজন সম্পর্কে আপনার বিবৃতিকে সমর্থন করে।

কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। আমরা শুধু একটা সংগ্রাম চাই না, এমন সংগ্রাম চাই যাকে ভিতর থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। সংক্ষেপে আমরা সন্তুষ্ট হব না এমন কোনও রাজনীতির দ্বারা, যা এই সংগ্রামের ফলে এবং আমাদের জাতীয় সংগ্রামের কালে আমাদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা এনে দেবে না। আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি, আপনি আমাদের জাতীয় সংগ্রামকে নেতৃত্ব দেবেন। আমি প্রকৃতপক্ষেই বিশ্বাস করি, আমাদের রামগড় অধিবেশনে যাতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই স্বাধীনতা দাবি করতে, যার ফলে আমরা শেষপর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ কিষাণ মজদুর রাজ স্থাপন করতে পারি, আপনি সে দিকে আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারবেন। সেই রকম একটি প্রতিশ্রুতি যদি গ্রহণ করা না হয়, আমরা এমন কিছু করতে পারব না, যাতে অন্যদের থেকে অন্যরকম বলে আমাদের চেনা যায়।

কংগ্রেস দলের যে বিরোধিতা, মাদ্রাজের ফরওয়ার্ড ব্লকের ২৬তম প্রতিশ্রুতি, যার মধ্যে ছিল আমাদের কিষাণ মজদুর রাজের আদর্শ, তার প্রতি তারই ফলে সারা দক্ষিণভারতে কংগ্রেসকে গুরুতর অসুবিধায় পড়তে হয়েছে।

সে যাই হোক, যতক্ষণ অন্তত ফরওয়ার্ড ব্লক এবং কিষাণ সভার সদস্যগণ ঐক্যবদ্ধ থাকবেন, অন্যান্য বামপন্থীরা তাঁদের নিজেদেরকে একদেশদর্শী— জাতীয়তাবাদী সংহতির মধ্যে বিলোপ করতে পারবেন না।

ইন্দুলাল যাজ্ঞিকের পত্র

প্রার্থনা সমাজ
অ্যাসটোরিয়া রোড
আহমেদাবাদ
২০. ২. ৪০

প্রিয় সুভাষবাবু,

আপনি আমাদের প্রাদেশিক কিষাণ অধিবেশনের, যার সভাপতিত্ব করবেন স্বামীজি, ২০-২১ এপ্রিল উদ্বোধন করতে সম্মত হয়েছেন শুনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আমরা চেষ্টা করব, এই অধিবেশন যাতে গুজরাটের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি দিকচিহ্ন হয়।

এখন আমি জানতে চাই, অধিবেশনের আগে কিংবা পরে গুজরাটে একটি দ্রুত সফরের জন্য আপনি কয়েকটি দিন দিতে পারবেন কিনা।

রামগড় জমায়েতে আমার উপস্থিতি কি আবশ্যক? নাকি, ওখানে আমার কাজের জন্য আপনি আমাকে ছেড়ে দিতে পারেন? অন্ধ্রতে কিষাণ অধিবেশনে আমাকে যেতে হবে।

একান্ত আপনার
ইন্দুলাল যাজ্ঞিক।

ক্যারল পোটির পত্র

বরানগর
২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

প্রিয় মহাশয়,

অতিশয় আনন্দিত চিত্তে এবং বিনম্র বিনয় সহকারে আমি আপনার কাছে একটি বাণী প্রার্থনা করছি যা ভবিষ্যতে আমাকে অনুপ্রেরণা দান করবে। আমি হিন্দুস্থানের অনেক বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলার কাছ থেকে বাণী সংগ্রহ করেছি, যাঁদের মধ্যে আছেন কবি রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ এবং আপনার বাণী আমার সংগ্রহে একটি মূল্যবান সংযোজনা হবে।

আমি চোদ্দো বছর বয়সের একটি আমেরিকান মেয়ে। ৬ মাস আগে আমি হিন্দুস্থানে এসেছি। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক। কিন্তু আপনি সারা ভারতে সফর করছিলেন। সেজন্যে আপনার সঙ্গে দেখা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বোধহয় তার জন্য আমার দুর্ভাগ্যই দায়ী। আমি অল্প দিনের মধ্যেই ভারত ছেড়ে যাব। তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, বাণীটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠিয়ে দিন।

এর সঙ্গে এক আনার ডাক টিকিট পাঠালাম।

আপনার স্বাস্থ্যের জন্য আমি উদ্বিগ্ন।

আপনার অনুগত

ক্যারল পোটি

শ্রীযুত সুভাষ বোস,
কলিকাতা

পুঃ আমি আমার বন্ধু শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষালের কাছে আছি। দয়া করে তাঁর ঠিকানায় চিঠি পাঠাবেন। নীচে ঠিকানাটি দিলাম।

ক্যারল পোটি
প্রযত্নে শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল
১৯৫, প্রামাণিক ঘাট রোড।
ডাকঘর বরানগর
কলিকাতা

লালা শঙ্করলালের পত্র

প্রেরক :
লালা শঙ্করলাল
সভাপতি, ফরওয়ার্ড ব্লক
শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বোস
টেলিগ্রাম : TROIC
টেলিফোন ৭২৮৬

সাধারণ সম্পাদক
লালা শঙ্করলাল
পোস্ট বক্স নং ২১
নয়া দিল্লি ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

প্রিয় বোস,

১৬ তারিখে আমি এই টেলিগ্রামটি আপনাকে পাঠিয়েছি।

[দয়া করে ৫০০০ টাকার চেক পাঠান। কারণ বামগড়ে কাজ আরম্ভ করতেই হবে।]

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কোনও জবাব পাইনি। আমি জানি আপনি নিশ্চয় ব্যস্ত আছেন এবং অসুবিধাও থাকতে পারে, কিন্তু হাতে সময় খুবই কম। দয়া করে যথাশীঘ্র সম্ভব চেকটি পাঠিয়ে দিন।

আপনার
লালা শঙ্করলাল।

এম. এন. মুখার্জির পত্র

প্রেরক :
এম. এন. মুখার্জি
এম. এল. এ.
ফোন PARK ১২০৩

১৭, হরিশ মুখার্জি রোড
কলিকাতা
২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

প্রিয় সুভাষ বাবু

আমি পাটনা থেকে পাঠানো আপনার পত্র যথাসময়ে পেয়েছি, যাতে আপনি বিহার আইন পরিষদের নির্বাচনে মি. খলিল আহমেদকে ভোট দিতে বলেছেন। সেই মতো আরেকজন প্রার্থী, যিনি আমার এক পুরনো বন্ধু এবং শ্রদ্ধাভাজন, যিনি আমার সমর্থন চেয়েছিলেন, তাঁকে আমায় লিখতে হয়েছে যে, আপনার ইচ্ছানুযায়ী আমাকে কাজ করতে হবে, যদিও আমি মি. খলিল আহমেদের বিষয় কিছুই জানি না। তার পরে আমি মি. পি. আর. দাসের কাছ থেকে একখানি চিঠি পেয়েছি। তার একটি অনুলিপি আমি এই সঙ্গে পাঠালাম। আপনার চিঠি পাওয়ার আগে আমি মনস্থ করেছিলাম রায়বাহাদুর শ্যামনন্দন সহায়কে ভোট দেব। আমি আশা করি আপনি মি. দাসের পত্র পেয়েছেন এবং মি. খলিল আহমেদকে ভোট দেওয়ার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করবেন না।

আপনার একান্ত
মুনীন্দ্রনাথ মুখার্জি

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বোস
১৮/২ এলগিন রোড
স্থানীয়

সারা ভারত কিষাণ সভা

সাধারণ সম্পাদক
স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী
ক্যাম্প মধুপুর
ই. আই. আর.

শ্রী সীতারামাশ্রম
ডাকঘর ও তার অফিস
Bihta. E.I.R.
পাটনা
তারিখ ২৮. ২. ১৯৪০

নং...

প্রিয় সুভাষবাবু,

আমার এক সপ্তাহের হাজারিবাগ জেলা সফর আরম্ভ করবার জন্য আমি গিরিডি যাচ্ছি, ৫. ৩. ৪০ তারিখে আমার সফর শেষ হবে।

আপনি আপনার সফরের জন্য ইউ. পি. যাচ্ছেন। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে গয়া এবং মুঙ্গের জেলায় কোনও কোনও অংশে আপনার কোনও সফরের জন্য ব্যবস্থা করা গেল না বলে আমি দুঃখিত, শীলভদ্রজি মোতিহারি থেকে সে বিষয়ে আপনাকে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন। কিন্তু সেখানে আপনার কোনও জবাব পাওয়া যায়নি, সম্ভবত রামগড়ে আপনার বেশিদিন থাকার কারণে। রামগড়ে আপোস-বিরোধী সম্মেলনের সম্পর্কে কী করা হচ্ছে আমার জানা নেই। শীলভদ্রজি আবার সেখানে গিয়েছেন, পণ্ডিত ধনরাজ শর্মাও গিয়েছেন।

আপোসবিরোধী সম্মেলন সম্বন্ধে সংবাদপত্রে আমার একটি বিবৃতি আপনি বোধহয় পড়েছেন। বিবৃতিটি আপনার কেমন লেগেছে? বিবৃতিটি যে সময়োপযোগী আপনি কি তা মনে করেন? এখানে বিহারে সকলেরই প্রবল বিশ্বাস বিবৃতিটি অতিশয় প্রয়োজনীয় এবং আমি সেটি প্রকাশ করায় তাঁরা অতিশয় নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। সম্মেলনটির বিরুদ্ধে একটি অত্যন্ত অসংযত ও অসংলগ্ন প্রচার চলছিল এবং অন্তত এখনকার মতো আমার বিবৃতি সমস্ত জল্পনা-কল্পনা এবং অপচেষ্টা থামিয়ে দিয়েছে।

সম্মেলনের জন্য প্রায় শ'খানেক স্বেচ্ছাসেবী কি আপনি গ্রহণ করছেন না? আমার মতে, তাদের গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে তাদের পোশাক কী হবে? আপনি কি সে বিষয়ে চিন্তা করেছেন? আমার মতে পোশাক যদি লাল হয়, আমাদের জমায়েতেও তাতে কাজ দেবে। রামগড়ে আমাদের দেখা হওয়ার আগে আপনি কি ওইরকম পোশাক কয়েকটা জোগাড় করে রাখবেন? আমাদের জমায়েতের জন্য আমার বন্ধুরা হাজার হাজার সে-রকম পোশাক সংগ্রহ করতে পারছেন। কিন্তু ঠিক কতগুলো সংগ্রহ করেছেন আমি নিশ্চিত জানি

না। অবশ্য, আপনার কয়েকশো আমাদের খুব কাজে লাগবে।

তারপর আমাদের অধিবেশনের কাজের পদ্ধতি কী হবে? একটি স্বাগত ভাষণ এবং সভাপতির ভাষণ কি থাকবে? আমার মনে হয় ওই দুটি ভাষণই আগে থেকে আমাদের প্রস্তুত করে ছাপিয়ে নেওয়া উচিত। এই রকম সঙ্কটের সময়ে তাৎক্ষণিক ভাষণে কাজ হবে না। আপনি যদি রাজি হন, আমি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ তৈরি করতে পারি। কিন্তু সেটি ছাপাব কোথায়? কলিকাতা, পাটনা না অন্য কোথাও?

আমার যথেষ্ট সন্দেহ, এই চিঠি আপনি ইউ. পি.-র জন্য রওয়ানা হওয়ার আগে আপনার কাছে পৌঁছবে কিনা।

আপনার একান্ত
স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী

মিয়াঁ আকবর শাহ্-এর পত্র

বাদয়াশি
নৌশেরা
২৯. ২. ৪০

প্রিয় কমরেড,

আমি এখানকার অবস্থার সঙ্গে আপনাকে পরিচিত করবার জন্য মাঝে মাঝে আপনাকে পত্র দিচ্ছি। আমি আপনাকে লিখেছি, কীরকম অশোভনভাবে ওরা আমাকে হারাতে পেরেছে।

আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, এই প্রদেশ থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি যাতে রামগড় যান, তবে আমার মনে হয় না জন কয়েকের বেশি যাবেন। আমরা সেই উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক ফরওয়ার্ড ব্লকের একটি সভা ডাকছি।

আমি কয়েক দিন আগে নতুন একটি তালিকা আপনাকে পাঠিয়েছি এবং আমি আশা করি, সাপ্তাহিক ফরওয়ার্ড ব্লকের ম্যানেজারকে আপনি তাদের নামে পত্রিকা পাঠাতে বলবেন।

আকবর শাহ্

ইন্দুলাল যাজ্ঞিকের পত্র

প্রেরক ইন্দুলাল যাজ্ঞিক,
দি হিন্দুস্তান নিউজপেপারস লিমিটেড
সত্ত্বাধিকারী
দি অ্যাডভোকেট অব ইন্ডিয়া প্রেস

প্রকাশনা:
হিন্দুস্তান অ্যান্ড প্রজামিত্র
সচিত্র গুজরাতি প্রভাতী দৈনিক
হিন্দ-প্রজা
সচিত্র গুজরাতি সান্ধ্য দৈনিক
প্রজামিত্র কেশরী
সচিত্র গুজরাতি সাপ্তাহিক

টেলিফোন নং ২১১৭২
টেলিগ্রাম "HINDPRAJA"
পোঃ বক্স নং ৯৪০
২১, দালাল স্ট্রিট, ফোর্ট
বোম্বাই
২ মার্চ, ১৯৪০

প্রিয় সুভাষবাবু,

গত কাল সকালে আমি এখানে পৌঁছেই তাড়াতাড়ি আপনার টেলিগ্রামের (২৯ ফেব্রুয়ারি আমেদাবাদে প্রাপ্ত) জবাব দিচ্ছি। আমি লালা শঙ্করলালের কাছ থেকে তার পেয়েছি তাড়াতাড়ি রামগড় যাওয়ার জন্য। কিন্তু আজকে আমার গোটা দিনটাই লেগে যাচ্ছে গুজরাটের আন্দোলনটাকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিতে এবং ২০ ও ২১ এপ্রিল আমার জেলায় প্রাদেশিক কিষান সভার যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে তার সাফল্য সুনিশ্চিত করতে জোরদার প্রস্তুতির জন্য। আপনি সেই সম্মেলনের উদ্বোধন করতে সম্মত হয়েছেন।

আমি যদি রামগড় সম্মেলনে যাই, ১৫ তারিখে আমাকে বোম্বাই থেকে রওনা হতে হবে, যদি তার আগে না যাই, ১ এপ্রিলের আগে আমি গুজরাতে ফিরতে পারব না। তারপরে প্রাদেশিক সম্মেলন সংগঠিত করবার জন্য মাত্র তিন সপ্তাহ আমার হাতে থাকবে।

এই পরিস্থিতিতে আমি সর্বান্তঃকরণে আপনাকে অনুরোধ করছি, রামগড় থেকে আমাকে অব্যাহতি দিন। দয়া করে অবস্থাটি লালা শংকরলাল এবং অন্য বন্ধুদের বুঝিয়ে দেবেন, যাতে রামগড়ে আমার অনুপস্থিতি নিয়ে তাঁরা ভুল না বোঝেন।

একান্ত আপনার
ইন্দুলাল যাজ্ঞিক

নানিক জি. মোতোয়ানের পত্র

প্রাপক
সুভাষচন্দ্র বোস বাবুজি, কলকাতা
প্রেরক
নানিক জি. মোতোয়ানে

ভারত সরকারের এবং বোম্বাই সরকারের মিলিটারি, রেলওয়ে, দেশীয় রাজ্য সমূহ, পুরসভা সমূহ, প্রভৃতির ঠিকাদার।

শিকাগো টেলিফোন অ্যান্ড রেডিও কোম্পানি লিমিটেড
টেলিফোন ও রেডিও ইঞ্জিনিয়ার এবং জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ঘোষণা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ।

টেলিগ্রাম:	প্রধান কার্যালয়:	শাখা:	২৫ চৌরঙ্গী,
'CHIPHONE'	১২৯ মহাত্মা গান্ধী রোড	হজরতগঞ্জ, লক্ষ্ণৌ	কলকাতা
	পোঃ বক্স ৪৫৯	দ্য মল,	টেলিফোন ১৯৫৩
	ফোর্ট, বোম্বাই	লাহোর	

আপনার ক্রমিক নং...
আমাদের ক্রমিক নং এনজিএম /জিআর/২১/৫৪৯৮

কলকাতা
মার্চ ২৫, ১৯৪০

শ্রীসুভাষ চন্দ্র বোস
৩৮/২ এলগিন রোড
কলকাতা

শ্রদ্ধেয় শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস,

আমি আপনাকে বোম্বাই থেকে কয়েকখানি পত্র দিয়েছি, কিন্তু আপনার কাছ থেকে কখনও জবাব পাইনি।

এখন, রামগড় থেকে কলকাতা আসবার সময়ে, আমাদের উভয়ের বন্ধু শ্রীনন্দলাল পারেখ কর্তৃক আমি অনুরুদ্ধ হয়েছি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং আপনার পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্য চেষ্টা করতে।

কেবলমাত্র রামগড়েই কয়েক মিনিটের জন্য আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের আনন্দ আমি

লাভ করেছিলাম। তখন আপনি বিজয়ীর শোভাযাত্রা নিয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আমি আপনার চলচ্চিত্র গ্রহণ করবার আনন্দ লাভ করি। তার আগেও দু-তিন বার আপনার শোভাযাত্রার চলচ্চিত্র আমি গ্রহণ করেছি। আপনি আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন, সহানুভূতির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। তার ফলেই আমি আপনাকে চিঠি লিখতে উৎসাহ পাই। তাই এই চিঠিটি লিখছি।

প্রত্যেক প্রদেশে লাউড স্পিকার বসানোর সব অর্ডার আমাদের দিয়ে কংগ্রেস আমাদের সাহায্য করে থাকে। এখানে কলকাতায় আমার অফিসে খোঁজ নিয়ে আমি জানলাম, আমরা আপনার আশীর্বাদ লাভ করিনি।

আমাদের কোম্পানির দোষ যাই থাক, আপনাকে দয়া করে সে সব অগ্রাহ্য করে আপনার পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে। কংগ্রেস শাসিত প্রত্যেকটি প্রদেশ তাই করে। দয়া করে আপনার সংগঠকদের নির্দেশ দেবেন, আমাদের সাহায্য করতে।

আমাদের ধার্য্যমূল্য কম, যুক্তিসঙ্গত। আমি বিশ্বাস করি, এরপর থেকে আপনার পৃষ্ঠপোষকতা আমরা লাভ করব। এবং আপনি দেখবেন (আপনি জানেন), আমাদের কাজে আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

বিশ্বাস করি, বিষয়টি আপনি দেখবেন। দয়া করে আমার অনুরোধ রক্ষা করবেন।

শ্রদ্ধা সহকারে

আপনার একান্ত
নানিক জি. মোতোয়ানে

করিম এ. চশমার পত্র

টেলিগ্রাম : GARDEN CALCUTTA

টেলিফোন পি. কে. ১৩৩৩

চশমা টি কোম্পানি
টি প্ল্যান্টারস ও ডিলারস

লিজ গ্রাহক: কুচিলা টি. ই.
কোড: বেন্টালিস অ্যান্ড এ.বি.সি.
পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণ

ক্রমিক নং ৪০/ ৬৮

১৭, ফুলবাগান রোড
এনটালি
কলিকাতা
তারিখ ৯ এপ্রিল ১৯৪০

চশমা ব্র্যান্ড
Sportsman
Flavourous
Md Sporting
Loose
All kinds

শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস সমীপেষু
৩৮/২ এলগিন রোড
কলিকাতা

প্রিয় মহাশয়,

আপনাকে এই পত্র লেখার স্বাধীনতা নেওয়ার জন্য আমার ক্ষমা করবেন। আশা করি আপনি তাতে অসন্তুষ্ট হবেন না।

আমার প্রবল বাসনা, আপনার নামে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ চায়ের একটি নতুন ব্র্যান্ড বাজারে ছাড়ব। মোড়কের গায়ে আপনার ছবি থাকবে। এই ব্র্যান্ডটি যার নাম আমি দিতে চাই 'সুভাষ বোস চা' ঠিকমতো রেজিস্ট্রি করা হবে। তার নমুনা আপনাকে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হবে, সব কিছু করণীয় সম্পন্ন হওয়ার পর।

অতএব আমি কি উপরোক্ত প্রস্তাবে সহৃদয় সম্মতির জন্য আপনাকে অনুরোধ করতে পারি? আমি আন্তরিকভাবে আশা করি আমার এই প্রার্থনা বৃথা হবে না।

আপনাকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাই এবং আশা করি আপনার মূল্যবান সময়ের মধ্যে বিঘ্ন ঘটাবার জন্য ক্ষমা করবেন।

আপনার বিশ্বস্ত
করিম এ. চশমা
সত্ত্বাধিকারী

গগনবিহারী এল. মেহতার পত্র

কলকাতা, ১৩ এপ্রিল, ১৯৪০

গগনবিহারী এল. মেহতা

প্রিয় সুভাষবাবু,

আমি আপনার ১১ এপ্রিলের ব্যক্তিগত পত্র এবং সেই সঙ্গে আপনার তারিখবিহীন আনুষ্ঠানিক পত্র পেয়েছি। ওটি আমি বোম্বাইয়ে আমার সদর কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি, বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধানের এবং আমাদের রেঙ্গুন কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে, তাদের জবাব পেলে আমি আপনাকে জানিয়ে দেব।

সম্প্রতি আমার অ্যাপেনডিসাইটিস অস্ত্রোপচার হয়েছে এবং তারপর থেকে সেরে উঠছি। বায়ু পরিবর্তনের জন্য শীঘ্রই কোথাও যাব মনে করছি।

আপনার একান্ত
গগনবিহারী এল. মেহতা

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বোস
কলকাতা

আগাথা হ্যারিসনের পত্র

ইন্ডিয়া কনসিলিয়েশন গ্রুপ

চেয়ারম্যান
কার্ল হিথ
দয়া করে উত্তর পাঠান:
সাম্মানিক সম্পাদক
আগাথা হ্যারিসন
এখানে—

২, ক্র্যানবোর্ন কোর্ট
অ্যালবার্ট ব্রিজ রোড,
এস. ডবলু. ১১
ব্যাটারসি ২৪০০

এপ্রিল ২০, ১৯৪০

প্রিয় সুভাষ বোস,

আমার মনে হয় আপনি এবং আপনার দাদা গত সপ্তাহে সি. এফ. অ্যানড্রুজের স্মৃতিতে অনুষ্ঠিত পারলৌকিক ক্রিয়ায় ব্যবহৃত অর্ডার অব সার্ভিস দেখতে চাইবেন। তাঁর প্রয়াণ আমাদের কাছে এক বিরাট আঘাত। কেননা আমরা শুনেছিলাম তাঁর অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল। তাঁর সঙ্গে এই বাংলোতে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা এমন একটি সৌভাগ্য যা আমি অতি মূল্যবান মনে করি। সদ্য প্রাপ্ত ডাকের চিঠিতে দেখলাম কলকাতার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আপনি ছিলেন, জেনে খুশি হয়েছি।

একান্ত আপনার
আগাথা হ্যারিসন

মেঘনাদ সাহার পত্র

প্রিয় সুভাষবাবু,

কয়েকদিন আগে আপনি অনুগ্রহ করে আমার কাছে, কলকাতা শহরের উন্নতির জন্য রচিত প্রকল্পের কথা জানতে চেয়েছিলেন। আমি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করছি। ইতিমধ্যে বিশ্বের অনেক ঘটনা যে আকার নিচ্ছে সেটা আমরা অনেক আগেই অনুমান করেছিলাম।

আমি এই সঙ্গে একটি আবেদনের অনুলিপি পাঠালাম, যেটি রেজিস্টারের মাধ্যমে কলিকাতা করপোরেশনে পাঠানো হবে। এই বছর আমরা সায়েন্স কলেজের রজতজয়ন্তী পালন করছি, এবং সেই উপলক্ষে একটি বিজ্ঞান ও শিল্প প্রদর্শনী করব। সেই উদ্দেশ্যে ২৫,০০০ টাকা অনুদানের জন্য আমরা কলকাতা করপোরেশনের কাছে আবেদন করেছি। এই সঙ্গে আবেদনের যে অনুলিপি রয়েছে তাতে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। আপনি যদি আপনার শক্তিশালী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন আমি সবিশেষ বাধিত হব। আমার ইতিমধ্যে মেয়র মি. এম. আর. সিদ্দিকির সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁর মনোভাব খুব অনুকূল শুধু নয়, অত্যন্ত উৎসাহজনকও বটে।

এই প্রদর্শনী যদি আমার যথাযোগ্যভাবে করতে পারি, কলকাতার নাগরিকদের কাছে সেটা একটা অনুপ্রেরণার কারণ হবে। আমাদের আবেদনপত্রে ন্যূনতম কত অর্থ আমাদের প্রয়োজন জানিয়েছি এবং আমি আশা করব সম্পূর্ণ অর্থই আমাদের দেওয়া হবে।

আপনার একান্ত
এম. এন. সাহা

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বোস
অলডারম্যান, কলিকাতা করপোরেশন
৩৮/২ এলগিন রোড
কলকাতা

রজত জয়ন্তী
ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি
(২৭ মার্চ ১৯১৪ তারিখে শিলান্যাস হয়েছিল)

সম্পাদকমণ্ডলী
অধ্যাপক এম. এন. সাহা
অধ্যাপক বি. সি. গুহ
৯২, আপার সার্কুলার রোড
টেলিফোন রিজেন্ট ১৫৯ ও ১৬০

অধ্যাপক কে. পি. চট্টোপাধ্যায়
৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
টেলিফোন, আলিপুর ৩৯৭

৯২, আপার সার্কুলার রোড
কলকাতা
১৯৪০

প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারিক
কলিকাতা করপোরেশন
কলকাতা

প্রিয় মহাশয়,

ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির রজতজয়ন্তী কমিটির পক্ষ থেকে, আমরা করপোরেশনকে অনুরোধ করছি ১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির রজত জয়ন্তীর সময়ে যে বিজ্ঞান এবং শিল্প প্রদর্শনীর প্রস্তাব করা হয়েছে, তার জন্য ২৫,০০০ টাকা অনুদান যেন দেওয়া হয়। প্রদর্শনীটি কমপক্ষে তিন-চার সপ্তাহ খোলা থাকবে, এবং কলকাতায় নাগরিকগণ সহ জনসাধারণ সকলের জন্যই প্রদর্শনীটি উন্মুক্ত থাকবে।

(১) আপনার সম্ভবত জানা আছে, ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ১৯১৪ সালের ২৭ মার্চ স্থাপিত হয়েছিল এবং গত বৎসর তার অস্তিত্বের ২৫ বৎর্সর পূর্ণ হয়। কলেজের রজত জয়ন্তী যথাযোগ্য ভাবে পালন করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় একটি কমিটি নিযুক্ত করেছে। কমিটি সিদ্ধান্ত করেছে, উৎসবের প্রধান একটি অঙ্গ হবে একটি বিজ্ঞান ও শিল্প প্রদর্শনী এবং আশা করা যায়, ভবিষ্যতে সেটি কলকাতা শহরের জন্য একটি স্থায়ী বিজ্ঞান ও শিল্প জাদুঘরে পরিণত হবে। শুধু এই শহরে নয়, এই প্রদেশে, এবং এই সমগ্র ভারতে সেটি হবে প্রথম সে জাতীয় জাদুঘর।

(২) জাতীয় জীবনে বিজ্ঞান এখন এত বড় একটি ভূমিকা পালন করছে যে তাকে অবহেলা করা যায় না। এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে উত্তমরূপে পরিচিত হওয়া এখন শুধুমাত্র পেশাদার বিজ্ঞানীদের নয়, গড়পড়তা নাগরিকেরও প্রয়োজন। এই প্রয়োজন পূরণের জন্য বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশ গত ২৫ বছর বিজ্ঞান প্রদর্শশালা স্থাপন করে চলেছে; সর্বাপেক্ষা খ্যাতিলাভ করেছে মিউনিকের ডয়েশ প্রদর্শশালা, লন্ডনে সাউথ কেনসিংটনের বিজ্ঞান প্রদর্শশালা এবং নিউইয়র্কের বিজ্ঞান প্রদর্শশালা। এই সব প্রদর্শশালায় বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখার প্রতিনিধি স্থানীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরচিত পারিপার্শ্বিকে প্রদর্শিত হয়, এবং দর্শক এবং ছাত্রদের স্বল্পমূল্যে এইসব পরিদর্শন করবার এবং কখনও কখনও নিজেদেরই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার সুযোগ দেওয়া হয়। প্রায়শই দর্শকদের সামনে কোনও বৈজ্ঞানিক বিষয় একজন স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ মডেলের সাহায্যে ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন। সে সব সব সময়ে প্রস্তুত রাখা হয়। এইসব মিউজিয়ম শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে স্বীকতি লাভ করেছে এবং এক বৎসরে লক্ষ লক্ষ লোককে সেখানে যেতে দেখা গিয়েছে। যেমন, মিউনিকে ডয়েস মিউজিয়ামে বার্ষিক দর্শনার্থীর সংখ্যা ১০ লক্ষর বেশি। এবং বিদ্যালয় এবং কলেজ থেকে দলে দলে এসে ছাত্রছাত্রীরা এখানে টেবিলে রাখা নির্দেশাবলী দেখে নিজেদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে, অতি সাধারণ দৃশ্য। একবার আরম্ভ করে দেওয়া হলে, প্রদর্শশালা কর্তৃপক্ষের আর বেশি অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। বস্তুত তাদের অধিকাংশ স্বনির্ভর হয়ে গেছে।

(৩) ফ্রান্স এতদিন এ সব বিষয়ে জার্মানি, ইংল্যান্ড ও আমেরিকার পিছনে ছিল। কিন্তু ১৯৩৬ সালে পপুলার ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট প্যারিসে ক্ষমতায় এলে তারা বিজ্ঞান মিউজিয়মের গুরুত্ব উপলব্ধি করে, এবং বিখ্যাত বিজ্ঞানী পেরিঁর পরামর্শে বৃহৎ আকারে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। 'প্যালেস অব ডিসকভারি' নামে বিশেষভাবে নির্মিত একটি বৃহৎকক্ষে তার

প্রদর্শন হয়েছিল, প্রায় ত্রিশ লক্ষ লোক সেটি দেখতে গিয়েছিল এবং সরকার তা থেকে লাভ করেছিল প্রায় ৯০ লক্ষ ফ্রাঁ। পরবর্তীকালে প্রদর্শনীটি একটি স্থায়ী মিউজিয়ামে রূপান্তরিত করা হয় এবং এখন সেটি শুধু অল্পবয়সিদের নয়, বয়স্কদেরও শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

(৪) এটা একটা পরিতাপের বিষয় যে, মহতী কলকাতা নগরীতে সেরকম কোনও সংস্থা নেই। সাধারণ মানুষ যার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে এবং যেটি নিঃসন্দেহে জনসাধারণের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য একটি মস্ত বড় জায়গা হতে পারে। এই কারণে রজত জয়ন্তী কমিটি ভেবেছে, একটি বিজ্ঞান ও শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করে এ বিষয়ে তাঁরা নেতৃত্ব দেবেন এবং তাঁরা কলকাতা এবং তার বাইরের বিজ্ঞানীদের সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে এ বিষয়ে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ১২,০০০ টাকার অনুদান মঞ্জুর করেছে এবং ৯২, আপার সার্কুলার রোডের জমি সংগঠনকে ব্যবহার করবার জন্য দিয়েছে। তা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে প্রদর্শনীটি যথাযোগ্যভাবে সংগঠিত করতে হলে আরও বেশি অর্থের প্রয়োজন। বস্তুত আমাদের আনুমানিক হিসাবে ৫০,০০০ প্রয়োজন হবে। প্রদর্শনীটি যেহেতু কলকাতার সধারণ মানুষের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হবে বলে আশা করা হচ্ছে, আমরা আপনাদের কাছে ২৫,০০০ টাকার জন্য আবেদন করছি। যাতে প্রদর্শনীটি সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, সারা ভারতে কলকাতা শহর সঙ্গত কারণেই মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি কেন্দ্র হিসাবে উচ্চ খ্যাতি লাভ করেছে। এখানকার বিজ্ঞান শিক্ষা এবং গবেষণা অন্যত্র সর্বশ্রেষ্ঠ যে কাজ হয় তার সঙ্গে সম্পূর্ণ তুলনীয়, ভবিষ্যতেও সর্বদা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে কলকাতা পথপ্রদর্শক বলে পরিগণিত হবে। সেই কারণে, ভারতের প্রথম বিজ্ঞান মিউজিয়াম যদি কলকাতাতেই স্থাপিত হয় সেটা উপযুক্ত কাজই হবে।

(৫) আমরা যে অনুদান প্রার্থনা করছি, ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ১৯২৩ অনুযায়ী কলকাতা করপোরেশনের বিশেষ ক্ষমতায় সেটা বিধিসম্মত। ওই আইনের ৪৭৭ ধারায় (উপধারা ১৩) করপোরেশন শুধু প্রযুক্তি শিক্ষার উন্নয়নই করতে পারে তা নয়, শিক্ষার বিস্তারের জন্য প্রদর্শনী আয়োজন করতে যা ব্যয় হয়, তাতেও অনুদান দিতে পারে (উপধারা ১৫)। অতএব আইনের দিক থেকে আমরা যে সাহায্য চাইছি তা ওই আইন মতে সিদ্ধ।

আমাদের আবেদন আপনি দয়া করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সামনে পেশ করলে আমরা আনন্দিত হব।

আপনার বিশ্বস্ত
(স্বাক্ষরবিহীন)

কান্তিলাল পারেখকে

প্রাপক : কান্তিলাল পারেখ
২৬, মেরিন ড্রাইভ
বোম্বাই

২৫. ৬. ৪০

প্রিয় কান্তিলাল,

আশা করি তোমরা সবাই ভাল আছ। অনেকদিন তোমাদের চিঠি পাইনি। তোমার হয়তো মনে আছে আমার কাছ থেকে তুমি কিছুদিন আগে টাকা ধার নিয়ে ছিলে। এখন আমার টাকার জরুরি দরকার। এখন কি তুমি আমার কিছু টাকা দিতে পারবে? যদি পার, খুশি হব ও নিশ্চিন্ত বোধ করব।

কাল আমি কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছি। তুমি আমার ঠিকানা জানো। ৩৮/২ এলগিন রোড, কলকাতা।

সার্বিক ভালাবাসা নিও
তোমার সুভাষ

এম. এ. এইচ. ইস্পাহানিকে

১৪.১০.৪০

প্রিয় হাসান,

দীর্ঘকাল আমি জনজীবন সংক্রান্ত কাজকর্ম থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হওয়ার কারণে আমার মনে হয়, কলকাতা করপোরেশন অলডারম্যানের পদ থেকে আমার ইস্তফা দেওয়া উচিত। তাতে আমি বিবেকের অস্বস্তি থেকে রেহাই পাব এবং দল ও সদস্যেরা যা ভাল মনে করেন সে ভাবে কাজ করতে পারবেন। বিষয়টি আমি সেক্রেটারি শ্রীযুত ইন্দ্রভূষণ বোয়েদের মারফৎ আমাদের দলকে জানিয়েছি এবং তাঁদের পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করছি। দল যদি প্রস্তাবটি অনুমোদন করে, আমি আশা করি আপনার কোনও আপত্তি থাকবে না কারণ এর চেয়ে ভাল অন্য কোনও বিকল্প নেই।

যেহেতু আমি একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব গ্রহণ করেছি এবং যেহেতু আমরা একযোগে কাজ করে এসেছি, আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে আপনার দলকে এ বিষয়ে অবহিত না করা আমার অন্যায় হত।

আপনার বিশ্বস্ত
সুভাষচন্দ্র বোস

মাননীয়
এম. এ এইচ ইস্পাহানি
কাউন্সিলার
কলকাতা করপোরেশন
৫ ক্যামাক স্ট্রিট
কলকাতা

বরদাবাবুকে

প্রেসিডেন্সি জেল
২৯.১০.৪০

প্রিয় বরদাবাবু,

আজ সকালে কাগজ খুলেই প্রথমে আমার মনে হল স্বর্গতঃ বাবু সূর্যকুমার সোমের কথা। তিনি শুধু দেশবন্ধু দাশের শিষ্য হিসাবে আমাদের গুরুভাই ছিলেন না, আমার একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধুও ছিলেন। আমি কখনও ভুলতে পারব না, ময়মনসিংহের বাড়িতে কতবার আমি তাঁর অকৃপণ আতিথেয়তা উপভোগ করেছি, শেষ যেবার আমি যাই, শূন্য গৃহ আমাকে আতিথেয়তা প্রদান করেছিল। সূর্যবাবুর অকাল মৃত্যুতে যে শূন্যস্থান তাঁর নির্বাচন অঞ্চলে তৈরি হল, কখনও তা পূরণ হবে না।

আর কিছু লিখবার আগে, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আমার জন্য নিজেদের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেছেন বলে শ্রীযুত মজুমদার, শ্রীযুত নিয়োগী ও শ্রীযুত গুহকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবেন। আমি বিশেষভাবে চাই শ্রীযুত গুহকে আজ সকালের কাগজে তাঁর পত্রের জন্য যেন আপনি তাঁকে ধন্যবাদ জানান। বিবৃতিটিতে হৃদয়ের যে মহানুভবতা ধ্বনিত হয়েছে, আমি তা বিশেষভাবে প্রশংসনীয় মনে করি। আপনি তাঁকে এ বিষয়ে নিশ্চিত করতে পারেন যে, আমার মধ্যে হৃদয়ের উদারতার অভাব কোনওদিন তিনি দেখতে পাবেন না।

কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে আমার দাঁড়ান উচিত কিনা সে বিষয়ে বন্দিত্বের কারণে আমার পক্ষে বন্ধু এবং সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করা সম্ভব হয়নি, এবং হঠাৎ আমার গৃহীত সিদ্ধান্তে তারা অবাক হলে আমি বিস্মিত হব না, জেলখানা থেকে লেখা পত্রে, কোন কোন কারণে আমি সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি তার সব খুলে বলা সম্ভব নয়, কিন্তু আমি নিশ্চিত, রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন সবাই স্বতঃই বুঝতে পারবেন, কেন আমি সে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং সর্বান্তঃকরণে তার অনুমোদন করবেন। এই পত্রে আমি দুটি-একটি মাত্র কারণের উল্লেখ করব। সামনের আইনানুগ সাক্ষাৎকারেও আমি আপনাকে সে-বিষয়ে জানাতে পারতাম কিন্তু আমার পক্ষে সেটা উচিত হত না। সেই কারণেই এই চিঠি।

আমার নির্বাচন, অন্যান্য কারণে তার উপযোগিতা ছাড়াও, মৌলানা আজাদের এবং তিনি যাঁদের প্রতিনিধিত্ব করছেন তাঁদের চোখ খুলে দেবে। বি. পি. সি. সি.-র ওপর আক্রমণ করতে গিয়ে তাঁর অপদস্থ হওয়া, এবং তার ফলে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তোলা, এ-সবের পরে তিনি ভেবেছিলেন তিনি আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগ নেবেন, এবং আইনসভার রণাঙ্গনে আমাদের ওপর আবার আক্রমণ করবেন, যাতে জনসমক্ষে আমরা খুব দুর্বল হয়ে পড়ি। আবার তাঁর মোহভঙ্গ হবে। তাঁর সর্বশেষ আক্রমণ, যাকে আমি বলি তাঁর বিজয়ার উপহার, দেশে আমাদের শক্তি ও মর্যাদা আগেই বাড়িয়ে দিয়েছে এবং সত্য এবং অহিংসার আদর্শের প্রতি মৌলিক আনুগত্য জানিয়ে যারা প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাচার, হিংসা এবং ঘৃণার আশ্রয় নেয়, তাঁদের সত্যিকারের চেহারা আরও বেশি করে উদ্ঘাটিত করবে। এই বিষয়ে প্রাক্তন মেয়র এবং বঙ্গীয় কংগ্রেসের আইনসভা দলের সহকারী নেতা সন্তোষ কে. বাবুর চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া উত্তর দেশের সকলের বারে বারে পড়া উচিত। এই পর্যায়ে আমি মৌলানাকে নিয়ে আমার তিক্ত-অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলব না, আরেক দিনের জন্য তুলে রাখব। তবে, বর্তমানে দেশে মৌলানার অনুগামী কতজন

সে প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক নয়। প্রত্যেক নেতা, যিনি নেতা নামের যোগ্য, তার উচিত কিছু সংখ্যক অনুগামীকে কংগ্রেসে নিয়ে আসা। মৌলানার অনুগামী কতজন বলে তিনি দাবি করতে পারেন? আমি জানি না।

এতদিন পর্যন্ত আমাদের নীতি মৌলানা এবং কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে আক্রমণাত্মক না হওয়া, কিন্তু আত্মরক্ষা আমাদের করতেই হবে এবং যখনই আক্রমণ আসবে প্রতি-আক্রমণ হবে কঠোর। জওহলাল যেন সে বিষয়ে অবহিত থাকেন। এবং প্রতি আক্রমণ হবে যারা দেশে, যেখানেই আমাদের বন্ধু এবং সমর্থকেরা আছেন। শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে সংগ্রাম যদি দীর্ঘ এবং তিক্ত হতে হয়, আমরা তার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। দেশে আমাদের অবস্থা কী আমরা জানি। উপরন্তু যৌবন আমাদের পক্ষে এবং অসীম ধৈর্য এবং নিপীড়ন সহ্য করবার ক্ষমতা, কাজেই আমরা সাফল্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত। এখন বৃহত্তর প্রশ্নগুলি নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে পারি, কিন্তু মৌলানা ভাববেন না, সেই কারণে শীর্ষ নেতৃত্বের ধ্বংসাত্মক আক্রণের হাত থেকে আমরা আমাদের গৃহ রক্ষা করতে পারব না।

আমার নির্বাচন থেকে আরও বোঝা যাবে যে, কেন্দ্রীয় আইনসভা বর্জনের নীতির আমরা প্রবলভাবে অপছন্দ করি। বোধহয় কংগ্রেস দলের রাজনৈতিক কর্তব্যে এই অপরাধমূলক অবেহেলার জন্য ভারত প্রতিরক্ষা আইন বর্তমান আকারে কেন্দ্রীয় আইনসভায় গৃহীত হতে পারল এবং জনগণের কণ্ঠস্বর কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রায় শুনতেই পাওয়া যাচ্ছে না। বলা নিষ্প্রয়োজন শীর্ষ নেতৃত্বের এই আত্মহত্যার নীতি আমরা অনুসরণ করব না।

মোট কথা, আমার নির্বাচন, তার অন্যান্য তাৎপর্যের সঙ্গে এই অর্থও বহন করে যে, আমরা মৌলানা এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোর চ্যালেঞ্জ, প্রত্যেকটি রণাঙ্গনে এবং দেশের প্রত্যেকটি অংশে আমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত। আমাদের দাবি, ভারতে জনমতের আমরাই প্রকৃতি প্রতিনিধি এবং যারা পথ চলতে দ্বিধাগ্রস্ত, তাদের চেয়ে আমরা ভাল কংগ্রেসি। আমাদের দাবি যে সঙ্গত আরও প্রমাণ দরকার হলে, আমাদের আচরণের দ্বারা তার আরও প্রমাণ দেব।

শ্রদ্ধা সহকারে,

আপনার একান্ত
সুভাষ চন্দ্র বোস

সর্দার শার্দূল সিং কবিশেরকে

প্রেসিডেন্সি জেল
কলিকাতা
৪.১১.৪০

ব্যক্তিগত: প্রকাশের জন্য নয়

প্রিয় সর্দারজি,

আজ সকালে আমি আপনাকে এই টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছি, আশা করি আপনি যথা সময়ে তা পাবেন।

শার্দূল সিং কবিশের
লাহোর,

আজকের সংবাদপত্রের খবর প্রসঙ্গে: আশা করি আপনি মহাত্মা গান্ধীর অনশনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাবেন। চিঠি দিচ্ছি। সুভাষবোস

আজকের খবরের কাগজে প্রকাশিত, মহাত্মা গান্ধী অনশন করবেন মনস্থ করেছেন, এবং সে-কথা তিনি সরকারকে জানিয়েছেন। তার আগে খবরের কাগজে যে খবর বেরিয়েছিল তাতে ইঙ্গিত ছিল, যতদূর সম্ভব গান্ধীজি আবার অনশনে যাবেন, কাজেই আজকের ঘটনা কারও কাছেই অপ্রত্যাশিত নয়।

আমার এই চিঠি লেখার উদ্দেশ্য, এ বিষয়ে আপনাকে আমার মতামত জানানো, যাতে আপনি যদি সে-বিষয়ে একমত হন, (এবং আমি নিশ্চিত আপনি একমত হবেন) এই পরিস্থিতিতে আপনি যা প্রয়োজন মনে করেন করতে পারেন, গান্ধীর অনুগামীদের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া কী হবে সে-বিষয়ে কোনও দ্বিধা বা সন্দেহ না রেখে।

রাজকোটের অনশনের ফলে যে বিপর্যয় ঘটল, আমি ভেবেছিলাম গান্ধীজির অনশন বোধহয় এরপরে আমাদের আর দেখতে হবে না। এখন মনে হচ্ছে আমি ভুল ভেবেছিলাম। মহাত্মা গান্ধী তাঁর "হিমালয় প্রমাণ" ভুলের পরেও বদলাবেন না। এই অনশন যদি মানুষের ভাবাবেগের সুযোগ নিয়ে তাদের ওপর জোর খাটানো না হয়, তা হলে এটা কী? অহিংসার বাণী যিনি প্রচার করেন, এই অস্ত্র কেন প্রয়োগ করবেন? অনশনের প্রশ্নে তিনি যদি অন্তরের আলো দেখতে পান, তাতে হিংসার চরিত্র বদলায় না, নৈতিক বলপ্রয়োগ এবং হিংসা তাতে অহিংসায় পরিণত হয় না। আমাদের মতামত সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের অহিংসা দার্শনিক অহিংসা নয়। কিন্তু আমরা সেই কারণে উপবাস অথবা অনশন ধর্মঘট বাতিল করে দিই না। প্রকৃতপক্ষে অনশন আমি আগেও করেছি, বাধ্য হলে আবার করতে পারি।

যতীন দাস যখন অনশন ধর্মঘট করেছিলেন এবং আত্মাহুতি দিয়েছিলেন, মহাত্মা তাঁর সম্পর্কে একটি সদয় বাক্যও ব্যয় করেননি। বস্তুত তিনি এক বন্ধুকে লিখেছিলেন যদি তিনি মুখ খোলেন, তাঁকে এমন কিছু বলতে হবে যা প্রশংসাসূচক নয়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী নিজে যখন খুশি অনশন করবেন এবং আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, তাঁর বেলায় নৈতিক জবরদস্তি অহিংসা হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ কী বিশ্বাস করবে, তার অবশ্যই একটা সীমা আছে। একদা যারা সম্পূর্ণ অন্ধ ভক্ত ছিল এখন তাদেরও চোখ খুলতে আরম্ভ করেছে।

মহাত্মা গান্ধীর এই অনশন-ধর্মঘট সম্পর্কে আমার প্রধান আপত্তি, এটাকে তিনি গণআন্দোলনের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করছেন। তার আগে তিনি নিজে সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ

করে দলটিকে নপুংসকে পরিণত করেছেন। আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যাপারে, ব্যক্তিগত অথবা জাতীয় মর্যাদা ও সুবিচারের প্রতিষ্ঠার জন্য যদি তিনি সেই অস্ত্রটি ব্যবহার করেন, ব্যক্তিগতভাবে তাতে আমার কোনও আপত্তি হবে না। আমরা দেখলাম, যেমন রাজকোটে, এ ক্ষেত্রেও তেমনি, অনশনের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে যখন গণ আন্দোলনটিকে গলা টিপে মারা হল। সে রকম অনশন দিয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আন্দোলনের দিক থেকে কিংবা জনসাধারণ যা চায় তার দিক থেকে যিনি অনশন করছেন সেই ব্যক্তির দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। অধিকার সহানুভূতি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হতে পারে। গণ আন্দোলনের পথে স্বাভাবিকভাবে, অনিবার্য পরিস্থিতির চাপে যদি এই অনশন আসত, অবস্থাটা অন্য রকম হত।

একটু ভেবে দেখা যাক, এই সব অনশনের দ্বারা মহাত্মাজি এ পর্যন্ত কী পেয়েছেন। কৃচ্ছ্রসাধনের নিঃসন্দেহে একটা নিজস্ব নৈতিক মূল্য আছে কিন্তু তার অতিরিক্ত ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্যিকারের কোনও সুফল তাঁর অনশন থেকে পাওয়া যায়নি। পুনায় অনশন তপশিলি জাতিকে অবশ্য কিছু অধিকার দান করেছিল, কিন্তু সেই লাভও চাপা পড়ে যখন তিনি কার্যত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সামগ্রিকভাবে মেনে নেন, এবং তপশিলি জাতি সমূহের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন আংশিকভাবে স্বীকার করেন। তার ফলে অনশনের দ্বারা ফল লাভের হিসাবে দেখা যায়, কার্যত লাভ হয়েছে শূন্য। তা সত্ত্বেও অনশন যতদিন গণআন্দোলনের স্থান অধিকার না করেছে, তাকে যথাযথ করেছে, তার প্রতি কোনও বিরোধিতার প্রয়োজন হয়নি। এখন অনশনকে কাজে লাগান হচ্ছে গণআন্দোলনকে ভিতর থেকে ধ্বংস করা, এবং তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে, তার জায়গায় একটি বিকল্পকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। কাজেই আমরা যারা গণ আন্দোলনে বিশ্বাসী, অনশনকে নৈতিক সমর্থন দিতে পারি না। বরং, আমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত খোলাখুলি অনশনকে নিন্দা করা, তাতে গান্ধীবাদী মহল যদি আমাদের ভুল বোঝেন, নিন্দা করেন, সেই ঝুঁকি সত্ত্বেও।

প্রকাশ্যে এ বিষয়ে আমার কোনও বিবৃতি দেওয়া ঠিক হবে না, সে অনুমতি আমাকে দেওয়া হলেও, কারণ আমি এখন মুক্ত নই। এর মধ্যে আমার নামও টেনে আনা উচিত নয়। কিন্তু এবিষয়ে আপনার একটা বিরাট দায়িত্ব আছে। আপনি যেহেতু সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের সভাপতি, আমার অনুপস্থিতিতে জনসাধারণ আপনার কাছে নেতৃত্ব প্রত্যাশা করবে। এই চিঠি লিখবার আমার আরেকটি উদ্দেশ্য আপনাকে আশ্বস্ত করা যে, এ-বিষয়ে, আমি মুক্ত মানুষ হলে যা করতাম, আপনি যদি তাই করেন, আপনি আমার পূর্ণ সমর্থন পাবেন।*

আপনার ভাতৃতুল্য
সুভাষ সি. বোস

* আরেকটি কথা বললেই আমার বক্তব্য শেষ হবে। এম. গান্ধী অনেকবার বলেছেন তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে বিব্রত করতে চান না। তাঁর অনশন কি গভর্নমেন্টকে বিব্রত করবে না? এবং গভর্নমেন্ট যতটা বিব্রত করবে, জনগণকে কি তার চেয়ে বেশি বিব্রত করবে না, যেহেতু অনশন সময়ে তিনি জেলখানায় থাকবেন না?

শ্রদ্ধা সহকারে,
এস সি বি

সর্দার শার্দূল সিং কবিশের
চেম্বারলেন রোড
লাহোর

অমিয় বোসকে

বিমান ডাকে

প্রেসিডেন্সি জেল
কলকাতা
১৫.১১.৪০

প্রিয় অমিয়,

কয়েক মাস আমি তোমাকে চিঠি দিইনি, গ্রেফতারের পর থেকে আমার লিখবার বিশেষ কিছু নেই। তবে, বাড়িতে তুমি নিয়মিত যে-সব চিঠি ও টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছ সে-সব থেকে আমি তোমার খবর পেয়ে যাচ্ছি। সর্বদা আমি প্রার্থনা করি, ভগবান যেন তোমাদের সব রকম বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

আজ আমার একটি বিশেষ কথা তোমাকে লিখবার আছে। তাই এই চিঠি। টাইমস পত্রিকায় তুমি পড়েছ, ভারত সচিব মি. এমারি, জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে আমার গ্রেফতার ও কারাদণ্ড সম্পর্কে মি. সোরেনসেনের উত্থাপিত প্রশ্নের কী উত্তর দিয়েছেন। জরুরিভিত্তিতে ভারত সচিব তখন বলেন, আমাকে আটক করা হয়েছে কলকাতা হলওয়েল মনুমেন্টের অপসারণের জন্য সৃষ্ট পরিস্থিতি সংক্রান্ত কারণে। সেটা সম্পূর্ণ সত্য কখনওই নয়।

প্রকৃত ঘটনা হল, তারপরে হলওয়েল মনুমেন্ট সরকার সরিয়ে নিয়েছে। আরেকটি বন্ধু এবং আমি, এই দু'জনকে বাদ দিয়ে হলওয়েল মনুমেন্ট সত্যাগ্রহ সংক্রান্ত কারণে যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাদের সকলকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তাদের মুক্তি পাওয়ার পর আড়াই মাস কেটে গেছে। এতদিন আমাকে বন্দি রাখা হয়েছে ভারত প্রতিরক্ষা আইনের ২৬ ধারায়, বিনা বিচারে, এবং সেই একই আইনের ৩৮ ধারায় দু'জন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে কয়েক মাস আগে প্রদত্ত তিনটি বক্তৃতা এবং 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এর একটি প্রবন্ধ, যেটি আমার লেখা নয়, তার জন্য আমার নামে মামলা রুজু করা হয়েছে। আপনি বুঝতে পারবেন, এ এক অভূতপূর্ব সরকারি কার্যপ্রণালী। এ পর্যন্ত সরকার আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানায়নি, হলওয়েল মনুমেন্টের সত্যগ্রহ বন্ধ করে দেওয়ার পরেও এবং আমার নামে আইনি নালিশ রুজু হওয়ার পরেও বিনা বিচারে কারাদণ্ড কেন চলছে। সরকারকে পরীক্ষা করবার জন্য বিচারক ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে জামিনের আবেদন করা হয়েছে এবং সরকারের মুখপাত্র সেই আবেদনের বিরোধিতা করেছেন। তাতে দেখা গেল, সরকার আইনি প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট হস্তক্ষেপ করছে। গত পরশু দিন একজন বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট খোলাখুলি ঘোষণা করেন, তিনি জামিন মঞ্জুর করবেন, এবং প্রকৃতপক্ষেই তা করেন, কিন্তু তার সঙ্গে যোগ করেন, ২৬ ধারায় আটকের আদেশ সরকার প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত জামিনের আদেশ অকার্যকর থাকবে। এর একটিমাত্র ব্যাখ্যা আমার মনে আসছে, আমি সরকারের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির শিকার।

এখন আমি যা করতে চাই, তা হচ্ছে এই, আমি চাই তুমি এই সমস্ত তথ্য (এবং আরও যে যে তথ্য আমি মেজদাকে বলেছি তোমার কাছে পাঠাতে) ইন্ডিয়া লীগ, ইন্ডিয়ান কনসিলিয়েশন গ্রুপ, স্বরাজ লীগ এবং ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল গ্রুপের বন্ধুদের গোচরে আনবে, যাতে তাঁরা পার্লামেন্টে এবং তার বাইরে আমাদের বন্ধুদের অবহিত করতে পারেন। আমি চাই না এ নিয়ে তুমি তোমার সময় নষ্ট করো। এবং তোমার পড়াশোনা

থেকে তোমার মন অন্যদিকে ফিরিয়ে দিতে চাই না। এই চিঠিটি টাইপ করিয়ে নিয়ে উক্ত সংস্থাগুলিকে পাঠিয়ে দিতে পারো। তখন তারা যা প্রয়োজন করবে। তোমার কাজ ওখানেই শেষ হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক এম. পি.-কে চিনি যার অধিকাংশই লেবার এবং লিবারেল পার্টির, যেমন, মি. সোরেনসেন, মি. থুরিল (লান্সবারির জামাতা), মিল উইলকিনসন, কর্নেল ওয়েজ়উড, আই.এল. পার্স, মি. ভারনন বার্টলেট, লর্ড স্যামুয়েল, লর্ড স্নেল, লর্ড লিস্টোয়েল, লর্ড ফ্যারিংডন— এবং এছাড়া বর্তমান মন্ত্রীসভার শ্রমিক দলের সদস্যবৃন্দ। মি. আর্থার গ্রিনউডকেও আমি আলাদা করে লিখছি। তোমার হয়তো মনে থাকবে মি. গ্রিনউড ১৯৩৮ সালে আমার সে-দেশে থাকার সময়ে ক্যাক্সটন হলে আমার সম্বর্ধনা সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন। পার্লামেন্টের বাইরে যাঁরা আগ্রহী হবেন এবং আমার ব্যক্তিত্বের কথা যাঁরা জানেন, তাঁরা হলেন অধ্যাপক ল্যাস্কি, স্যার ওয়ালটার লেটন, মি. উইকহ্যাম স্টুড, মি. বাসিল ম্যাথিউস এবং লন্ডনের মি. হোরাবিন, অধ্যাপক রেড্ডাওয়ে এবং কেমব্রিজের অধ্যাপক ফে, বার্ট্রান্ড রাসেল এবং অক্সফোর্ডের অধ্যাপক লিন্ডসে প্রমুখ। তাঁদের শুধু উপরোক্ত খবরটি দিলেই চলবে।

তোমার আর বেশি সময় আমি নেব না, এইখানেই থামছি। আমি আশা করি পত্রটি তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যদি নাও হয়, আমি নিশ্চিত জানি, তা হলেও খবরটি অন্যদের মারফত ইংল্যান্ডে পৌঁছবে। আমি মেজদাকে বলছি আমার ব্যাপারে তার বিশদ খবর তোমাকে দিতে। এই চিঠিতে আমি সব সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম।

ইতি
ভালবাসা সহ
তোমার অত্যন্ত প্রীতিধন্য
সুভাষ

শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ বোস
(কুইনস কলেজ, কেম্ব্রিজ)
প্রযত্নে লজ'স ব্যাঙ্ক
৬ পল মল
লন্ডন এস. ডবলু.

মি. গ্রিনউডকে

১৫.১১.৪০

বিমান ডাকে

প্রিয় মি. গ্রিনউড,

আমি নিশ্চিত জানি ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগ আইন (D.O.R.A) এদেশে কী রকম কাজ করছে আপনি জানতে চাইবেন। এখন আমি নিজের 'কেস'টি বলব:

গত জুলাই মাসে আমাকে হঠাৎ ভারত প্রতিরক্ষা আইনের ১২৯ ধারায় গ্রেফতার করে

জেলে নিয়ে আসা হয়েছে। সরকার আমার গ্রেফতারের কারণ জানিয়ে আমার গ্রেপ্তারের কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি, যতদিন না মি. সোরেনসেন প্রশ্নটি পার্লামেন্টে তোলেন।

তার উত্তরে ভারতসচিব মি. এমারি জানান, আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কলকাতা হলওয়েল মনুমেন্টে অপসারণ অথবা বিনাশ সংক্রান্ত আন্দোলনের ঘটনায়। তারপরে বঙ্গদেশে মুখ্যমন্ত্রী বঙ্গীয় আইন সভার ঘোষণা করেন, আমার মুক্তির পথে একমাত্র বাধা হলওয়েল মনুমেন্ট সত্যাগ্রহ।

তার অনতিকাল পরেই বঙ্গদেশ সরকার আমাদের দাবির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে, মনুমেন্টের অপসারণের আদেশ দেয়। তার অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে ওই সত্যাগ্রহের কারণে যাদের জেলে ঢোকানো হয়েছিল তাদের সকলকে ছেড়ে দেওয়া হয়, একমাত্র আমার এক বন্ধুকে এবং আমাকে ছাড়া। ১২৯ ধারা অনুযায়ী যে-আদেশ, তার জায়গায় অন্য একটি আদেশ জারি করা হয়, ভারত প্রতিরক্ষা আইনের ২৬ ধারায়। তাতে বিনা বিচারে স্থায়ীরূপে আমাকে বন্দি করে রাখার ব্যবস্থা আছে। তার সঙ্গে ওই একই আইনের ৩৮ ধারায় আমাকে অভিযুক্ত করা হয় কয়েক মাস আগে তিনটি বক্তৃতা এবং একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের জন্য, যে পত্রিকার সম্পাদক আমি। কয়েক মাস আগে প্রকাশিত ওই প্রবন্ধটির জন্য গভর্নমেন্ট আগেই কোনও সতর্কবাণী ছাড়া জামানতের ৫০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করে আরও ২০০০ টাকা আমাদের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে।

অর্থাৎ আমি বিগত আড়াই মাস আইনের একটি ধারায় বিনা বিচারে বন্দি হয়ে আছি এবং দুটি আদালতে ওই একই আইনের ধারায় আমার বিচার হচ্ছে। আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন, এই প্রক্রিয়া কতখানি নজিরবিহীন ও অন্যায়।

এর আর কোনও ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। একমাত্র এইটি ছাড়া, যে আমি একটি প্রতিহিংসামূলক নীতির শিকার হয়ে আছি, এবং সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে কোনও প্রকারে আমাকে জেলে বন্ধ করে রাখবে।

এ ছাড়া সরকার আইনি প্রক্রিয়ায় ও হস্তক্ষেপ করছে। যখন আমার পক্ষ থেকে বিচারক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দরখাস্ত করা হয়েছিল; সরকারি মুখপাত্র দুটি জায়গাতেই তার বিরোধিতা করেন। গত পরশুদিন একজন ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, তিনি জামিন মঞ্জুর করছেন, কিন্তু তাঁর আদেশ কার্যকর হবে না, যতদিন না সরকার ২৬ ধারায় জারি আদেশ প্রত্যাহার করে। লক্ষ্যণীয়, ভারত প্রতিরক্ষা আইনে কাজ করার ব্যাপারে বঙ্গ সরকার ভারত সরকারের নির্দেশ পালন করছে না।

এখানে, এই প্রদেশে নানা ঘটনা ঘটছে হতভম্ব করে দেওয়ার মতো। যদি কেউ মুসলমান হয় তার জন্য ভারত প্রতিরক্ষা আইনের অর্থ বদলে যায়। অমুসলিমরাই উৎপীড়িত হচ্ছে, কয়েকজন মুসলমান যাদের ডি. আই. আইনে ধরা হয়েছিল, হঠাৎ তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় একমাত্র এই কারণে যে তারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী, কিংবা মুসলিম লীগের সদস্য।

গত মাসের শেষ দিকে আমি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতীয় আইনসভায় নির্বাচিত হই। সংসদীয় রীতি অনুযায়ী আমি দাবি করি আইনসভার অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার স্বাধীনতা। কিন্তু সে দাবি এখনও পুরণ করা হয়নি, সম্প্রতিকালে বর্মাতে একজন সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীর ক্ষেত্রে বর্মা গভর্নমেন্ট তাঁকে সেই আইনসভার অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দিয়েছিল।

আমি কিছুমাত্র অতিরঞ্জন করিনি এবং আমি যেমন জানি, ঘটনা বিবৃত করেছি। ওই সব

ঘটনা থেকে কারও পক্ষে কল্পনা করা অসুবিধা হবে না, আমার চেয়ে যাঁরা কম খ্যাতিসম্পন্ন ও প্রভাবশালী তাদের বেলায় কী রকম বিচার হয়। এর প্রতিকার কী?

কয়েক দিন আগে আপনি জেনে নিশ্চয় অবাক হয়েছিলেন যে ডি. আই. আইনে পণ্ডিত্ জওহরলাল নেহরুকে চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এই প্রদেশেই হাজার হাজার কেসে ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত বিনাবিচারে বন্দি আছেন। আমি নিজে কারাদণ্ড ভোগ করেছি এবং ১৯৩২ থেকে ১৯৩৭ কার্যতঃ নির্বাসনে থেকেছি। পণ্ডিত নেহেরুর 'কেস' থেকে সকলেই সহজে বুঝতে পারবেন, সাধারণ কর্মীদের কী অবস্থা, যখন একজন বিখ্যাত প্রধান নেতার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করা হচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ হিসাবে আমরা যদি এই সময়ের সমস্যা সম্পর্কে আপনার সঙ্গে একমত না হতে পারি, তাতে কি বিস্মিত হওয়ার কোনও কারণ থাকে?

আপনার কাছে কোনও প্রতিকার পাওয়ার আশায় আমি এ পত্র লিখছি না। আমার মনে পড়ছে টেরেন্স ম্যাকস্উইনির কথা যিনি কর্কের লর্ড মেয়র ছিলেন। রাজকীয় বিশেষ ক্ষমতা তাঁকে মুক্তি দেয়নি, কারণ তখনকার প্রধানমন্ত্রী লয়েড জন তাতে বাধা হয়েছিলেন, ভারতের ক্ষেত্রে, উচ্চতম পদে আসীন ব্যক্তিরাও যে অন্যায়ের প্রতিকার করার ব্যাপারে অসহায় বোধ করেন, তাতেই বোঝা যায় একটি অতিশয় অশুভ ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম করতে হচ্ছে, যতদিন এই ব্যবস্থার পরিবর্তন না হয়, একজন ব্যক্তি, তার যে জন্মগত অধিকার স্বাধীনতা, সে অধিকার কী করে দাবি করতে পারে?

আপনার মূল্যবান সময়ের মধ্যে আমি বিঘ্ন সৃষ্টি করলাম এই সঙ্কটের সময়ে, তার কারণ আবার মনে হল, আপনি যেহেতু আমাকে চেনেন, আমি যা বলছি আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন এবং এক মুহূর্তের জন্য হলেও বিষয়টির আরেকটি দিক আপনি হয়তো দেখতে পারেন এবং আমাদের বর্তমান কঠিন পরিস্থিতি বুঝতে পারবেন।

শ্রদ্ধা সহকারে

আপনার বিশ্বস্ত
সুভাষ সি বোস

শ্রীযুত আর্থার গ্রিনউড এম. পি.
সহকারী নেতা
পার্লামেন্টারি লেবার পার্টি
মন্ত্রীসভার সদস্য
হোয়াইট হল
লন্ডন এস. ডব্লিউ.

আর্থার মুরকে

ব্যক্তিগত

প্রেসিডেন্সি জেল
কলিকাতা
১৭. ১১. ৪০

প্রিয় মি. আর্থার মুর,

আমার কাছ থেকে চিঠি আপনার অপ্রত্যাশিত, পরিস্থিতির দরুণ আমি বেশি নিয়মিতভাবে আপনার পত্রিকা পড়তে পারছি। বাইরে আমার বেশি অবসর থাকে না।

আমি শুধু আপনাকে জানাতে চাই, আপনাদের অনেক লেখা, এলাকার জ্বলন্ত নানা বিষয়ের ওপর, আমার খুব ভাল লাগে। তাতে আপনার নিরপেক্ষতা ও সমালোচনার ক্ষমতা প্রকাশ পায়, যা প্রায়শ এখন দেখা যায় না। তার দ্বারা লেখা সারবত্তা বৃদ্ধি পায় যদিও আপনার মতামতের সঙ্গে কেউ একমত নাও হতে পারে। এইচ. জি. ওয়েলসের সম্পর্কে, এবং সরকারি ইস্তাহার সম্পর্কে আপনার মত এর একটি উদাহরণ

একবার মধ্যাহ্ন ভোজনের টেবিলে আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, বৈদেশিক নীতি ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে আপনার প্রবন্ধ আমার ভাল লাগে, অন্তত এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই, আপনার এই মন্তব্যটি সঠিক যে, ঘটনাবলী আপনার মতামতকে যথার্থ প্রমাণ করেছে এবং সেই কারণে আপনার কথা শোনা উচিত, তবে আপনি সে রকম শ্রোতা পাবেন কিনা সন্দেহ।

আশা করি মধ্যপ্রাচ্যে আপনার ভ্রমণ আপনি উপভোগ করেছেন। সময়োপযোগী সম্ভাষণ সহকারে

আপনার বিশ্বস্ত
এস. সি. বোস

শ্রীযুত ডবলু. আর্থার মুর
প্রযত্নে দি স্টেটসম্যান
চৌরঙ্গি স্কোয়ার
কলকাতা

মুকুন্দলাল সরকারকে

সংশোধিত এবং অনুমোদিত
অপাঠ্য
ডি.সি.এস.বি-র পক্ষে

অনুমোদিত
অপাঠ্য
লেফটেন্যান্ট কর্নেল আই. এম. এস.
সুপারিনটেনডেন্ট,
প্রেসিডেন্সি জেল

প্রেসিডেন্সি জেল
২১. ১১. ৪০

একান্ত ব্যক্তিগত

প্রিয় মুকুন্দবাবু

আপনার ১১ নভেম্বরের পত্র পেয়ে আমি খুশি হয়েছি, গত পরশু আমি পত্রটি পাই।

আশা করি আপনি এখন ভাল আছেন। আপনি যখন জেলে আমার সঙ্গে দেখা করেন, আমি ভাল ছিলাম। তার পরে আমার সায়াটিকা হয়, কিংবা সে রকম কিছু। এখন পর্যন্ত রোগটির প্রকোপ কম এবং আমি তাকে দমিয়ে রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আগে আমার রোগ যে রকম প্রবল হয়েছিল আমার মনে আছে। আমি আর তার পুনরাবৃত্তি চাই না।

জেল থেকে আমি বাইরের বন্ধুদের কীকরে কিছু বাণী দেব? এখন তো আমি স্বাধীন নই।

আমি সর্দার শার্দূল সিংয়ের চিঠি পেয়েছি এবং আশা করি তিনিও আমার চিঠি পেয়েছেন। গান্ধীজির কাছে পাঠানো টেলিগ্রামে তিনি যদি আমার কথা না লিখতেন আমি বেশি খুশি হতাম, নিজের কথা খুলে না বললে ভুল বোঝার সম্ভাবনা থাকে। সব কথা খুলে বলা জেল থেকে কঠিন।

অনেক ইতস্তত করার পর আমি আপনাকে কিছু পরামর্শ দিচ্ছি। এটা কঠোরভাবে একমাত্র আপনার জন্য, অন্য কাউকে জানাবার জন্য না। আমি যদি মুক্ত হতাম, 'সাধারণভাবে নির্দেশাবলী জারি করতে পারতাম। এখানে থাকতে তা পারি না। কারণ তাতে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। আমরা ওয়ার্ধার আদেশ গ্রহণ করি না। অতএব গান্ধীজি যাই বলুন, আপনি মনে করবেন না, আপনি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে এবং গ্রেপ্তার বরণ করতে বাধ্য। আপনি যেমন চালাচ্ছিলেন চালিয়ে যান। অতীতে আমরাই কষ্ট স্বীকার করেছি, যন্ত্রণা ভোগ করেছি। অন্যেরা তার ফসল ঘরে তুলেছে। কিন্তু সেটা কতদিন চলবে?

আন্তরিক শুভেচ্ছা সহকারে

আপনার বিশ্বস্ত
সুভাষচন্দ্র বোস

শ্রীযুত মুকুন্দলাল সরকার
৩৭, কলেজ স্ট্রিট
কলকাতা

পরিশিষ্ট

‘মহাজাতি সদন’ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিভাষণ

১৯শে আগস্ট ১৯৩৯, ১৬৬নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ

আমার বিশ্বাস য়ুরোপীয় সংস্কৃতি ভারতবর্ষে সর্ব প্রথমে বাংলাদেশের অন্তঃকরণ গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল, নানাদিক থেকে বিচলিত করেছিল তার মন। মুক্তির বেগ লাগল তার জীবনে, তার মননশক্তি জাগরিত হয়ে উঠল পূর্ব যুগের অজগর নিদ্রা থেকে। বুদ্ধির সর্বজনীনতা দৃষ্টির সর্বব্যপকতা সর্ব মানবের পরিপ্রেক্ষণিকার মানবত্বের উপলব্ধি বাংলাদেশের রামমোহন রায়ের মতো মহামনীষীদের চিত্তে অপূর্ব প্রভাবে অকস্মাৎ আবির্ভূত হোলো। আচার ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনের মুক্তি বাংলাদেশেই সর্বপ্রথমে উদ্যত হয়ে উঠেছিল। অতি অল্পকালের মধ্যে চলৎশক্তিমতী হয়ে উঠল বাংলাভাষা, তার আড়ষ্টতা ঘুচে গেল নব যৌবন সঞ্চারে। সাহিত্য দেখা দিতে লাগল অভূতপূর্ব সফলতার আশা বহন করে, পৃথিবীর আদিযুগে যেমন করে দ্বীপ উঠেছিল সমুদ্র গর্ভ থেকে, নব নব প্রাণের অন্নদায়িনী আশ্রয়ভূমি। চিত্রকলা বাংলাদেশে সর্বপ্রথমে অনুকরণের জাল ছিন্ন করে ভারতীয় স্বরূপের বিশিষ্টতা লাভের সন্ধানে বিদেশীয় চরণচারণ চক্রবর্তীদের তীব্র বিদ্রূপের বিরুদ্ধে জয়ী হোলো। গীতকলা আজ এই বাংলাদেশেই গতানুগতিকতার প্রভুত্ব কাটিয়ে কুলত্যাগের কলঙ্ক স্বীকার করে, নূতন প্রকাশের অভিসারে চলেছে, তার আশুফলের বিচার করবার সময় হয়নি, কিন্তু পণ্ডিতরা যাই বলুন নব নবোন্মেষের পথে প্রতিভার মুক্তিকামনা এর মধ্যে যা দেখা যাচ্ছে তার থেকেই বাংলাদেশের যথার্থ প্রকৃতির নিরূপণ হতে পারে। প্রাণের স্পর্শশক্তি যেখানে প্রবল সেখানে প্রাণের সাড়া পেতে দেরি হয় না, যতদূর থেকেই আহ্বান আসুক, নব যুগের সাড়া দিতে বাংলাদেশ প্রথম হতেই জড়তা দেখায়নি, বাংলাদেশের এই গৌরব এবং সেই তার সত্য পরিচয়। এই কথা কারো অগোচর নেই যে একদা রাষ্ট্রমুক্তিসাধনার সর্বপ্রথম কেন্দ্রস্থল ছিল এই বাংলাদেশ এবং যে দুর্যোগের দিনে এই প্রদেশের নেতারা কারাপ্রাচীরের নেপথ্যে ছিলেন, তখন তরুণের দল দেশের অপমান দূর করবার জন্যে বধ-বন্ধনের মুখে যেমন নির্বিচারে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, ভারতবর্ষের অন্য কোনো প্রদেশেই এরকম ঘটেনি। এ ঘটনাকেও ফলের দ্বারা বা শান্ত সুবুদ্ধির আদর্শে বিচার করব না, বিচার করব মুক্তির জন্যে দুঃসহ বেদনার মূল্য অনুসারে। বাংলাদেশে সহস্রাধিক তরুণ প্রাণ সুদীর্ঘকাল কারানির্বাসনে আপন দীপ্তি নির্বাপিত করেছে। জানি সেইজন্যে আজ বাংলাদেশের আকাশ অনুজ্জ্বল। কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানি, যে মাটিতে এদের জন্ম, সেই মাটিতে দুঃখজয়ী বীর সন্তান আবার জন্মাবে, তারা পূর্ব অভিজ্ঞতায় শিক্ষায় সমাহিত হয়ে

ভাঙনের ব্যর্থ কাজে আপন শ্রেষ্ঠ শক্তির অপব্যয় না করে গড়নের কাজে প্রবৃত্ত হবে।

আজ এই মহাজাতি-সদনে আমরা বাংলাজাতি যে শক্তি প্রতিষ্ঠা করবার সংকল্প করেছি, তা সেই রাষ্ট্রশক্তি নয়, যে শক্তি শত্রুমিত্র সকলের প্রতি সংশয়কণ্টকিত। চিত্তকে আহ্বান করি, যার সংস্কারমুক্ত উদার আতিথ্যে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন মুক্তি অকৃত্রিম সভ্যতা লাভ করে। বীর্য এবং সৌন্দর্য, কর্মসিদ্ধিমতী সাধনা এবং সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনা জ্ঞানের তপস্যা, এবং জনসেবার আত্মনিবেদন, এখানে নিয়ে আসুক আপন আপন বিচিত্র দান। অতীতের মহৎ স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের বিপুল প্রত্যাশা এখানে আমাদের প্রত্যক্ষ হোক, বাংলাদেশের যে আত্মিক মহিমা নিয়ত পরিণতির পথে নবযুগের নবপ্রভাতের অভিমুখে চলেছে, অনুকূল ভাগ্য যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং প্রতিকূলতা যার নির্ভীক স্পর্ধাকে দুর্গম পথে সমুখের দিকে অগ্রসর করছে সেই তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব এই মহাজাতি-সদনের কক্ষে কক্ষে বিচিত্র মূর্ত্তরূপ গ্রহণ করে বাঙালিকে আত্মোপব্ধির সহায়তা করুক। বাংলার যে জাগ্রত হৃদয় মন আপন বুদ্ধির ও বিদ্যার সমস্ত সম্পদ ভারতবর্ষের মহাবেদীতলে উৎসর্গ করবে বলেই ইতিহাস বিধাতার কাছে দীক্ষিত হয়েছে, তার সেই মনীষিতাকে— এখানে আমরা অভ্যর্থনা করি। আত্মগৌরবে সমস্ত ভারতের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য থাকুক, আত্মাভিমানের সর্ব্বনাশা ভেদবুদ্ধি তাকে পৃথক না করুক এই কল্যাণ-ইচ্ছা এখানে সংকীর্ণচিত্ততার উর্দ্ধে আপন জয়ধ্বজা যেন উড্ডীন রাখে। এখান থেকে এই প্রার্থনামন্ত্র যুগে যুগে উচ্ছ্বসিত হোতে থাক্—

বাঙালির পণ বাঙালির আশা
বাঙালির কাজ বাঙালির ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান
বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান ॥

সেই সঙ্গে এ কথা যোগ করা হোক, বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক, বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক, ভারতের মুক্তিসাধনায় বাঙালি স্বৈরবুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো কারণেই নিজেকে অকৃতার্থ যেন না করে।

নির্ঘণ্ট

অক্সফোর্ড ২০৮
অনশন ধর্মঘট ২০৫-২০৬
অনাক্রমণ চুক্তি ৪১
অনুশীলন সমিতি ১৪৯
অন্ধ্র ২১, ৮২
অন্ধ্র কিষাণ অধিবেশন ১৮৯
অন্ধ্র কৃষক সমিতি ১৮৭
অন্নপূর্ণাইয়া *দেখুন* এম. অন্নপূর্ণাইয়া
অমরেন্দ্র এন. বোস, শ্রী ১৬০
অমৃতবাজার পত্রিকা ৮৮, ৯৩
অমৃতসর ৮১
অমিয় ১৪৩, ১৪৪
অমিয় চক্রবর্তী ১৮৩
অমিয় বোস ২০৭
অমিশ্র মন্ত্রীসভা/ ক্যাবিনেট ৪, ১৪, ৬৮
অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি/এ.আই.সি.সি. ৪, ৬, ৭, ২৪, ৬৯, ১০২, ১২৮, ১২৯, ১৮১
অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন ২৮, ৩২, ৬২, ৬৮
অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির কলকাতা সম্মেলন ২১
অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশন ৬৮
অল পঞ্জাব মোসলেম স্টুডেন্টস ফেডারেশন ১৮৫
অস্টারলিজ ৪৯
অস্ট্রিয়া ৭৩
অস্ট্রেলিয়া ১০০, ১১০
"অহিংস অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের অধ্যায়" ১০

আই. এল. পার্স ২০৮
আইন অমান্য আন্দোলন ৬, ২৮, ৩৫, ৩৭, ৭৪, ১০৪, ১১৪-১১৭, ১৩৭, ১৪৬, ২০৬
আইরিশ আন্দোলন ৪৫
আইরিশ কনভেনশন /সম্মেলন ৪৮, ৬১
আকবর শাহ ১৮৬
আগাথা হ্যারিসন, মিস ১৪৩, ১৯৮
আনসারি, ড. ১১৭
আপোস বিরোধী সম্মেলন ৮১, ৯৫, ১০৪
আফ্রিকা ১০০, ১১০
আমরণ অনশন ৮৬
আমেদাবাদ ১৯৪
আমেরি, মি. ১০১
আমেরিকা ১০৮, ১৭৬, ২০০
আম্বেদকর, ড. ২১
আয়ারল্যান্ড ৭৭
আর্থার গ্রিনউড, মি. ১৪৪, ১৭৩, ২০৮
আর্থার মুর ২১১
আলম, ড. ১১৫, ১১৬
আলিপুর এজলাস ১৪৪
আশরাফুদ্দিন চৌধুরী ৮২
আসফ আলি, মি. ১১৭

ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ১৯৯, ২০০
ইউরোপ ১৪, ৩৩, ৪০-৪৩, ৬৫, ৮৯, ৯১, ৯৭, ১০০, ১০৬, ১০৮, ১০৯, ১১৮
ইংলিশ চ্যানেল ১০৮
ইংল্যান্ড ৯৯, ১০১, ১০৯, ১২৩, ১৬৯, ২০০, ২০৮
ইঙ্গ-আইরিশ চুক্তি ৭৭
ইতালি ৪১, ৭৬, ৯৯, ১০০, ১০৯, ১১০
ইদগানজি, শ্রীযুত ২৬
ইনসেইন জেল ১৬১
ইন্ডিপেনডেন্ট লেবার পার্টি ২১
ইন্ডিপেনডেন্স লীগ ৬

ইন্ডিপেনডেন্স লীগ পন্থী ১১৮
ইন্ডিয়া লীগ ১৪৩, ২০৭
ইন্ডিয়ান কনসিলিয়েশন গ্রুপ ১৪৩, ২০৭
ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল গ্রুপ ২০৭
ইন্দুভূষণ বোয়েদ, শ্রীযুত ২০২
ইন্দুলাল যাজ্ঞিক ১৮৮, ১৯৪
'ইয়ং ইন্ডিয়া' ৩৮, ৫৮

উইকহ্যাম স্টুড, মি. ২০৮
উইন্সটন চার্চিল, মি. ৯৯, ১০৭, ১০৯
উইলিংডন, লর্ড ১৭
উইলিয়াম টেল ১২৫
উত্তর আফ্রিকা ১০৮
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ২২
উত্তর প্রদেশ ২২
উনাও ২১, ৪১

এ. এন. বোস, মি. ১৭৩
এ. কে. সাহা ১৩৯
এইচ. জি. ওয়েলস ২১১
এন. জি. রঙ্গা, অধ্যাপক ৯৪, ১০৩, ১০৪, ১৮৭
এম. অন্নপূর্ণাইয়া ৮২, ১৮৩, ১৮৭
এম. আর. সিদ্দিকি, মি. ১৯৯
এম. এ. এইচ. ইস্পাহানি ২০২
এম. এন. মুখার্জি ১৯১
এম. এন. রায় ২৯, ১৮১-১৮২
এম. গান্ধী *দেখুন* মহাত্মা গান্ধী
এম. মলোটভ ৪১
এম. লাভাল ৪১
এমারি, মি. ১৭৪, ২০৭, ২০৯
এস. কে. হোসমানি, শ্রীযুত ২৫, ২৬

ওয়াটারলু ৪৯
ওয়ার্কিং কমিটি ৪, ৮, ৯, ১২, ১৫, ৩৬-৩৮, ৬০
ওয়ার্ধা ২০, ৩১, ১২৯, ১৪২, ১৪৪, ২১২
ওয়ালটার লেটন, স্যার ১৪৪, ২০৮
ওয়ালি-উল ইসলাম, মি. ১৭৪
ওয়েজ়উড, কর্নেল ২০৮

কংগ্রেস ৩-৮, ১০, ১২-১৫, ২১, ২২, ২৬, ৩০, ৩৩-৩৫, ৩৭, ৪৪, ৪৬-৪৮, ৫২-৫৫, ৫৭-৫৯, ৬২, ৬৫-৬৮, ৭০, ৭৪, ৮০, ৮২, ৮৬-৮৮, ৯০-৯২, ৯৫, ১০৩, ১০৬, ১১৪, ১১৬, ১১৭, ১২৬, ১২৭, ১৩২, ১৩৬-১৩৮, ১৪১, ১৪৭, ১৪৮, ১৭৬, ২০৪
কংগ্রেস ও লীগ চুক্তি ৮৮
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৪, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৯, ৪০, ৪৪, ৪৬-৪৯, ৫১, ৫২, ৫৪, ৫৫, ৫৭-৫৯, ৬১, ৬৩, ৬৪, ৭৫, ৭৮, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯১, ৯৩, ৯৫, ৯৬, ১০১, ১১৩
কংগ্রেস ডেমোক্রেটিক পার্টি ১১৬
কংগ্রেস পুরসভা নির্বাচন পর্ষদ ৭৮
কংগ্রেস পৌর সমিতি ৭৯
কংগ্রেস সমাজবাদী/সোশ্যালিস্ট পার্টি ৬, ১১৭-১১৯, ১২১, ১৪৬, ১৮৭
কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট লীগ ২৯
কংগ্রেসি শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলন ৩০
কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন ৩২
কমিউনিস্ট পার্টি ১৪৯, ১৮৭
করিম এ. চশমা ১৯৬
কর্ক ১৬৯, ২১০
কর্ণাটক ২৫, ২৭
কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ২৬
কলকাতা ৬, ৩২, ৩৯, ৪২, ৬৮, ৭৮, ৮৪, ৮৭, ৮৮, ১১১, ১১৪, ১১৫, ১৩৯, ১৭৩, ১৭৪, ১৯৫, ১৯৯, ২০১, ২০৭, ২০৯
কলিকাতা করপোরেশন ১৯৯, ২০০
কলিকাতা পৌর আইন ৭৯, ২০১
কাওয়াসজি জাহাঙ্গির হল ২৩
কানপুর ২১
কান্তিলাল পারেখ ২০২
কামাথ ৮২, ১৩৮
কিষাণ সভা ৩৯, ৮২, ৯০, ৯৪, ১০৩, ১০৪, ১৪৮, ১৪৯, ১৮৭
কীর্তি ১৪৯
কৃষ্ণ মেনন ১৪৩
কে. এফ. নরিম্যান, শ্রীযুত ২২, ১৮১
কেনেডি, মি. ১৭৬
কেমব্রিজ ২০৮
কেরালা ১২৯
কেরেনস্কি কৌশল ৫১

ক্যাক্সটন হল ২০৮
ক্যারল পোটি ১৮৯
ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট *দেখুন* কলিকাতা পৌর আইন
ক্লেমেন্ট অ্যাটলি, মি. ১০৮

খলিল আহমেদ, মি. ১৯১
খান আব্দুল গফফর খান ২২
খোদাই খিদমৎগার ২২

গগনবিহারী এল. মেহতা ১৯৮
গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে ২৫
গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৫০
গয়া ১৯২
গান্ধী-আরউইন চুক্তি ৪৮, ৫৬, ১১৬
গান্ধীজি *দেখুন* মহাত্মা গান্ধী
গান্ধী-দাশ-নেহরু চুক্তি ১১৪
গান্ধী সেবা সঙ্ঘ ৭
গিরিডি ১৯২
গুজরাট ২১, ২৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯৪
গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া ২৩
গোবিন্দানন্দ, স্বামী ১১৫
গ্রিনউড, মি. *দেখুন* আর্থার গ্রিনউড
গ্রিস ৭৩
গ্রেট ব্রিটেন ১৫, ৪০, ৪১, ৬০, ৭৩, ৭৫, ৯১, ৯৬, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০৬, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১২০, ১৪৭, ১৭৬

চরমপত্র ১৪, ৫৪
চার্চিল, মি. ১০৮, ১১০
চিন ১৪৮
চেকোস্লোভাকিয়া ৭২, ৭৩
চৌরিচৌরা ৩৮, ৪৮, ৫৬, ৮৬

জওহরলাল নেহরু, পণ্ডিত ২২, ২৯, ৩২, ৪৭, ৬৮, ৯৬, ১১৪-১১৬, ১১৮, ১২১, ১২২, ১৩৮, ১৮৯, ২০৪, ২১০
জব্বলপুর ২৮, ১৬১
জয়প্রকাশ নারায়ণ ১৪৫
জলপাইগুড়ি ৩১, ৮৯
জাতীয় ফ্রন্ট গোষ্ঠী ২৪
জাতীয় মোর্চা ৩৯
জাপান ১০০, ১১০
জারের শাসন ৬০
জার্মানি ১৪, ১৫, ৪০-৪২, ৪৫, ৭২, ৮৫, ৯০, ৯৯, ১০০, ১০৮, ১১০, ১২৩, ২০০
জালিয়ানওয়ালাবাগ ৪৫, ৮১
জিন্নাহ, মি. ৬, ৮৮
জেটল্যান্ড, লর্ড ৮৫
জে.পি. (জাস্টিস অব দি পিস) ১২

টাইমস পত্রিকা ২০৭
টেরেন্স ম্যাকস্উইনি, লর্ড মেয়র ১৬৯, ১৭০, ১৭৭, ১৭৮, ২০১
টোকিয়ো ১৬
ট্রটস্কি ১৬, ৪৩

ডমিনিয়ন স্টেটাস ৬
ডাচ ইন্ডিজ ১০০
ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ ৯০, ১১০
ডানজিগ ১৪, ৭৩
ডাবলিন ৪৫
ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া আইন/ ডি. আই. আইন ৮৪, ১৬৭, ১৭১, ১৭২, ১৭৪- ১৭৬, ১৮০, ২০৯, ২১০
ডেনমার্ক ৭৩, ৯০
'ডেলি মেল' ১০৮

ঢাকা ১০৪, ১১৩
ঢাকা সম্মেলন ৯৩, ৯৪

তামিলনাড (মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি) ২১, ১৮৭
তারা সিং, মাস্টার ১৩২
ত্রিপুরী ২৭, ৫৩
ত্রিপুরী কংগ্রেস ২৭, ৩৩, ৫০, ৫৩, ৬৯

থার্টল, মি. ১৪৪
থুরিল, মি. ২০৮

দক্ষিণপন্থী ৪, ৫, ৭, ৮, ১১, ১৩, ১৫, ২২, ২৪, ২৫, ২৯-৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৫৬-৫৮, ৬১-৬৩, ৬৭-৭০, ৭৪, ৭৫, ৭৭, ৮০, ৮৩, ৯০, ৯৪, ৯৫, ১০২-১০৫, ১১৭, ১২০, ১২৭, ১২৮, ১৮৬

'দি ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল ১৯২০-১৯৩৪' ৪৩
দিল্লি ৩০, ৩৩, ৩৫, ৪৫, ১২৯, ১৮৮
দিল্লি চুক্তি ৮৬
দেরাদুন ১৪০
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ৯৮, ৯৯, ১১৪, ১১৬, ১২৫, ১৩০, ১৫৯, ১৬১, ২০৩
দেশবন্ধু পার্ক ৮৮
দেশবন্ধু দাশ *দেখুন* দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
দেশবন্ধু সি. আর. দাশ *দেখুন* দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ১১৬
'দ্য ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' *দেখুন* 'ভারতবন্ধু'
'দ্য স্টেটসম্যান' ১৬, ৪৩

ধনরাজ শর্মা, পণ্ডিত ১৯২
ধারওয়ার ২৫

নওশেরা ২২
নন্দলাল পারেখ, শ্রী ১৯৫
নরওয়ে ৭৩
নাগপুর ১০১, ১১২, ১১৩
নানিক জি. মোতেয়ানে ১৯৫
নিউ দিল্লি ১৭০
'নিউজ ক্রনিকল' ১৪৪
নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভা ১০
নেপোলিয়ন ১০৯
নেপোলিয়নীয় যুদ্ধ ৯৯
নেহরু, পণ্ডিত *দেখুন* পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
নেহরু কমিটির রিপোর্ট ৬
নৃপেন্দ্র সি. মিত্র, মি. ১৬২
ন্যাশনাল ফ্রন্ট গ্রুপ ২৯

পঞ্জাব ২২, ৩১, ৫০, ৫৩
পঞ্জাব কংগ্রেস ১৩২
পটেল-উইল কাণ্ড ১৪১
পট্টভি ড. ৩২
পল রেয়ঁদ, মঁসিয়ে ১০৭, ১০৮
পাটনা ২১, ৮৪
পালসা ১৮৭
পি. আর. দাস, মি. ১৯১
পিলসুদস্কি, মার্শাল ১৪
পুনা ২৪, ২৫, ২৭, ২০৬
পূর্ব প্রুশিয়া ৭৩
পেশোয়ার ২২, ১৮৬
পোল্যান্ড ১৪, ৪১, ৪২, ৭২, ৭৩
প্যারিস ১০১, ১০৬, ১০৯
'প্যালেস অব ডিসকভারি' ২০০
প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ৩৮, ৬৮
প্রাদেশিক কিষাণ অধিবেশন ১৮৮
প্রাদেশিক কিষাণ সভা ১৯৪
প্রেসিডেন্সি জেল ১৩৫, ১৫৪-১৫৮, ১৬০-১৬৪, ১৬৬-১৬৮, ১৭০-১৭৩, ১৭৮, ১৮০, ২০৫, ২০৭

ফজল হোসেন, মি. ১৮৫
ফরওয়ার্ড ব্লক ৩, ৫, ৭-৯, ১১-১৩, ২০-২৭, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৮, ৪০, ৪৪, ৪৬, ৫২, ৫৫, ৬১-৬৪, ৬৭-৬৯, ৭৭, ৮২, ৮৪, ৯০, ৯১, ৯৪, ৯৫, ১০১-১০৭, ১১১, ১১২, ১৩৭, ১৪২, ১৪৯, ১৭৪, ১৮৬, ১৮৭, ২০৭
ফরওয়ার্ড ব্লকের অল ইন্ডিয়া ওয়ার্কিং কমিটি ২০, ৩৯, ৪১, ৪২, ১০৪
ফরওয়ার্ড ব্লকের বার্ষিক অধিবেশন ১২
ফরওয়ার্ড ব্লকের সর্বভারতীয় সম্মেলন ২৩, ৬৪
ফিনল্যান্ড ৪২
ফে, অধ্যাপক ২০৮
ফ্যারিংডন লর্ড ২০৮
ফ্রন্টিয়ার মেল ২২
ফ্রানজি কাওয়াসজি হল ২৯
ফ্রান্স ৪০, ৪১, ১০৮, ১০৯, ১২৩, ২০০
ফ্রান্স-প্রুশিয়া যুদ্ধ ৯৯, ১০৯

বঙ্গদেশ ২১, ৩৮, ৪১, ৬৩, ৮০, ৮৭, ৮৮, ৯২, ৯৫, ১০১, ১০৪, ১১২, ১১৭, ১২৫, ১২৭, ১৩০-১৩২, ১৩৫-১৩৭, ১৫০-১৫৩, ১৬১, ১৭৮
বঙ্গদেশ প্রদেশ কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন ৩১
বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস ৪১, ৮২, ১২৭
বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ৩৬, ৪১, ৫৬, ৬৮, ৬৯, ৭৮, ৮৭, ৯২, ৯৫, ১২৮, ১২৯

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন ৮৭, ৮৯, ১১২
বঙ্গীয় ফরওয়ার্ড ব্লক ৮২
বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা ৭৮
'বন্ধু' *দেখুন* 'ভারতবন্ধু'
বম্বে *দেখুন* বোম্বাই
বরদাবাবু ১৪৪, ২০৩
বরদৌলি ১১৪
বলকান উপদ্বীপ ১০০
বল্ডউইন, লর্ড ৫০
বল্লভভাই প্যাটেল, সর্দার ১৪০
বামপন্থী ৩-৯, ১১, ১৪, ১৫, ১৭, ২৪, ২৯-৩২, ৩৭-৩৯, ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৫১, ৫২, ৫৫-৫৮, ৬২, ৬৩, ৬৬-৭১, ৭৪, ৭৫, ৭৭, ৮১-৮৩, ৮৪, ৯৪, ৯৫, ১০২, ১০৩, ১০৫, ১১৫, ১১৭-১১৯, ১২২, ১২৭, ১২৮, ১৮১, ১৮৭
বামপন্থী ঐক্যসাধন সমিতি ২৪, ২৯, ৬৮, ১০৩, ১০৫
বামপন্থী ব্লক ৫
বার্গসঁ ১৯, ১২৪
বার্ট্রান্ড রাসেল ২০৮
বার্লিন ১৬
বার্লিন-রোম-টোকিয়ো অক্ষ ১৬
বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড ১২৯, ১৩১
বাসিল ম্যাথিউস, মি. ২০৮
বি. এম. বাপট ২৫
বি. চক্রবর্তী, শ্রী ৬
বি. পি. পাইন, শ্রী ১৭৩
বিজাপুর ২৫
বিঠলভাই প্যাটেল ৩৩
বিপিসিসি ৬৯, ৭০, ৯৩, ১২৭, ২০৩ *দেখুন* বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি
বি. সি. পাল, শ্রী ৬
বি. সি. রায়, ডা. ১১৭
বিহার ৯৫
বিহার প্রাদেশিক কিষাণসভা ৬৭, ৭১
বেনিটো মুসোলিনি ৭৬
বেলগাঁও ২৬
বেলজিয়াম ৯৯, ১০৯
বোম্বাই ১২, ২২-২৪, ২৭-২৯, ৬২, ৬৪, ৮২, ১৯৪, ১৯৮
ব্রহ্মদেশ ১৬১, ১৭১
ব্রিটেন *দেখুন* গ্রেট ব্রিটেন

ভন হার্টমান ১২৩
ভারত প্রতিরক্ষা আইন *দেখুন* ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া আইন
'ভারতবন্ধু' ১৬-১৮, ৪২, ৪৩, ৪৫
ভারত শাসন আইন ৯৭
ভারত সরকার আইন ৩০
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস *দেখুন* কংগ্রেস
ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগ আইন (D.O.R.A) ২০৮
ভারতীয় সংবিধান ৬
"ভারতের সংগ্রাম ১৯২০-৩৪" ১১৮
ভারনন বার্টলেট, মি. ১৪৪, ২০৮
ভি. জে. প্যাটেল, শ্রী ১৪০
ভি. ডি. ত্রিপাঠী ৪১
ভুলাভাই দেশাই, শ্রী ১১৭
ভুসকুটে ৮২

মজদুর সভা ১৪৯
মজলিস-ই-আহরার ৪১, ৫০, ৫৪
মতিলাল নেহরু ১১৪, ১১৫
মধ্য প্রদেশ ১২, ২৭, ১৬১
ময়মনসিংহ ২০৩
মহাকোশল প্রদেশ ২৭, ২৮
"মহাজাতি সদন' ১০, ১১, ২১৪
মহাত্মা গান্ধী ৫, ৬, ১৪, ১৫, ২১, ২২, ২৩, ৩১, ৩৫, ৩৬, ৩৮-৪০, ৪৫-৪৮, ৫১-৫৩, ৫৫, ৫৮, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭৪, ৭৫, ৮৮, ৯১, ৯৫-৯৮, ১০২, ১০৪, ১১৪, ১১৫-১১৭, ১২১, ১২৫, ১২৭, ১২৯, ১৩১, ১৩২, ১৩৫-১৩৭, ১৪১, ১৭৮, ১৮৯, ২০৫, ২০৬, ২১২
মহাদেবভাই ১৩৫, ১৩৬
মহারাষ্ট্র ২৫, ২৭, ৮২
মস্কো ১৬, ৪৫, ১৪৯
মাণ্ডগি, শ্রীযুত ২৬
মাণ্ডলা ২৮
মান্দালয় জেল ১৬১, ১৬৩
মাদ্রাজ ২২, ৩৯, ৮২, ১৮৭
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র *দেখুন* আমেরিকা

মিউনিখ ৪৫
মিত্রশক্তি ৯০, ১০০, ১০৭-১১০
মিয়াঁ আকবর শাহ ২২, ১৯৩
মিল উইলকিনসন ২০৮
মিশ্র মন্ত্রীসভা/কাবিনেট ১৪, ৩২, ১০৫
মুকুন্দলাল সরকার ২১২
মুঙ্গের ১৯২
মুরাপাড়া ১৭৫
মুসলিম লীগ ২১, ৬৬, ৭২, ৭৯, ৮৭, ৮৮, ১০১, ১০৬, ২০৯
মুসোলিনি ৯০
মে দিবস ৮৪
মেঘনাদ সাহা ১৯৯
মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ১৫৯
মেমেল্যান্ড ৭৩
মোতিহারি ১৯২
মৌলানা *দেখুন* মৌলানা আবুল কালাম আজাদ
মৌলানা আক্রাম খাঁ ৮৭
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ১২৬- ১২৯, ১৩০-১৩২, ১৩৫, ১৩৬, ১৪০-১৪২, ১৮৮, ২০৩, ২০৪
ম্যাজিনো লাইন ১০৯

যতীন দাস ১৭৭, ১৭৮, ২০৫
যাজ্ঞিক, কমরেড ১০৩
যুক্তপ্রদেশ ২১, ৩১, ৪১, ৯৫, ১০৪, ১১৭, ১৩৯
'যুগান্তর' ৯৩
'যুদ্ধ-পরিষদ' ৫১, ৫৪, ৫৫

রঙ্গ, অধ্যাপক *দেখুন* এন. জি. রঙ্গা, অধ্যাপক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫২, ১৩৯, ১৪০, ১৮৯
রাইনল্যান্ড ৭২
রাজকোট ৮৬, ২০৫, ২০৬
রাজাগোপালাচারী, শ্রীযুত *দেখুন* সি. রাজাগোপালাচারী
রাজেন্দ্রপ্রসাদ ড. ২৮, ২৯, ৩৭
রামকৃষ্ণ ১২৩
রামগড় ৫২, ৬৭, ৭১, ৭৪, ৮০, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৯৫, ১০৪, ১১২, ১৮৮, ১৮৯, ১৯৪, ১৯৫
রামগড় কংগ্রেস/ অধিবেশন ৩৬, ৫২, ৫৫, ৬৩, ৬৫, ৬৯, ৭০, ৭১, ১৮৬, ১৮৮, ১৯৪
রাশিয়া *দেখুন* সোভিয়েত রাশিয়া
রুমানিয়া ১৫
রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ১৪, ১৬
রুশ বিপ্লব ৬০
রুশ সংবিধান পরিষদ ৬০
রেঙ্গুন ১৬১, ১৯৮
রেডমনডাইট পার্টি ৪৫
রেড্ডাওয়ে, অধ্যাপক ২০৮
রোম ১৬
র‍্যাডিক্যাল লীগ ২৪, ২৯
র‍্যামজে, ক্যাপ্টেন ১৭৫, ১৭৬

লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, পণ্ডিত ১৭১
লক্ষ্ণৌ ১১৪
লন্ডন ৮৫, ৯০, ১১৮, ১৪৪, ১৭৩, ২০৮
'লন্ডন টাইমস' ৬৬
লবণ সত্যাগ্রহ ৫২
লয়েড জন ২১০
লয়েড জর্জ, মি. ৪৮, ৬১
লালা লাজপৎ রায় ৮৭
লালা শঙ্করলাল ১৯০, ১৯৪
লাহোর ২২, ১১৫, ১১৬
লাহোর অধিবেশন/কংগ্রেস ৬, ১১৪, ১১৬
লিনলিথগো, লর্ড ৩০, ১৫০, ১৫২
লিন্ডসে, অধ্যাপক ২০৮
লিস্টোয়েল, লর্ড ২০৮
লীগ অব র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন ১৮১
লেইথওয়েট, মি. ১৫২
লেনিন ১৮, ৪৫, ৭৬
ল্যাস্কি, অধ্যাপক ২০৮

শরৎ ১৩৭
শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুত ১২৬-১২৮, ১৩৬, ১৪০, ১৪২-১৪৪, ১৭৩
শান্তিনিকেতন ১৩৯, ১৮৩
শার্দূল সিং কবিশের, সর্দার ২০৫, ২১২
শিন-ফিন দল ৬১
শীলভদ্রজি ১৯২
শ্যামনন্দন সহায়, রায়বাহাদুর ১৯১
শ্যাম্পেন অঞ্চল ১০৯

শ্রদ্ধানন্দ পার্ক ৮৮, ৯২
শ্রমিক দল ১৪৯
শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, শ্রীযুত ১১৫, ১১৬

সংগ্রাম সমিতি ৮৩
সংবিধান পরিষদ ৪৮, ৫১, ৫৬-৫৯, ৭৫
সত্যপাল, ডা. ১৮৫
সত্যাগ্রহ আন্দোলন ২৮, ৪৫, ৫৪, ৮৬
সত্যাগ্রহ সমিতি ৮৩, ৯৫
সন্তোষবাবু ১৪৪
সম্পূরণ সিং, সর্দার ১৩২
সরোজিনী নাইডু ১৮৯
সহজানন্দ সরস্বতী, স্বামী ৩৯, ৭৪, ৭৮, ৮৩, ৮৪, ৯৪, ১০৩, ১০৪, ১৪৬, ১৮৮, ১৯২
সাপ্তাহিক ফরওয়ার্ড ব্লক ১৯৩, ২০৭
সায়েন্স কলেজ *দেখুন* ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি
সারা ভারত আপোসবিরোধী সম্মেলন ৬৭, ৭১, ৭৪, ৮০, ৮৪, ৮৬, ১০৩, ১৯২
সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি *দেখুন* অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি
সারা ভারত কিষাণ সভা *দেখুন* কিষাণ সভা
সারা ভারত দিবস ২৯
সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক ২০৬
সারেন্ডার-নট ব্যানার্জি ৪৯
সালোম ১৮৭
সি. আর. দাশ, মি. *দেখুন* দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
সি. এফ. অ্যানড্রুজ ১৯৮
সি. ডব্লিউ. সি. *দেখুন* কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি
সি. রাজাগোপালাচারী ৩৯, ১৪৭
সিন্ধু প্রদেশ ১৩২, ১৭৮
সিমলা ৭৫, ১০৪
সিরাজদৌল্লা দিবস ১১২
সীতা ধর্মবীর ১৮২
সীমান্ত প্রদেশ ১১৭
সুইজারল্যান্ড ১২৫
সুয়েজ খাল ১৫
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, স্যার ৪৯, ৫০
সুরেশ ১৩৭
সূর্যকুমার সোম, বাবু ২০৩
সেদান ১০৯
সেওনি ১৬১
সেনাপতি বাপট ৮২
সোভিয়েত রাশিয়া ১৮, ৪০-৪৩, ৭৪, ১০০, ১১০, ১৪৯
সোভিয়েত-জার্মান চুক্তি ৮৫
সোরেনসেন, মি. ১৪৪, ১৭২, ২০৭-২০৯
স্যামুয়েল, লর্ড ২০৮
স্যালোনিকা ৭৩
স্ক্যানডিনেভিয়া ৭২, ৭৩, ৮৯
স্টেটসম্যান ১৫৬
স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, স্যার ১০০, ১১০
স্ট্যালিন ১৬, ১৪৮
স্নেল, লর্ড ২০৮
স্পেনসার ১২৪
স্বরাজ পার্টি ১১৪, ১১৬
স্বরাজ লীগ ২০৭
স্বাধীনতা মোর্চা ১১৪, ১১৭
স্বামীজি *দেখুন* স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী

হবিবুল্লা, মি. ১৮৫
হরিজন আন্দোলন ৩৮, ৪৮, ৫৬, ৮৬, ১১৭
'হরিজন' সাপ্তাহিক ৩৮
হরিপুরা কংগ্রেস/ অধিবেশন ৬, ৭, ২৩, ৩০, ৩৩, ৩৪, ৫০, ৫৩, ৯৬, ১১৮, ১১৯
হলওয়েল মনুমেন্ট ১১২, ১৭১, ১৭৪, ২০৭, ২০৯
হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলন ১৫৬
হলওয়েল স্মৃতিসৌধ সংক্রান্ত সত্যাগ্রহ ১৫২
হল্যান্ড ৮৯, ৯০, ৯৯, ১০৯
হাজারিবাগ জেলা ১৯২
হায়দ্রাবাদ রাজ্য ১৪১
হিটলার ১৩, ১৪, ১৫, ১৬
হিটলার-স্টালিন সংযোগ ৪৩
হিন্দু মহাসভা ২১, ৮০, ৮৭, ৮৮, ৯৩, ১৫১
হিন্দু মহাসভার বার্ষিক সর্বভারতীয় সম্মেলন ৭৮, ৭৯
হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ৩৫, ৪৭, ৫০
হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ৪১, ৫৪, ৯৪, ১১১

'হিন্দুস্থান টাইমস' ১০১
'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড' ১৬২
হিন্দুস্থানী প্রদেশ ২৭
হুবলি ২৫
হেগেল ১৯, ১২৩, ১২৪
হেনরি বার্গসঁ ১২৩
হোরাবিন, মি. ২০৮
হ্যামিলটন, লে. কর্নেল ১৫৯

Independence League ১১৪, ১১৬
Indian Struggle, The 1920-34

9 789350 401613